প্রথম খণ্ড

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সমিত ঘোষালকে
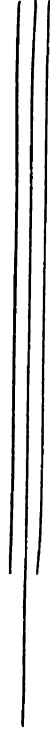
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

I.P.S. [RETD.] M.Sc. D. Phil J.P.

ভূমিকা

রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় C. I. E. মহোদয় খেদ করে বলেছিলেন যে আজও বাঙালীদের কোনও ইতিহাস লেখা হয় নি। উনি দীর্ঘকাল মুস্লীম শাসন-কাল সত্ত্বেও বাঙলা দেশে হিন্দু জমিনদারদের আধিক্যের কারণও জানতে চান। বাঙলার এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিসট্রি তথা প্রশাসনীয় ইতিহাস এই পুস্তকে প্রথম লেখা হলো। বাঙলার আদ্যোপান্ত বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থার গবেষণাতে বিভিন্ন যুগের রাজনৈতিক অবস্থা স্বভাবতই এসে যায়।

প্রমাণ মূলতঃ দুই প্রকারের হয়, যথা (১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ (২) পরিবেশিক প্রমাণ। [Circumstancial evidence] প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাবে মাত্র পরিবেশিক প্রমাণ দ্বারা অপরাধীদের ফাঁসী পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই ইতিহাস গঠনেও উহার সাহায্য গ্রহণীয়। বহু বিষয়ে কিছু 'হাঁ' উল্লেখের সাহায্য নেওয়ার পর [পসিটিভ এভিডেন্স] কিছু 'না' উল্লেখের [নেগেটিভ এভিডেন্স] কারণও বিবেচ্য। বক্তব্য বিষয় নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় দ্বারা প্রমাণ করবো।

ভূমিকার মূল উদ্দেশ্য এই যে মূল পুস্তকের আলোচ্য বিষয় হতে কিছু উল্লেখ্য অংশ বাদ পড়েছে। ঐগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। আশা করি পাঠকরা যথাযথ স্থানে পাঠ কালে ঐগুলি সংযুক্ত করবেন।

প্রতাপাদিত্য

এটি স্বীকৃত সত্য যে উনি প্রদেশ শাসক নবাবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু—এর পরও তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে কোনও কোনও ঐতি-হাসিক প্রশ্ন তুলেছেন। অবস্থা সঙ্গীন না হলে মানসিংহের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ সেনা-ধ্যক্ষের অধীনে বিরাট সম্মিলিত মোগল ও রাজপুত বাহিনী বাঙলা দেশে প্রেরিত হতো না। মানসিংহকে এজন্য বহু প্রতাপ বিরোধী বাঙালী ভুঁইয়াদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। প্রতাপাদিত্য বাখরগঞ্জ খুলনা যশোহর ঈশ্বরপুর ও গড় কমলে দুর্গ এবং সাগরদ্বীপে নৌ-ঘাঁটি তৈরী করেন। তাঁর সর্দার শঙ্কর, কালী ঢালী, কমল খোজা ও সূর্যকান্তর মতো দক্ষ সেনাধ্যক্ষ ছিল। তিনি প্রদেশ নবাবের বিরুদ্ধে জয়ী হলেও তাঁর শক্তিক্ষয় হয়। সেই অবস্থাতে তাঁকে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ শক্তির সহিত যুদ্ধ করতে হয়। জনৈক ক্ষুদ্র নৃপতির পক্ষে উহা নিশ্চয়ই অসীম সাহস ও শক্তির পরিচয়। জয় পরাজয় কিছুটা ভুল ভ্রান্তি ও ভাগ্যের উপরও নির্ভরশীল। আশ্চর্য এই যে তাঁর চির শত্রু মির্জানাথের পুস্তকের উপর নির্ভর করে ওঁকে বিচার করা হয়। বাদশাকে খুশী করার জন্য প্রতাপ নিন্দা তাদের কাছে বিশ্বাস্য। কিন্তু—প্রাচীন কবিদের প্রতাপ প্রশস্তি [বাহান্ন হাজার যাঁর ঢালি] গ্রহণীয় নয়। জিজ্ঞাস্য এই যে তাহলে অন্য ভুঁইয়াদের সম্বন্ধে ঐরূপ কবি প্রশস্তি নেই কেন? এখানে একমাত্র পরিবেশিক প্রমাণ উভয় মতবাদের সুমীমাংসা করতে পারে।

পলাশীর যুদ্ধ

১৭৫৭ খ্রীঃ ২২ জুন ক্লাইভের বাহিনী ভাগীরথী পার হয়ে নবাবের ছাউনির দুই মাইল উত্তরে এক লক্ষ আম্রবৃক্ষ সম্বলিত বিরাট লক্ষবাগ নামক আম্রবাগিচাতে প্রবেশ করলো। ক্লাইভের বাহিনীতে ৯৫০ জন গোরা সৈন্য [লাল পল্টন] ও তেলিঙ্গী বাহিনী সহ ২১০০ দেশীয় সিপাহী। তাদের মাত্র আটটি ছোট ও দুটি বড় কামান ছিল। নবাব বাহিনীর ছিল ৫০ হাজার পদাতিক, ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পঞ্চাশটি বড় কামান। ফরাসী সেনাপতি সফ্রের অধীনে চারটি ছোট কামান। সফ্রের বাহিনীর পিছনে মীরমদন ও মোহনলালের বাহিনী এবং সমগ্র যুদ্ধ স্থানকে ঘিরে ছিল রায়-দুর্লভ, ইয়ার লতিফ ও মিরজাফরের বাহিনী। এরা সকলে আক্রমণ করলে ক্লাইভ বাহিনীর চিহ্ন মাত্র থাকতো না। ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেওয়ার কালে উহা স্বীকার করেন।

বেলা এগারটায় ভীষণ বৃষ্টি এলো। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা বারুদ ঢাকার আচ্ছাদন আনে নি। তবে বিলাস সামগ্রীর অভাব ছিল না। বারুদ ভিজে নবাবের মতো ফরাসীদেরও কামান নিস্তব্ধ। কিন্তু ইংরাজদের ত্রিপল থাকাতে বারুদ ভেজে নি। এই সুযোগে জনৈক ইংরাজের ভুলে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। সফ্রের কামান দাগার স্থানটি তখন ইংরাজদের দখলে। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে মীরমদন আহত ও তাঁর কয়-জন আত্মীয় সেনানী নিহত হলেন। অবস্থা বিরূপ বুঝে মোহনলাল তাঁর বাঙালী সেনাদল সহ ইংরাজদের আক্রমণ করলেন। ইংরাজ বাহিনী ঐ আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে হটতে আরম্ভ করেছে। ঐ সুযোগে ফরাসী গোলন্দাজ সফ্রে পুনরায় কামান-দাগছে। কিন্তু—তখনও মীরজাফর ও ইয়ার লতিফ এবং সেনাপতি রায়দুর্লভের [বিরাট] মূল বাহিনী নিষ্ক্রিয়। নবাব সব বুঝে মীরজাফরের পদতলে মুকুট রেখে তাদের যুদ্ধ করতে তাঁর কাতর অনুরোধ জানালেন। মীরজাফর সেই দিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ রেখে পরদিন সকালে যুদ্ধ করতে রাজী হলেন। মোহনলাল নবাবের ঐ রূপ নির্দেশ পেয়ে বলে পাঠালেন—'এখন আর পিছু হটা নয়।' তবু তাঁর কড়া পুনরা-দেশে মোহনলাল তাঁর বাহিনীকে পিছু হটতে আদেশ দিলেন। ততক্ষণে প্রকৃত অবস্থা বুঝে নবাবের 'মারসীনারী' বিদেশী সৈন্যরা শিবির ত্যাগ করতে শুরু করেছে। কিন্তু রায় দুর্লভের বাঙালী সৈন্যরা পালায় নি। এখানে মোহনলাল এবং রায় দুর্লভের অধীন বাঙালী সৈন্যরা নবাব আনুগত্যে দ্বিধাবিভক্ত। তবে তারা আদেশ মতো কার্য করেছে। এতো বড় সুযোগের সদ্ব্যবহার ইংরাজরা করেছিল। ইতিমধ্যে নবাবের এক আত্মীয় শিরে নবাবের রাজছত্র ধরে তাঁকে ইংরাজদের বন্দুকের নিশানা করেছে। মোহনলাল ঐ ছত্র সরাতে ছুটে এলেন। এর ফলে আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। নতুবা একা মোহনলাল ও তাঁর বাঙালী বাহিনী ক্লাইভকে বিতাড়িত করতেন :

এই যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, উহা প্রমাণ করে তখনও বাঙালী সৈন্য সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হতো। বাবর তাঁর আত্ম-জীবনীতে রাজপুতদের তাচ্ছিল্য করলেও স্বীকার করেছিলেন যে 'বাঙালীরা ভালো যুদ্ধ করে।' উনি ক্রোধ প্রকাশ করে লেখেন যে তিনি বাঙালীকে দেখে নেবেন। পাঠানদের সাহায্যকারী ভুঁইয়ার-

দের বাঙালী সৈন্যদের লক্ষ্য করে তাঁর ঐ উক্তি। প্রাচীন দিগ্‌বিজয়ীদের বাঙালী নৌ সৈন্যদের প্রতি ভীতি রঘুবংশ কাব্যে উল্লেখিত। কিন্তু এতো সত্ত্বেও বাঙালী-দের দ্বারা প্রথম দেশীয় বাহিনী তৈরি করলেও ইংরাজরা পরিশেষে বাঙালীকে সেনাবাহিনী ও সাধারণ পুলিশের পদেও নিযুক্ত করতে চান নি। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ দ্বারা বাঙালীরা পলাশীর যুদ্ধের ভুল কিছুটা শুধরেছিল। পরিবেশিক প্রমাণ দ্বারা এই ব্যবস্থার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

হিন্দু জাতি

হিন্দু কোনও ধর্মের নাম নয়। উহা একটি জাতির নাম। ভারতীয়রা মুশ্লীম খৃস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য শৈব প্রভৃতি ধর্মীয় হলেও জাতি ও সংস্কৃতিতে সকলেই হিন্দু। এই বিষয় স্বীকার করে নবাব বাদশারাও এদেশকে হিন্দুস্থান বলে-ছেন। হিন্দু শব্দ কোনও ধর্মের সংজ্ঞাও নয়। হিন্দু নামে ধর্মের কোনও প্রচারক নেই। কোনও নিয়ম ও আচার পালন না করেও লোকে হিন্দু। এমন কি নাস্তিক ও জড়বাদী, একেশ্বরবাদী প্রভৃতিও হিন্দু। ইহা একটি সমন্বয় বাচক [ফেডারেশন অফ রিলিজনস্] অপৌরুষেয় ধর্ম। এতে ব্যক্তিগত মত ও পথ সর্বতোভাবে স্বীকৃত। ([হীনতা বর্জনকারী মানব নিচয় হিন্দু বলে আপনারে দেয় পরিচয়—আনন্দবাজার]) হিন্দু অর্থে সৎ ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝায়। অর্থাৎ শুনহ মানুষ ভাই। সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। তবে একথাও ঠিক যে ওই হিন্দু ধর্মই সমগ্র ভারতকে একতাবদ্ধ রেখে ছিল।

আসিন্ধু সিন্ধু পর্যপ্তাঃ যস্য
ভারত ভূমিকা পিতৃভু পুণ্যভু
শৈচব স বৈ হিন্দুরীতি স্মৃতিঃ

এই মতবাদ আবহমানকাল হতে প্রচলিত না থাকলে হিন্দুরা ধর্ম সম্বন্ধে এত উদার হতো না। কিন্তু—ইংরাজরা কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে হিন্দু বিদ্বেষী হয় এবং সাম্প্রদায়ি-কতার প্রশ্রয় দিতে থাকে। তবে বাঙালীদের স্বাধীনতা প্রিয়তা ও ব্রিটিশ বিরোধি-তার জন্য বাঙালীরাই তাদের লক্ষ্য হয়। আশ্চর্য এই যে প্রথমে এই বাঙালীদেরই ইংরাজরা মস্তকোপরি রেখেছিল। তৎকালে বড় সাহেব বলতে জনৈক ইংরাজ ও ছোট সাহেব বললে জনৈক বাঙালীই বোঝাতো।

[হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত এরূপ ধারণার জন্য হিন্দু রাজন্যবর্গ ও জমিনদার শাসকরা প্রজাদের ধর্মান্তর গ্রহণে বাধা দেন নি। অন্যদিকে—হিন্দু মুশ্লীম উভয় শ্রেণীই নিজেদের বাঙালী উপজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেছে।]

আরোপক পুলিশ

সম্রাট অশোক প্রথমে বাজারের নিয়ন্ত্রণে প্রথম আরোপক সংস্থা তৈরি করেন। সম্ভবতঃ—গুপ্ত সম্রাটরা উহার অনুকরণ করেন। কিন্তু—সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী [১২৯৬—১৩১৬] মধ্যযুগীয় ভারতে প্রথম আরোপক সংস্থার [এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ] স্রষ্টা। বাজারের লেনদেন ও দর নিয়ন্ত্রণে শাহান-ই-মণ্ডি [শাহান = তত্ত্বাবধায়ক।

মুণ্ডি—বাজার] নামে এক কর্মীর অধীনে ঐ আরোপক সংস্থা থাকে। ক্রেতাকে ঠকালে ও সপ্তাহে একদিন বাজার বন্ধ না রাখলে উনি ব্যবস্থা নিতেন। ওজনে কম দ্রব্য দিলে ব্যাপারীর দেহ হতে সম পরিমাণ মাংস কেটে নেওয়া হতো। শাহান-ই-মুণ্ডির কাছারী বাজারগুলির মধ্যে থাকতো। ছুটির দিন তথা সাপ্তাহিক বন্ধের দিন উহা হরিতাল রঙে রঞ্জিত করা হতো। তাই আজও বাজার বন্ধের দিনকে হরতাল বলা হয়।

আগ্নেয় অস্ত্র

শুক্রনীতি খ্রীঃ পূঃ প্রাচীন পুস্তক। উহাতে স্পষ্টতঃ উক্ত আগ্নেয়াস্ত্র তিন প্রকার, যথা নালিকা, নালিকা ও বৃহন্নালিক। [৪র্থ অধ্যায়, ৭ম প্রকরণ] লঘু নালিকার বিবরণে উক্ত—উহা পঞ্চবিতস্তি তথা আড়াই হাত। একটি লৌহ নির্মিত নল বা নলি। উহার মূলে আড়ভাবে একটি ছিদ্র। মূল হতে উধ্ব´ পর্যন্ত আঃভুখি বা গর্ত। মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্যার্থে তিল বিন্দু মাছি। যন্ত্রের আঘাতে অগ্নি নির্গমনার্থে যুক্ত প্রস্তর খণ্ড। [চকমকি বন্দুক ?] অগ্নিচূর্ণ তথা বারুদের আধারভূত কর্ণ। উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্নতথা ধরবার মুঠ। মধ্যাঙ্গুলী প্রবেশে সক্ষম অগ্নিচূর্ণের গহ্বর। উহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশের দৃঢ় শলাকা। উহার আয়তন মতো উহা দূরভেদী। বৃহন্না-লিকের গর্ভ তথা নীরেট লৌহ গোলক। ফাঁপালো গোলার মধ্যে ক্ষুদ্রগুলি। লঘু নালিকের নাল বা ছিদ্রের উপযুক্ত সীসক বা ধাতু গুলিকা। নালাস্ত্র লৌহসার দ্বারা নির্মিত। অগ্নিচূর্ণ তথা বারুদ সম্বন্ধে শুক্রাচার্যের উক্তি। সুভচি, গন্ধক ও কয়লা যথাক্রমে পাঁচ, এক ও এক পল বা অংশ। আয়ুর্বেদ মতে সুভচি অর্থে সোরা। অর্ক সুহী ও অন্য বৃক্ষের কাষ্ঠ বদ্ধ স্থানে কয়লার জন্য জ্বালানো। ঐ কাঠকয়লার গুঁড়া করে ও চেলে স্নুহী অর্ক লশুন আদি রসে মিশ্র ও শুষ্ক করে কাঁকী করে অগ্নিচূর্ণের তৈরি। ১৪০৪ খ্রীঃ প্রেমনগর কামান ও বন্দুকে সুরক্ষিত ছিল। **vide T. A. S. B. vol. xxx vlll p. 1 (1869) (page 40-41)** বর্তমান ইংরাজ লেখকদেরও মতে ভারতে কামান ও বন্দুক প্রথম সৃষ্ট। প্রতীত হয় যে ওগুলি পারিবারিক ঘরা-নাতে ছিল। যুদ্ধাপেক্ষা পরবে বেশী ব্যবহৃত হতো। হাউই তথা রকেট ভারতে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত। প্রাচীন বহু গ্রন্থে আগ্নেয়াস্ত্রের আভাস বা বিবরণ আছে। এইগুলি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ধৈর্য ও উৎসাহ জনগণের হয়তো ছিল না।

সম্ভবত ধনুকের তীরের অগ্রমুখে হাওয়াই বাঁধা হতো। তারপর [অগ্নি-সংযোগ করে] ঐ তীর নিক্ষেপ করা হতো। ঐ তীর উহাকে কিছুটা দূর পৌঁছে দিলে বাকি পথ [অগ্নিদাহের পর] উহা নিজ বলে অতিক্রম করতো। ঐরূপ অস্ত্রকে অগ্নিবাণ আখ্যা দিলে ভুল হবে না।

কিন্তু—শুক্রনীতি সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নির্ধারিত না হলে উহা বিতর্কমূলক থাকবে। [বলা বাহুল্য—আগ্নেয়াস্ত্র অতি উন্নত না হওয়া পর্যন্ত তীর ধনুকের চলন থাকে।] ভারতের মতো প্রতিবেশী প্রাচীন চীন দেশেও বারুদ তৈরি হতো। পুরা-কালে চীনের ও ভারতের মধ্যে আনাগোনা ও লেনদেন সুবিদিত।

বিষ্ণুপুরের রাজারা এক'শ মন ওজনের বহু লৌহ কামান তৈরি করেন। উহার নলের

বিরাট ব্যাসে বিরাট গোলা পোরা যেত। উহার দ্বারা বাঙালী যোদ্ধারা বহুবার মারহাটা বর্গীদের হটাতে পেরেছিল। [নবাবের কালে বাঙালী কর্মকাররাই কামান ও বন্দুক তৈরি করেছে।]

সিপাহী মিউটিনীর পর ব্রিটিশরা ভারতের জনগণ দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং বহন ও রক্ষণ লাইসেন্স ব্যতিরেকে এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্‌ট ও আর্মস্‌ এ্যাক্‌ট দ্বারা বন্ধ করেন। হিন্দু ও মুস্লীম সরকার ভারতের জনগণকে ইংরাজের মতো নিরস্ত্র করে নি।

বাঙালী

(কেউ কেউ বলে—বাঙালীরা আর্য অনার্য দ্রাবিড়ের মিশ্র জাতি। এ জন্য সর্বভারতীয় বোধ ও প্রীতি বাঙালীদের রক্তেতে।) বাঙালীর [হিন্দু মুস্লীম খৃষ্টান বৌদ্ধ] দেহাকৃতি ব্ল্যাড গ্রুপিং ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য এ বিষয়ে বিবেচ্য। ঐ তথ্য হিন্দু মুস্লীমের দ্বিজাতি তত্ত্ব বাতিল করে। এরা কখনও [ভুঁইয়ার রাও] এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হয় নি। বরং পারস্পরিক বিদ্বেষ ও আত্মধ্বংসী রাজনীতির এরা সহজে শিকার হয়। কিছু ব্যক্তির মতে এরা ঘর জ্বালানে পর ভুলানে। (এরা বারে বারে নিজেদের ক্ষতি করে সমগ্র ভারতের উপকার করে। এরা ভাবপ্রবণ, দুঃখ বিলাসী ও আদর্শবাদী।) ওদের প্রথম মুভমেণ্টে তারা রাজধানী হারায় ও প্রদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের বেহাত হয়। ওদের দ্বিতীয় মুভমেণ্টে (তারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে নিজ দেশে পরবাসী হয়।) ওদের তৃতীয় মুভমেণ্টে পদের প্রদেশ থান থান তিন থান হয়ে যায়। চতুর্থ কোনও মুভমেণ্ট করলে তাদের উপকার হবে কিনা তা বিবেচ্য। (প্রতিবার এরা নিজেরা পিছিয়ে সমগ্র ভারতকে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ জন্য এরা কখনো কারো নিকট সাধুবাদ পায় নি। নিজেদের জন্য ছাড়া অন্য সকলের জন্য এরা ভাবে ও প্রাণপণ করে। এত বড় স্বার্থত্যাগী ও আত্মভোলা জাতি পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু—নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও হানাহানি তাদের মধ্যে আজও আছে।)

ইতিহাস

সর্বদেশের মতো প্রদেশের রাজধানীর ভাষা বাঙালী জনগণ দ্বারা গৃহীত হয়। এ জন্য রাজধানী গৌড়ের ও শান্তিপুরের মার্জিত ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার উপর সুস্পষ্ট।

কয়েকজন জবরদখলী ও নবাবদের ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চয়ই ইতিহাস নয়। (প্রশাসনিক ইতিহাসই সর্ব দেশের প্রকৃত ইতিহাস। কারণ—ঐ প্রশাসন ব্যবস্থার সহিতই জনগণের সুখদুঃখ ও সুবিধা অসুবিধা বিজড়িত। এই সঙ্গে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসেরও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে।)

ব্যবসায়

বাঙালীর নৌ-শিল্প দারোগাদের সাহায্যে বলপ্রয়োগে ধ্বংস করা হলেও ঐ-ভাবে তাদের তাঁত-শিল্প নষ্ট করা হয় নি। তাঁতীদের অঙ্গুলী কর্তনের কাহিনী অলীক। ইংল্যাণ্ডের মতো পরাধীন ভারতে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয় নি। ইংল্যাণ্ডের যন্ত্র চালিত তাঁতের সহিত বাঙালী তাঁতীরা প্রতিযোগিতাতে অক্ষম হয়, (কলিকাতার লাহা পরিবার ইংল্যাণ্ডের লাট্টু মার্কা বস্ত্রের সর্ব ভারতীয় এজেণ্ট হলেন। তাঁরা ঐ ব্যবসায়ে

কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন। বিড়লারা পরে ঐ ব্যবসায়ে তাঁদের বেনি-য়ান হন। কিন্তু—লাহা পরিবার ব্যবসায় ছেড়ে অধিক সম্মান পেতে [জমিনদারী ক্রয় করে] জমিনদার হলেন। ফলে বিড়লা হাউস তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলো।

বাণিজ্য লক্ষ্মী বাঙালীদের ত্যাগ করে ক্ষেত্রীদের নিকট ও ক্ষেত্রীদের ত্যাগ করে [পরে] মাড়বারীদের নিকট চলে গেল। এখন উহা তাদের নিকট হতে ভাটিয়াদের নিকট চলে যাচ্ছে। জমিনদার হওয়ার লোভ আয়েসীজীবন ও ক্ষেত্র বিশেষ চরিত্রহানি উহার কারণ। বস্তুতঃ পক্ষে—বর্ধমান বা নাটোর রাজ্যের পার্শ্বে বিড়লারাও আসন পেতো না। বাঙালী ব্যবসায়ীরা নামেতে মহারাজা হতে চাইলেন। রাজনীতি ও চাকুরি সম্বল বাঙালীদের পূর্বস্থানে ফেরার চেষ্টা কম। তাই এখন তাদের মুখের এক -মাত্র বুলি —'সব কিছু জাতীয় করণ করো।'

হিন্দু বাঙালীদের পূর্বকালীন জাহাজী বাণিজ্য ও কলোনী স্থাপন সুবিদিত। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দেও ফস্টার সাহেব হীরাট নগরে ১০০ জন এবং ভার্শীশ নগরে ১১০ জন হিন্দু বণিক দেখেছেন। বাজমশীদ, আস্ত্রারণ, ভেজদ, কাস্পিয়ান ও পারস্য সাগর কূলেও বহু হিন্দু বণিক সপরিবারে বাস করতো। কলিকাতা শহরে বাঙালী বসাক ও শেঠ পরিবার ও অন্যরা প্রাচীন ব্যবসায়ী। সপ্তগ্রাম ও চুঁচুড়ার সুবর্ণ বণিকরাও তখন সক্রিয়। পরে—এরা সকলে কলিকাতাতে ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা ভাগাভাগি করে। ১৮৫১ খ্রীঃ বণিক সভা প্রতিষ্টা কালেও তাতে বহু বাঙালী ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হতে হটলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে তখনও বাঙালী হটে নি। অর্থাৎ —অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা তখনও পরাধীন নয়। কিন্তু সংকার অনুগৃহীত ব্রিটিশ উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতাতে মুচী মাঝি প্রভৃতি দেশীয় কারিগররা হেরে চাষের মাঠে ভিড় জমালো। বাঙালী ধীরে ধীরে ব্যবসার ক্ষেত্র হতেও বিদায় নিল। পুস্তকের এই ভূমিকাতে বাঙালীকে আমি তাদের পূর্ব কৃতিত্ব স্মরণ করালাম। তাদের আমি বলতে চাই যে 'আত্মানাং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেদের চিনুন।

[পূর্বে বাঙালী কনট্রাক্টারদের দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা তৈরি করানো হতো। ঐ কালে ঐ সকল ধাতুতে খাদ না থাকাতে সমমূল্যের জন্য মুদ্রা জাল হতো না। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিজস্ব টাঁকশাল স্থাপন করে খাদ মিশ্রিত মুদ্রা তৈরি করতে।

———

প্রথম অধ্যায়

পরিসংজ্ঞা

বাংলা ও কলিকাতা-পুলিশের এবং ভারতীয় পুলিশের ইতিহাস বিবৃত করার পূর্বে পুলিশের পরিসংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

সৈন্যদলের মিনিমাম্ এ্যাকসন : ফায়ারিঙ [গুলিবর্ষণ]। অন্যদিকে পুলিশের ম্যাক্সিমাম্ এ্যাকসন : ফায়ারিঙ। কিন্তু সেই চরম মুহূর্ত এড়ানোর রীতিনীতি সৈন্যদল জানে না।। সৈন্যদল শত্রুমিত্র বাছতে অক্ষম হওয়ায় শান্তিরক্ষাতে সক্ষম হয় না। তারা এজন্য মিত্রকে শত্রু করে কর্তৃপক্ষের অসুবিধা ঘটায়। হত্যা করতে পারলেও তারা রক্ষা করতে অক্ষম। পুলিশের মতো সংবাদ-সংগ্রহ করে গভর্নমেণ্টকে সময় মতো সাহায্য বা সাবধান করতে সৈন্যদল অপারগ। মিলিটারীদের মতো পুলিশরা ক্যুপ বা বিদ্রোহ করে না। ইতিহাসের সর্পিল পথের কোন্ মোড়ে দাঁড়িয়ে নিয়োগকারীদের আদেশ অমান্য করতে হয় তা পুলিশ জানে না।

মৌর্য ও মোগল সাম্রাজ্যে সুগঠিত পুলিশ থাকায় সাম্রাজ্য দুটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু গ্রীক ও রোম-সম্রাটদের পুলিশ না-থাকার জন্য তাঁদের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সৈন্যদ্বারা দেশ জয় করার পর পুলিশ দ্বারা উহা শাসন করার রীতি। ভারতে ইংরাজরা বহু বিষয় আমদানি করলেও, পুলিশ-প্রথা ওদের দ্বারা আমদানি বলা ভুল। য়ুরোপে পুলিশ সৃষ্টি সাম্প্রতিক ঘটনা। এদেশে বর্তমান পুলিশও ওদের সৃষ্টি নয়। ইংরাজের অধীন ভারতীয় কর্মচারী ও উপদেষ্টাদের দ্বারাই তার সৃষ্টি। তাদের নিজেদের দেশে [সমকালে] পুলিশের অভাব তার প্রমাণ।

১৬৬৭ খ্রীঃ ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই প্যারী নগরীতে একদল চৌকিদার নিয়োগ করেন। তাদের 'প্যারিস-ওয়াচম্যান' বলা হতো। ফরাসীরা ও পর্টুগীজরা ওই সময় বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে আসে। তারা বাংলাদেশে প্রথম আসায় বাংলার গ্রামীণ চৌকিদারী পুলিশ সম্বন্ধে অবহিত হয়। ফরাসী ওয়াচম্যানরা হুবহু ভারতীয় চৌকিদারদের মতো ছিল না। বরং তারা বর্তমান দ্বারবানদের সমগোত্রীয়। ১৭৪২ খ্রীঃ প্রুসিয়াতে ফেড্রিক দি গ্রেট এই চৌকিদারীপ্রথার অনুকরণ করেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ ফ্রান্সের অনুকরণে লণ্ডন শহরে কিছু প্যারিস-ওয়াচম্যান নিযুক্ত হয়। লণ্ডনে এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 'প্যারিস-ওয়াচম্যান' বলা হতো। ১৮২২ খ্রীঃ লর্ড পিল কলিকাতার পুলিশের অনুকরণে লণ্ডনে প্রকৃত পুলিশ তৈরি করেন।

সুগঠিত পুলিশ সহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করায় ব্রিটিশরা এদেশে সহজে কায়েম হয়। পুলিশ ভেঙে দেওয়া স্যাবোটেজের [অন্তর্ঘাত] প্রধান কর্ম। যুদ্ধে পশ্চাদপদ-সরণ-কালে তাই পুলিশকে সঙ্গে নেওয়া হয়। বিজেতাদের পুলিশের সাহায্যে শাসন স্থাপন করতে দেওয়া হয় নি।

সম্ভবত পলিশি কিংবা পলিটি [Polite] শব্দ হতে পুলিশ নামের উৎপত্তি। কারণ রাষ্ট্রীয় নীতি [State-Policy] পুলিশকেই আরোপ করতে হয়। গ্রীক-ভাষায় পলিটি শব্দের অর্থ : নগর। সেজন্য নগর-রক্ষীদের পুলিশ বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে পুলিশকে রক্ষীণ বলা হতো। জনগণকে যারা রক্ষা করে তারাই রক্ষী।

য়ুরোপের দেশগুলিতে মূলতঃ সৈন্যদ্বারা শান্তিরক্ষার কাজ সমাধা হতো। কলিকাতা-পুলিশের অনুকরণে আধুনিক লণ্ডন-পুলিশ [পিল রিফর্ম, ১৮২২ খ্রীঃ] সৃষ্টি হয়। লণ্ডন-পুলিশদের অনুকরণে য়ুরোপের অন্যান্য শহরে আধুনিক পুলিশ তৈরি হয়। ওদেশের পুলিশ সম্পর্কে এইরূপ একটি ধারণা সঙ্গতভাবেই করা যেতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে লর্ড পিলের নাম মতো পুলিশ বাক্যটি তৈরি হয়।

পুলিশ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা : (১) জনগণ সৃষ্ট পুলিশ এবং (২) শাসক আরোপিত পুলিশ। গ্রামীণ-পুলিশগুলি সাধারণত জনগণ দ্বারা সৃষ্টি হতো। কিন্তু নগর-পুলিশগুলি শাসক-দ্বারা আরোপিত পুলিশ। এ দুটি যথাক্রমে জনগণ এবং শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রথমটি জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

(ক) জনগণ-সৃষ্ট পুলিশ : ইহা স্থানীয় জনগণ হতে উদ্ভূত জনগণের পুলিশ। এরা সংখ্যা-বহুল এবং স্থানীয় ও বিকেন্দ্রিত পুলিশ। উহা নিচে হতে ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে উপরে ওঠে। শুধু জনগণের স্বার্থেই এরা কাজ করে। বিকেন্দ্রিক ও স্থানীয় হওয়ায় এরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের হয়। এদের উচ্চ-নিম্ন পদগুলিও অনুরূপ কারণে বিভিন্ন নামের হয়ে থাকে। এদেশের বর্তমান চৌকিদার ও দফাদার প্রভৃতি পূর্বতন গ্রামীণ বিকেন্দ্রিত স্থানীয় পুলিশকে স্মরণ করায়।

(খ) শাসক-আরোপিত পুলিশ : ইহা একই কর্মকর্তার অধীনে সমগ্র-দেশ কিংবা প্রদেশের, নগর বা রাজ্যের জন্য শাসক-আরোপিত একটি মাত্র কেন্দ্রীভূত পুলিশ। শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ও নিযুক্ত হয়ে তাদেরই স্বার্থে এরা কাজ করে। শাসকদের পছন্দ মতো এই বিভাগে কর্মী নিযুক্ত হয় এবং তাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ওরা নিয়ন্ত্রিত। এরা উপর হতে জনগণের উপর আরোপিত পুলিশ। এদের সংগঠনগুলি প্রায় একই আকারের ও প্রকারের হয়ে থাকে।

আমেরিকা ও য়ুরোপের স্বাধীন দেশগুলিতে জনগণ-সৃষ্ট পুলিশের প্রাধান্য বেশি। সেখানে বহু জেলায় কাউন্টি ও মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব স্বাধীন পুলিশ আছে।

স্থানীয় জনগণের সংস্থাগুলি তাদের নিয়ন্ত্রক। সরকারের প্রভাব-মুক্ত সুনির্দিষ্ট আইন-মতো তারা কাজ করে। ওইগুলি ভেঙে কেন্দ্রীয় একটি পুলিশ তৈরির চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হয়। কারণ, এক-এলাকার অপরাধী অন্য-এলাকায় এসে কুকাজ করে। দ্রুত-গতি যানবাহনের যুগে তারা সহজে গ্রেপ্তার এড়ায়। কিন্তু ওই রকম প্রস্তাব জনগণ প্রতিবার অগ্রাহ্য করে তা প্রতিরোধ করেছে। সেজন্য কয়েকটি রাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক ফেডারেল পুলিশ গঠিত হয়েছে। তারা বিশেষজ্ঞ এবং সংযোগ-রক্ষী ও সাহায্যকারী পুলিশ। জনগণ-সৃষ্ট পুলিশের অপরাধ জনগণ মার্জনা করে, এদের বিরুদ্ধে পুলিশী-অত্যাচাবের প্রশ্ন কখনও ওঠে নি। এরা জনগণের কাছে সন্তানতুল্য আপনজন রূপে বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু ভারত ইন্দোনেশিয়া ব্রহ্ম ইন্দোচীন প্রভৃতি পূর্বতন কলোনিয়াল কান্ট্রি তথা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীভূত শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত পুলিশেরই প্রাধান্য। ওই শাসক-দল কর্তৃক আরোপিত পুলিশ শাসকদের স্বার্থে কাজ করে। এজন্য তাবা কোনও দিনই জনপ্রিয় হতে পারে নি। ভালো ব্যবহার দ্বাবা এরা জন-গণেব সৎ ভৃত্য বা বন্ধুরূপে বিবেচিত হতে পারলেও সন্তানতুল্য আপনজন তারা কখনও হতে পারবে না।

মধ্যযুগীয় ভারতে কয়েক স্থানে এই উভয় প্রকার পুলিশের সংমিশ্রণও দেখা যায়। পূর্বতন ভারতে নগর পুলিশ শাসক আরোপিত এবং গ্রামীণ-পুলিশ জনগণ সৃষ্ট ছিল। বাংলার ত্রিস্তর জমিদারী পুলিশ তথা জাতীয় পুলিশের সঙ্গে পূর্বোক্ত মিশ্র-পুলিশের তুলনা করা চলে। ভারতে ব্রিটিশরা জনগণ-সৃষ্ট বিকেন্দ্রিত স্থানীয় পুলিশগুলি ভেঙে দিয়ে সর্বত্র শাসক-আরোপিত কেন্দ্রীভূত পুলিশ তৈরি করে।

[ব্রিটিশদের একদল বাংলার জনগণ-সৃষ্ট জমিনদারী পুলিশ ভেঙে দিয়ে উহা অধি-গ্রহণ করাব পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা সমগ্র দেশ বা প্রদেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথা ফেডাবেল তদারকি পুলিশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত দল তাতে সম্মতি না-দেওয়ায় শেসে জমিনদারী পুলিশ অধিগ্রহণ করে সেটি ওরা ভেঙে দেয়।]

আমি কলিকাতা পুলিশে ভর্তি হওয়ার পর প্রায়ই ভেবেছি : কোথা হতে আমরা এলাম? কার দ্বারা, কবে ও কেন পুলিশের সৃষ্টি? এই সম্পর্কে কবিগুরুর বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন প্রায়ই মনে পড়তো। আমি বুঝতে পারি যে জনগণের ইচ্ছা হতেই পুলিশের সৃষ্টি। ['ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে—'রবীন্দ্রনাথ।]

জনগণের অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী পুলিশ নন। গৃহ-তল্লাসী প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে পুলিশের প্রতিটি ক্ষমতা জনগণেরও আছে। কেবল অসৎ পুলিশ-কর্মীরাই জনগণ অপেক্ষা বেশি ক্ষমতা দাবী করে থাকে। চোখের সমুখে

কোনও পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে পুলিশের মতো জনগণও তা নিবারণ করতে বাধ্য। সেই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তায় উভয়েই দণ্ডযোগ্য অপরাধী হবে। আদালতের করণীয় কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করলে জনগণের মতো পুলিশেরও দণ্ড হয়ে থাকে। পুলিশের মতো জনগণও সাংঘাতিক অপরাধের অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার অধিকারী। প্রভেদ এই যে জনগণ-কর্তৃক ধৃতকৃত আসামীকে তৎক্ষণাৎ পুলিশ-হেপাজতে দিতে হবে। কিন্তু—পুলিশের ক্ষেত্রে অপরাধীকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত করা নিয়ম। অপরাধের তদন্ত কাজে ও তার নিরোধে পুলিশের মতো জনগণেরও সমান অধিকার।

[বিবৃতির একটু হেরফেরে জনগণও গৃহতল্লাসী করতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে, অপরাধী অনুরোধ করে স্বেচ্ছায় আমাদের কয়জনকে তার গৃহে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আমার হাতে অন্যদের সমক্ষে নিজেই বাক্স খুলে ওই চোরাই দ্রব্যটি তুলে দেয়। পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি আইনত গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু পুলিশের অবর্তমানে জনগণের নিকট ওই স্বীকৃতি প্রমাণরূপে বিবেচিত হয়। আইনানুযায়ী পুলিশদের অপেক্ষা জনগণের ইহা একটি অতিবিক্ত সুবিধা রূপে স্বীকৃত।]

জনগণ নিজেদের পক্ষে করণীয় কাজ করার জন্য এক শ্রেণীর বেতনভুক ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে উর্দি ভূষিত করেছে। কারণ, জনগণকে বহুবিধ ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে নিজেদের পক্ষে সর্বক্ষণ পুলিশী কাজ করা সম্ভব নয়। তবে একথাও ঠিক যে মানুষের বিবেকই মানুষের প্রথম পুলিশ।

এই পুস্তকে আমি পর পর ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পুলিশের ইতিহাস ও সংগঠন বিবৃত করবো। এতে পাঠান ও মোগল-পুলিশেরও বিবরণ থাকবে। তারপর, বাংলার শাসন, বিচার ও পুলিশ সম্বন্ধে বলবো। তবে বাংলার পুরনো জমিনদারী পুলিশ এবং ব্রিটিশ পুলিশের সংগঠন ও বিবর্তন এই পুস্তকের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এই সব কয়টি পুলিশের তুলনামূলক আলোচনা এ-পুস্তকে থাকবে।

এই পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম অর্থাৎ শূন্যের কোনও স্থান নেই। তাই রাষ্ট্রীয় পুলিশ তার করণীয় কাজ না-করলে জনগণ তাদের পল্লীতে প্রাইভেট পুলিশ সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গার কালে আমরা তা দেখেছি। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে তারা ভুল করে। কিছু বিপথগামী তরুণও এইভাবে প্রাইভেট পুলিশে ঢুকে পড়ে। এজন্য আপতকালে নিষ্ক্রিয় থাকা রাষ্ট্রীয় পুলিশকেই দায়ী করা উচিত।

সময়ে সাহায্যে না-পাওয়ায় সিনেমার মালিক ও বেশ্যাপল্লীর নারীরা 'লড়াকু ব্যক্তি বা গুণ্ডাদের দ্বারা বেতনভুক প্রাইভেট-পুলিশ তৈরি করে। ফ্যাক্টরি ও মিল প্রভৃতিতে সিকিউরিটি সংস্থা প্রকারান্তরে বৈধ প্রাইভেট-গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান দ্বারা নাগরিকগণ

অনুসন্ধান ও তদন্ত আদি করান। এইগুলি রাষ্ট্রীয় পুলিশ সুষ্ঠুভাবে করলে জনগণ নিশ্চয় তাদের দ্বারস্থ হতেন না। [তবে বাংলা, কলিকাতা ও ভারতীয় পুলিশ এই সকল দোষ হতে মুক্ত।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন-পুলিশ

মূল উদ্দেশ্য কলিকাতা-পুলিশ ও বাংলা-পুলিশের আদ্যোপান্ত ইতিহাস লেখা। পুলিশ-সংক্রান্ত ঘটনাবলীও সেই সঙ্গে কিছু আসা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতের পুলিশ-ব্যবস্থা-এখানে আলোচনার বিষয় না হলেও কলিকাতা-পুলিশ ও বাংলা-পুলিশের উপর তাদের প্রভাব যথেষ্ট। এইজন্য প্রথমে প্রাচীন ভারতের পুলিশ সম্বন্ধে কিছু বলবো।

প্রাচীন ভারতে নগর-পুলিশ ও গ্রামীণ-পুলিশ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রামীণ-পুলিশ বিকেন্দ্রিত ও স্থানীয় পুলিশ। সমগ্র রাজ্য বা প্রদেশের জন্য কোনোও কেন্দ্রীয় পুলিশ ছিল না। কেবল গুপ্তচর তথা গোয়েন্দা-বাহিনী কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে সংযোগ-রক্ষাকারী পুলিশ ছিল। বর্তমানকালে ফেডারেল পুলিশের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। এদের 'সংস্থা' বিভাগ রাজনৈতিক এবং 'সঞ্চার'-বিভাগ সাধারণ অপরাধীদের দমন করতেন। নগর-পুলিশ এবং গ্রামীণ-পুলিশ এই উভয়ের উপর তাদের প্রভাব এবং লক্ষ্য ছিল তীক্ষ্ণ।

নগর-পুলিশ

কপিলাবস্তুর প্রাচীর বেষ্টিত নগরের চারটি সিংহদ্বারে রাত্রিকালে অবাঞ্ছিত প্রবেশ বন্ধ করার জন্য রক্ষীরা মোতায়েন থাকতো [ষষ্ঠ খ্রীঃ পূঃ] সেই সময় পুলিশকে রক্ষীন অর্থাৎ রক্ষীকুল বলা হতো। রাজগৃহ নগরের প্রাচীর-গাত্রে উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার ছিল। সেই স্থান হতে প্রহরীরা নগরের লোকজনকে লক্ষ্য করতো। তারা রাজপথে টহল ও কেন্দ্রে-কেন্দ্রে পাহারা দিতো [ফিক্‌স্‌ড্‌ পয়েন্ট]। সন্দিহান ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তারা বিচারালয়ে পাঠাতো। একবার এক ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে পালাবার সময় ধরা পড়ে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতাকে ভরণ-পোষণ করে জেনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। রক্ষীদের দাঁড়িয়ে কিংবা বসে পাহারা ও টহল দেবার ব্যবস্থা ছিল। কোনও চুরি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা ঘটনাস্থলে দৌড়তো এবং অপরাধী-দের পিছনে ধাওয়া করে তাদের গ্রেপ্তার করতো। অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার জন্য

তারা অপরাধীদের দেহ ও গৃহতল্লাসী করতো।

[কলিকাতা ও বাংলা-পুলিশ হুবহু ওই যুগের মতো পাহারা, গ্রেপ্তার, তল্লাসী প্রভৃতি কর্তব্য-কাজ করে। সন্দিহান ব্যক্তির গৃহে রোগী থাকলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেযুগের মতো এযুগেও ভারতীয় পুলিশ জনগণের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও সহানুভূতি-শীল।]

কৌশম্বী নগরে একটি রাহাজানি [রবারি] হবার সময় গৃহস্বামী ও রক্ষাগণ চেঁচিয়ে উঠলেন 'চোর, চোর।' তারপর তস্করদের পিছনে পিছনে তাঁরা সকলে তাড়া করলেন। তস্কররা একটি নালা ডিঙিয়ে অপহৃত দ্রব্য ফেলে পালিয়ে ছিল।

জনৈক রক্ষী-প্রধান প্রয়োজনমতো উপযুক্ত স্থানে অধীনস্থ রক্ষীদের প্রত্যহ মোতায়েন করতো। একদা বারাণসী নগরে রাহাজানির হিড়িক পড়লে নাগরিকরা অভিযোগে মুখর হলেন। [এযুগেও মুখর অর্থাৎ ভোক্যাল পাবলিক তাই হন।] তাতে উপ-রাজা স্বয়ং নগর-রক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে নগরের সন্ধিস্থলগুলিতে পাহারার বন্দোবস্ত করেন।

[বর্তমান কলিকাতা-পুলিশেও রাজপথে সন্ধিস্থলগুলিতে ফিক্স্‌ড্‌ পয়েণ্ট ও রাজপথে টহলদারি তথা পেট্রোল-পাহারা থাকে। প্রয়োজনে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং ঊর্ধ্বতনরা তাদের স্থানে স্থানে নিযুক্ত করেন। এযুগের রক্ষীরাও পাবলিক কমপ্লেনে সেযুগের মতোই সজাগ হন।]

সিঁদেল চোর, সাধারণ চোর, ডাকাত প্রভৃতি অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পর সরাসরি কারাগারে [প্রিসন্] পাঠানো হতো। প্রাচীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে নগর-রক্ষীরা বিশেষ ধরনের য়ুনিফর্ম ও শিরস্ত্রাণ [হেড-ড্রেস] ব্যবহার করতো। মগধ নগরে এদের নগর-রক্ষা সহ চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলিতে শস্যক্ষেত্র রক্ষা ও অধিবাসীদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করতে হতো।

[পুরানো কলিকাতা-পুলিশ ও চতুষ্পার্শ্বের গ্রামাঞ্চলে কুড়ি মাইল পর্যন্ত প্রয়োজন মতো গমন করে গ্রেপ্তার আদি করতে পারতো। অবশ্য সেই সব জায়গার শান্তিরক্ষার মূল ভার স্থানীয় পুলিশের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষেত্রে, প্রাচীন মগধ-পুলিশ ও পুরানো কলিকাতা-পুলিশে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়।]

প্রাচীন-ভারতে আরক্ষা-অধ্যক্ষের [পুলিশ-কমিশনার] নাম ছিল, নগর-গুটিকা। ইনি গলদেশে লোহিত পুষ্প চিহ্ন ধারণ করতেন। তাঁর নিয়ন্ত্রাধীনে কয়েকজন মহা-রক্ষীর [পুলিশ-সুপার] অধীনে অধিরক্ষীরা ছিলেন। অধিরক্ষীদের অধীনে বিভিন্ন পদের 'রক্ষীন'রা থাকত। সাধারণ রক্ষী তথা নিম্নপদীদের 'রক্ষীন' বলা হতো। ['রক্ষীন' সপ্তমা অর্থাৎ সাত নং রক্ষী।]

প্রয়োজনে ঐ যুগে কিছু স্বেচ্ছাসেবী তথা ভলাণ্টিয়ার রক্ষীও সাময়িকভাবে নগর-

গুলিতে নিয়োগ করা হতো। সেই যুগে এই স্বেচ্ছাসেবী তথা বিশেষ-রক্ষী [special constable] নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ [ডঃ বি. সি. লাহার প্রবন্ধ দ্র.]। কিন্তু উহা প্রমাণ করার জন্য বহু প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান কলিকাতা পুলিশের পদ-বিভক্তি কিছুটা প্রাচীন ভারতের অনুরূপ। নগর-গুটিকার সঙ্গে পুলিশ-কমিশনার, মহারক্ষীর সঙ্গে ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার এবং অধিরক্ষার সঙ্গে এসিসটেণ্ট-কমিশনারদের তুলনা করে চলে। ভলাণ্টিয়ার [নগর] রক্ষীদের সঙ্গে বর্তমান স্পেশ্যাল-কনস্টেবলদের তুলনা করা যায়। রক্ষীগণ বর্তমান-কালীন কনেস্টবলদের পদাধিকারী ছিল।

প্রাচীন ভারতে নগরের মহারক্ষীরা [পুলিশ-সুপার] নগরের স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকদের নাম-ধাম-বৃত্তি, মাসিক আয় ও ব্যয় প্রভৃতির নথি-পত্র রক্ষা করতো। অতিথি-ভবনে অধ্যক্ষদের তাঁদের কাছে নগরের নবাগতদের সম্বন্ধে দৈনিক সমাচার পাঠাতে হতো। এদের প্রত্যেকের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করা হতো। কোনো বিপদজ্জনক কার্যে ব্রতী হলে তার জন্যে অনুমতি নিতে হতো। কোনও নিষিদ্ধ স্থানে ও সময়ে পণ্য বিক্রয় হলে বণিকগণ তা জানাতে বাধ্য ছিল।

[এযুগে—কলিকাতা-পুলিশ হোটেলের মালিকদের নূতন বোর্ডারদের নাম-ধাম লিখে রাখতে বাধ্য করে। কোনও বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত হলে কলিকাতা-পুলিশের নিকট ছাড়পত্র নিতে হয়। এদের সিকিউরিটি কন্‌ট্রোল-বিভাগ প্রতিটি বিদেশীর নাম-ধাম নথি-ভুক্ত করে তাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। কিছু সংখ্যক নাগরিকের আয়-ব্যয়ের হিসাব গভর্ণমেণ্টের আয়কর-বিভাগ রক্ষা করেন। পুলিশকেও নিজেদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ও সম্পত্তির বাৎসরিক হিসাব কর্তৃপক্ষকে পাঠাতে হয়। গ্রামে সন্দেহ-জনক কেউ এলে চৌকিদাররা তার সম্বন্ধে থানাতে সংবাদ দেয়।]

প্রাচীন-ভারতে চিকিৎসকগণ কারো ক্ষত [wound] আদির চিকিৎসা করলে তা নগর-রক্ষীদের তৎক্ষণাৎ জানাতে বাধ্য হতেন। [এযুগেও কলিকাতাতে একই নিয়ম রয়েছে।] গৃহস্থদের বাড়িতে পর্যটকরা অতিথি হলে তা নগরের মহা-রক্ষীকে জানাতে হতো। সেকালের গোয়েন্দা-রক্ষীরা খালি বাড়ি, কারখানা, জুয়ার আড্ডা তল্লাস করতো। [কলিকাতাতেও পুলিশ তাই করে।] নির্দিষ্ট দ্বার ব্যতিরেকে অন্যদ্বারে নগর হতে মৃতদেহ নেওয়া নিষিদ্ধ। [কলিকাতার হাসপাতালগুলিতেও এই নিয়ম।] শহরে পশুর মৃতদেহ নিক্ষেপ গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল।

কোনও ব্যক্তি ছদ্মবেশে কিংবা লাঠি বা অস্ত্র-হাতে শহরে ঘোরাফেরা করলে প্রাচীন ভারতের নগর-রক্ষীগণ তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করতো। [কলিকাতা-পুলিশ এ্যাক্টেও উহা দণ্ডনীয়।] ওই অপরাধের জন্য অপরাধীদের তার গুরুত্ব অনুযায়ী

দণ্ড দেওয়া হতো। রাত্রে নগর পঙ্কিল এবং দূষিত করার চেষ্টা দেখলে নগর-রক্ষীরা তা নিবারণ করতো। তাদের প্রত্যহ নগরের প্রতিটি পানীয় জলাধার পুষ্করিণী এবং রাজপথ পরিদর্শন করতে হতো। ভ্রমবশতঃ কারো ফেলে-রাখা বা হারানো দ্রব্যাদি রক্ষীদের রক্ষা করতে হতো। মালিকের খোঁজ পেলে সেগুলি তারা তাদের প্রত্যার্পণ করতো। নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রধান 'নগর-রক্ষী' জনগণকে অনুমতি দিতেন।
(এক) চিকিৎসক কিংবা ধাত্রীরা রোগী দেখতে নগরের বাইরে গেলে, (দুই) শবদাহের জন্য নাগরিকদের নগরের বার হওয়া কালে, (তিন) প্রদীপ হাতে নগরের বাইরে যেতে কেউ রাজী হলে, (চার) কেউ নগরের প্রধান-রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, (পাঁচ) অগ্নি-নির্বাপক নাগরিকদের আগুন নেভাবার জন্য ও (ছয়) ব্যক্তিগত নামে কারো ছাড়পত্র থাকলে।
[বি দ্র বর্তমান পুলিশও অস্ত্র-হাতে কাউকে রাজপথে দেখলে গ্রেপ্তার করে এবং হারানো দ্রব্য হেপাজতে রাখে। তাদের সম্মুখে মূত্রত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা নগর পঙ্কিল করলে তারা তা নিবারিত করে। কলিকাতা-পুলিশ এ্যাক্ট ও বাংলা দেশেব পাঁচ আইন দ্র.। কারফিউকালে পূর্বোক্ত রূপ ব্যক্তিগত ছাড়পত্র কলিকাতা-পুলিশও নাগরিকদের দেয়। প্রাচীন ভারতে কোনও কোনও নগরে রাত্রিকালে পথে বেরুলে হাতে প্রদীপ নিতে হতো।]
কলিকাতায় রামবাগান সোনাগাছির উচ্চশ্রেণীর বেশ্যাপল্লীতে মধ্যে মধ্যে খুন জখম ও রাহাজানির হিড়িক পড়ে। প্রতিকারেব জন্য পুলিশ রাত্রে ধরপাকড় করে। ঝাড়ু কেস অর্থাৎ সুইপিঙ অ্যারেস্ট তথা নির্বিচার গ্রেপ্তাবে নিরীহ স্থানীয় ব্যক্তিবাও নিগৃহীত হতো। সেজন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের লণ্ঠন-হাতে যাতায়াত করতে বলা হয়। কারো হাতে লণ্ঠন থাকলে সে গ্রেপ্তার হতে রেহাই পায়।]
প্রাচীন ভারতে শ্মশানক্ষেত্রে শ্মশান-গোপিকা নামক রক্ষীকুল থাকতো। তারা মৃত-দেহগুলি পরীক্ষা করে দেখতো সেগুলি স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা। শবযাত্রীদের গতি-বিধির উপরও তারা লক্ষ্য রাখতো। হত্যা অপবাধ সন্দেহ হলে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতো।
[কলিকাতার শ্মশানে ও কবর স্থানে সেজন্য ডাক্তারী ব্যবস্থা আছে। সন্দেহ হলে মৃতদেহ আটকে তারা পুলিশে সংবাদ দেয়। এতে বহু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও হুবহু এই রকম ব্যবস্থা ছিল।]
অশোক প্রভৃতি মৌর্য-সম্রাটদের নগর-রক্ষীরা ওজন বাটখারা ও দাঁড়ি-পাল্লার কার-চুপি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতো। তাছাড়া নাগরিকদের নৈতিক মান উন্নত রাখতে তারা সচেষ্ট ছিল। নাগরিকদের আয়-ব্যয়ের উপরও তারা লক্ষ্য রাখতো।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ক্রীতদাস, ভৃত্যকুল ও শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার ও অসৎ ব্যবহার দণ্ডনীয় ছিল। কর্মশালা [কারখানা] ও খনি ইত্যাদির শ্রমিকদের ও ভৃত্যদের বাসস্থান ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে ও উপযুক্ত বেতন দিতে মালিকরা [এযুগের মতো] বাধ্য ছিল। ডিম্বোৎপাদন কালে মৎস্য ও ঋতুকালে পশু শিকার ও অকারণে নিরীহ পশুবধ দণ্ডনীয় হতো। সেই কালে উপরোক্ত প্রতিটি অপরাধ রক্ষী-গ্রাহ্য [cog] ছিল।

প্রাচীন ভারতে খনি, কর্মশালা, বিদেশে বাণিজ্যের জন্য তাঁতশালা, অস্ত্র-নির্মাণশালা প্রভৃতি কারখানা তো ছিলই! এমন-কি আতশ-কাঁচ বৃত্তাকার, অর্ধ-বৃত্তাকার [oval], কনভেক্স ও কনকেভ লেন্স আর্শি ও সূক্ষ্ম কাঁচ দ্রব্যাদি ভারত হতে বিদেশে প্রেরিত হতো। ইতালীয় পণ্ডিত প্লিনি-র [1000B.C.] গ্রন্থ এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। স্বর্ণ ও মণি-শিল্পেরও একালে যথেষ্ট প্রসার ছিল। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি একত্রে একই পল্লীতে থাকতো। এইজন্য সেই স্থানে কর-আদায় ও রক্ষা-কার্যের সুবিধা হতো [ইন্‌ডাসট্রিয়াল পুলিশ]। বিজয়সিংহ সিংহলে ভারতে প্রচলিত আঠারো রকম শিল্পের প্রতিটি শিল্প স্থাপন করেন।

দৃশ্য তেহেস্থ মহত্বেন মহানন ত্বয়া ত্বয়া
দিব্য দৃষ্টৈমদোগহযং দোষাহয়মুপচক্ষুষু

তাৎপর্য—তুমি ছোট দ্রব্য বড দেখ, তা চক্ষুর দোষে নয়। তোমার চক্ষের কাঁচের উপ-চক্ষুর জন্য ওরূপ হয় [সুভাষিতাবলী, বোম্বে সিরিজ]। এতে চশমা ও মাইক্রো লেনস্ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

উপরোক্ত শ্রমিক আইন ও পশুরক্ষা-বিধিগুলি আরোপের জন্য সম্রাট অশোক তৎকালে বিশেষ রক্ষীকুল তথা আরোপক সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ যুগেও ঐরূপ বহু পশু-রক্ষা ও ক্লেশ-নিবারণী আইন আছে। এই জন্য এ-যুগেও ঐরূপ বহু আরোপক [এনফোর্সমেণ্ট] সংস্থা তৈরি হয়েছে। সম্রাট অশোক এই সকল আইন প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব দিতেন। মৌর্য রাজাদের আরোপক পুলিশ বাজার দর নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা ও মজুত রোধ, বাজারে ওজন পরীক্ষা প্রভৃতিও করেছে।

প্রাচীন ভারতের নগরে তস্কর প্রবেশ করলে কিংবা অপরাধ ঘটলে সাহসী নাগরিকরা এবং রক্ষীগণ ঘণ্টা ও শঙ্খ ধ্বনি করে সকলকে সতর্ক করতো। অধিকতর আপদে তুরী ভেরী ও শিঙা বাজানো হতো। ঐরূপ সতর্ককরণী শব্দ শোনামাত্র নগরের দ্বার ও উপদ্বারগুলি বন্ধ করা হতো। তাতে তস্করগণ নগরের বাইরে পালাতে পারে নি। বর্তমান কালে পল্লীগ্রামের এই উদ্দেশ্যে শাঁখ বাজানো হয় [প্রতিবেশীদের সাহায্যের জন্য]।

[বি. দ্র. কলিকাতা-পুলিশে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেও ভবানীপুর প্রভৃতি বড় বড থানার ছাদে প্রাচীন ভারতের ওয়াচ-টাওয়ারের মতো কাঠের তৈরি সুউচ্চ মইযুক্ত টঙ ছিল। নীল-কোর্তা ও ঝোলা টুপি-পরা জনৈক দমকল-কর্মী তার উপর হতে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখতো। কোথাও ধোঁয়া বা আগুন দেখলে সে নিচে নেমে থানাব প্রধানকে তা জানাতো। তখন ঘোড়া বা ঠেলা-গাড়ির [পবে মোটরের] দমকল আগুন নেভাতে ছুটতো। ভবানীপুব থানা তখন চাউলপটী ও বসা রেডের মোড়ে ছিল।]

বিকেন্দ্রিতদমকল তখন কলিকাতাতে থানাগুলিব অধীন। প্রাচীন ভারতের পুলিশের মতো কলিকাতা-পুলিশ তাদের কর্তব্য-কাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল অগ্নি-নির্বাপণেব কাজও করেছে। পরে সমগ্র দমকলবাহিনী লালবাজারের হেড-কোয়ার্টারসের ডেপুটির অধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পব উহা পৃথক একটি ডাইরেকটরের অধীন হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের মতো এ-যুগেও নানাবিধ পাহারার ব্যবস্থা আছে, যেমন—(এক) টহল তথা পেট্রল, (দুই) ফিক্সড পয়েন্ট, (তিন) একক ও বহুল, (চার) ক্রস ওযাইজ ও চক্রাকার, (পাঁচ) কোম্বিঙ ও অতর্কিত, (ছয়) জিগজাগ ও ওভার ল্যাপিঙ এবং (সাত) মুফতিতে বা ছদ্মবেশে ইত্যাদি।

কলিকাতা শহর প্রাচীর-বেষ্টিত না-হলেও ১৯৩৫ খ্রী. পর্যন্ত তাব সব কটি বহির্গমন রাজপথগুলির মুখে লক-গেট ছিল। শহরে মোটব-ডাকাতি হলে টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষীরা ঝটিতে ওই লক-গেটগুলি বন্ধ কবে তাদের বাইরে বেরুনো বন্ধ করতো। শহর হতে বহির্গমনমুখী প্রতিটি মোটর-গাড়ি তল্লাসী কবা হতো। থানা-অফিসাররা তখুনি শহরের রাস্তাগুলিতে ওই মোটব খুঁজতো। টালা-ব্রীজেব এপারে আজও ওইরকম খাড়া-কবা লক-গেট দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের লক-গেট রোড নামে একটি রাজপথ আজও আছে।

থানাগুলিতে একরকম বিকট শব্দকারী বাজার [Bazzar] ছিল। টেলিফোন-অফিস হতে প্রত্যেক থানায় বাজার তথা চোঙ-যন্ত্র একযোগে বাজানো হতো। প্রাচীন ভারতের শিঙা ফুকার মতো ভো-ভো শব্দে বাজার-যন্ত্র থানাগুলিতে একত্রে বাজতো।

কপিলাবস্তু আদি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের এবং পাটলীপুত্র আদি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রশাসনে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। কারণ, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের মতো রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগাভাগি সম্ভব নয়। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের ধর্মাধিকরণের অধীনে বিচার-বিভাগ এবং নগর-গুটিকার অধীনে পুলিশ বিভাগ পৃথক ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রী বাষ্ট্রে পুলিশ ও বিচার-বিভাগ একই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংস্থাব অধীন ছিল।

[মৌর্য-সম্রাটদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী এবং গুপ্তচর-বাহিনী বিভিন্ন সংস্থার অধীনে সম্রাটদের সাক্ষাৎ-নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই সংস্থা-প্রথা তথা কাউন্সিল ভারতে সৃষ্ট প্রাচীন

প্রথা। পুলিশ সেনাবাহিনী হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। স্থানীয় পুলিশ, পৌর-প্রতিষ্ঠান ও বিচার-বিভাগ সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।]

পাটলীপুত্র নগরে [খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম] নগরের প্রধান-কর্মচারীকে নগরিকা বলা হতো। বর্তমানকালের ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যায়। তাঁদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংস্থার অধীনে পুলিশ, পৌর প্রতিষ্ঠান ও বিচার-বিভাগ ছিল। নাগরিকরা নিজেরা বিচার করার অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু বিচারকদের এবং রক্ষীনদের তথা পুলিশের কাজেরও তাঁরা তদারকী করতেন।

পাটলীপুত্রে রক্ষীন তথা পুলিশকে অপরাধ-নির্ণয় ও শান্তিরক্ষার সঙ্গে অগ্নি-নির্বাপক-আইন আরোপণ এবং কনসারভেন্সি ও নগর-স্বাস্থ্যরক্ষার তদারকীও করতে হতো। প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরে সন্ধ্যার পর নাগরিকদের প্রদীপ-হাতে বার হতে হতো। তা না-হলে রক্ষীরা তাদের তখনই গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠাতেন।

পুরানো কলিকাতা-পুলিশও প্রাচীন ভারতীয় পুলিশের মতো শান্তিরক্ষা, অপরাধ-নিরোধ ও অপরাধ-নির্ণয়ের সাথে শহরের কনসারভেন্সীর তদারকী এবং অগ্নি নির্বাপণ ও হিংস্র পশু-নিধনের কার্য করতো। ঐ সময়ে কলিকাতাতেও জনৈক চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে জাস্টিস অফ পিসদের বিভিন্ন সংস্থার অধীনে পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং কনসারভেন্সী ছিল।

[চোলা তাম্র-শাসনে উল্লেখ আছে যে রাজপথ প্রহরায় নিযুক্ত রক্ষীদের বেতনের জন্য সম্রাট কলতুঙ্গা এক প্রকার রাজকর আরোপ করেন। বিজয়নগরের মহারাজারাও পুলিশের ব্যয় নির্বাহের জন্য নগরের বেশ্যা-নারীদের উপর কর ধার্য করেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রক্ষা ব্যবস্থার বহু উল্লেখ আছে।]

মৌর্য-সম্রাটদের গুপ্তচর সংগঠনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলবো। এর 'সংস্থা'-বিভাগ রাজনৈতিক অপরাধী এবং 'সঞ্চার'-বিভাগ সাধারণ অপরাধীদের সংবাদ দিতো। বিকেন্দ্রীত ও স্থানীয় গ্রামাণ ও নগর পুলিশগুলির প্রতি এদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। এরা বর্তমানকালীন সংযোগ-রক্ষাকারী ফেডারেল-পুলিশের সহিত তুলনীয়। দূরবর্তী প্রদেশগুলি [এদের দৌলতে] মৌর্য-সম্রাটদের নিরঙ্কুশ আয়ত্তে ছিল। এইরূপ প্রভাব মোগল ও রোমকদের দূর রাজ্যে থাকে নি। সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনী থাকাতে একালে বিদ্রোহ অসম্ভব ছিল।

মৌর্য-সম্রাটরা দূরবর্তী শাসকদের তহবিল-তছরুপ, ব্যভিচার, কুশাসন সম্পর্কিত প্রতিটি সংবাদ নিয়ত প্রাপ্ত হতেন। শাসকদের নিয়মিত বদলি-প্রথা মৌর্যদের সৃষ্টি। এতে কোনও প্রদেশ-কর্তা প্রবল হতে পারেন নি। তাতে উর্ধ্বতন ও অধীন-কর্মী উভয়েরই সুবিধা। বনিবনা না-হলে একের বদলিতে উভয়ের শান্তি হতো। গুপ্তচর-

পালন ও বদলি-প্রথা রহিত হওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। [বদলি-প্রথা রদের ফলে মোগল-সাম্রাজ্যেরও ধ্বংস হয়।] মৌর্য-রাজাদের গুপ্তচর-সংগঠনের সঙ্গে নাজীদের গেস্টাপো'র কিছুটা তুলনা চলে।

স্বর্গমর্ত্য পাতাল কিংবা ভূমিতল,
পালাবার পথ নাই সাথে আছে চর—
বহু পত্নীক তুমি বহু রাণী পরিবৃত,
কণ্ঠলগ্না করে তব বক্ষ অশ্রুসিক্ত।
রূপোপজীবিনীর আলিঙ্গনে মদিরা আহ্বানে
বিভোরে বলিছ তুমি তার কানে কথা।
গুরুশিষ্য সন্ন্যাসী কিংবা সহপাঠী,
ভৃত্য বিশ্বস্ত তব প্রেয়সী সেবিকা।
গুপ্তদলে উচ্চভাষী বান্ধব তোমার,
বৃক্ষতলে সাধুবাবা ভবিষ্যৎ বাণীদাতা।
আসমুদ্র হিমাচল পরিব্রজা তীর্থব্রতা
রজকিনী ভূষণ-বিক্রেতা দেহ-মর্দিকারা,
গায়িকা লাস্যময়ী ব্যাজনীকা-নারী—
মহাবিষধর ওরা বিশ্বস্ত রাজ-গুপ্তচর
গুহ্য লেখ পদে ওই উড়ে পারাবত।

মৌর্য সম্রাটদের গুপ্তচর বিভাগ দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল। যথা, (১) সংস্থা ও (২) সঞ্চার। সংস্থা-বিভাগটি রাজনৈতিক এবং সঞ্চার বিভাগটি সাধারণ অপরাধীদের [ক্রিমিন্যাল] দমন করতো। সংস্থা-বিভাগের সহিত বর্তমান স্পেশ্যাল-ব্রাঞ্চ বা ইনটেলিজেন্স-ব্রাঞ্চ এবং সঞ্চার-বিভাগের সহিত বর্তমান ডিটেকটীভ বা ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেটিঙ ডিপার্টমেণ্ট তুলনীয়।

সংখ্যাহীন ছদ্মবেশী বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের নর-নারী গুপ্তচর-বিভাগে যুক্ত থাকতো। সমগ্র ভারতে এদের অগম্য কোনও স্থান ছিল না। এদের প্রভূত অর্থ ইচ্ছামতো ব্যয়ের জন্য দেওয়া হতো। [একালেও সিক্রেট-সার্ভিস তহবিল গোয়েন্দা দপ্তরে আছে।] বহু ব্যক্তি এদের সাহায্যকারী রূপে এদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা লঘু বীণা-বাদ্য দ্বারা [বাদ্য-সংকেত] সর্ব-সমক্ষে পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলতো। 'বহু প্রকার গুহ্য-লিখন পদ্ধতি এবং শব্দ সংকেত ও ভাষায় এরা প্রাজ্ঞ ছিল। [এ যুগেও গোয়েন্দারা কোড-ওয়ার্ড ব্যবহার করে।] গুহ্য-লিপিসমূহ এরা শিক্ষিত পারাবতের সাহায্যে রাজধানীতে পাঠাতো।

(ক) সংস্থা-বিভাগ তথা রাজনৈতিক বিভাগ : এরা বহু উপ-বিভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন—এক. কপাটকা ছাত্র : কপট ছাত্রদের বেতনাদি রাষ্ট্র প্রদান করতো। দুই. উদস্থিতা : সন্ন্যাসী [বৈরাগী] চরদের উদস্থিতা বলা হতো। তিন. গৃহ-পটিকা : এরা সকলে গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থ চর ছিল। চার. বৈদেহিকা : এরা সকলে স্থিতিবান বা ভ্রাম্যমাণ বণিক-চর ছিল। বণিকদের ছদ্মবেশে এরা যত্রতত্র যাতায়াত করতো। পাঁচ. সাধু চর : সাধু চরেরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যয়বহুল প্রয়োজনীয় গুপ্তচর ছিল।

সাধু চরেরা জটাজুটধারী ও মুণ্ডিত কেশ হতো। এদের সংখ্যা কয়েক সহস্র পর্যন্ত ছিল। ভবিষ্যৎ-বক্তা ও গণৎকার রূপে গ্রামে গ্রামে এবং নগরে প্রাসাদে, ধনীগৃহে ও গৃহস্থদের ঘরে এরা যেতো। বটবৃক্ষতলে বসে সম্রাটের পক্ষে এরা নানাবিধ প্রচারকার্যও করেছে। [এযুগে সরকার-পক্ষের কিছু সংবাদপত্র ও নেতারা সেই কাজ করে।] দুর্ভিক্ষ, মারী, মড়ক ইত্যাদির জন্য এরা বিরোধী মন্ত্রীদের দায়ী করে ভবিষ্যৎবাণী দিতো। যথা : অমুকের পাপে এই-এই হলেও সম্রাটের পুণ্যে বেশি ক্ষতি হয় নি। প্রচারবিদরূপে সম্রাটের পক্ষে এরা প্রদেশে-প্রদেশে জনমত গঠন করতো। নগর-রক্ষী ও গ্রাম-রক্ষীদের কাজের উপরও এদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

(খ) সঞ্চার-শাখা : এরা সাধারণ অপকর্মের অপরাধীদের ও তাদের দ্বারা অপহৃত বা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সন্ধান করতো। এই বিভাগটিও বহু উপ-বিভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন : এক. রসোদা। এই দলে নীচ অপরাধী, দস্যু তস্কররা ও চোরেরা ছিল। দুই. প্রব্রাজিকা। ছদ্মবেশিনী নারী সন্ন্যাসিনীরা। এরা সহজে সকল গৃহে নানা অজুহাতে যেতে পারতো। তিন. সুভাগা। এরা ছদ্মবেশী পুরুষ-গোয়েন্দা। এরা বহু গুপ্তশাস্ত্রবিদ ছিল। ভারতীয় জাত-গোয়েন্দা খোজী-সম্প্রদায় নিজেদের এদের উত্তরাধিকারীরূপে দাবী করে।

উপরোক্ত গুপ্তচরগণ বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা (১) সুদা : এরা বিবিধ খাদ্য ও শিল্প প্রস্তুতকারক। (২) আবালিকা রাঁধুনী (৩) স্নপকা : জলবাহী (৪) কল্পকা : ক্ষৌরকার (৫) প্রসাদকা : টয়লেট প্রস্তুতকারক (৬) নর্তকী, গায়ক, মূক, বধির প্রভৃতি। এরা ছদ্মবেশে মন্ত্রী সেনাপতি প্রধান কর্মচারী প্রভাবশালী ব্যক্তি, বণিক শত্রুমন্য ব্যক্তি ও সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে যেতো। এদের বিবিধ প্রকার গুহ্য-লিপিকাকে ঐকালে সংজ্ঞা-লিপিভি বলা হতো।

গুপ্তচরগণ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দুই দল গুপ্তচর একই সংবাদ দিলে উহা বিশ্বাস্য হতো। সময়ে সত্য-সংবাদ দিতে পারলে এরা যথোচিত ভাবে পুরস্কৃত হতো। কিন্তু মিথ্যা বা ভুল সংবাদ দিলে এরা নির্মম শাস্তি পেতো। এদের দেওয়া সংবাদ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা যাচাই করা হতো।

বর্তমান পুলিশেও অপরাধীদের এবং ভদ্রজনদের মধ্য হতে সমভাবে গুপ্তচর তথা

ইনফরমার নিযুক্ত হয়। এদের সাহায্যে বহু দুরূহ মামলার কিনারা করা হয়েছে। প্রভেদ এই যে তৎকালীন বেতনভুক তস্কর চোররা রক্ষীদের বিশ্বস্ত থাকতো। অন্যথায় তাদের নির্মমভাবে শাস্তি গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু একালে মিথ্যা-সংবাদদাতারা কেবল বিতাড়িত হয়। উপরন্তু অর্থ-লোভী তস্কর-চোররা আস্কারা পেয়ে দশটি অপকর্ম নিজেরা করে মাত্র দুইটি অপকর্ম সম্বন্ধে রক্ষীদের খুশী করতে সংবাদ দেয়। তাও নিজেদের দল বাদে বিরোধী দলগুলোকেই তারা ধরায়। এদের নির্মূল করলে দশটি অপকর্মের বদলে মাত্র দুইটি অমীমাংসিত অপকর্ম হবে। সে যুগের মতো অনেস্ট তথা সাধু-চোর এ যুগে পাওয়া কঠিন। ওদের কেউ কেউ নিজেরাই দল তৈরি করে দলের লোককে ধরিয়ে অর্থ উপায় করে।

উত্তর-রামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিকা, কীরাতার্জুন, শিশুপাল-বধ, ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন পুলিশী-ব্যবস্থা, আইন-সমূহ তথা দণ্ডবিধি এবং প্রশাসন, বিচার ও গুপ্তচর সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

একটি উপসভা তথা কাউন্সিলের অধীনে সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গুপ্তচরেরা নিযুক্ত ছিল। জনৈক নগররক্ষী অঙ্গুরী উদ্ধার করাতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন সম্ভব হয়। গোয়েন্দা-ব্যবস্থা আর্যদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে অথর্ববেদের IV 16. 1—দ্র.।

সন্ন্যাসী-চরেরা অপরাধমুখী ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে ধর্মোপদেশ দ্বারা তাদের সংশোধন করতেন। অপরাধীরা বিশ্বাস করে তাদের নিকট পাপ-স্খালনের আশায় অপরাধ স্বীকার করতো। সম্রাট অশোক প্রজাদের নৈতিক মানের উপর লক্ষ্য রাখতে একশ্রেণীর রাজপুরুষকে নিযুক্ত করেন। বহু স্থানে উপদেশ-সংবলিত পর্বত-শিলা স্তম্ভাদিও তিনি স্থাপন করেন। চরিত্র সংশোধনের জন্য সন্ন্যাসী-চরদের সংখ্যা [কয়েক সহস্র] অত্যন্ত অধিক ছিল। এই-সব সন্ন্যাসী-চরেরা কিশোর-অপরাধীদের মঠে রেখে চরিত্র সংশোধন করতো। স্বয়ং বুদ্ধদেব দুর্ধর্ষ দস্যু অঙ্গুলীমালাকে সৎ করেছিলেন [বিনোবা ভাবের মতো]। সম্রাট অশোক তাঁর পিতা ও পিতামহ-সৃষ্ট ব্যয়বহুল সন্ন্যাসী-চরদের ওইরূপ সংশোধন-মূলক কাজে ব্যবহার করতেন।

উপরোক্ত কারণে মৃত্যুর পূর্বে তস্কর-লোহাকুরা তার তস্কর-পুত্রকে সন্ন্যাসীদের সংসর্গে না আসতে উপদেশ দিয়েছিল। [মহাবীর চরিত্র, সর্গ ১১, ১—১১০ দ্র.] লোহাকুরা তস্কর সেই সময় রাজগৃহের নিকট বৈভবা পর্বতের এক গুহায় বাস করতো। তার পুত্রও একজন দক্ষ তস্কর ছিল। কিন্তু তাকে জৈন-সন্ন্যাসীরা সৎপথে আনে। সে তখন জনগণ-সমক্ষে পর্বতগুহা, নদীতল, স্তম্ভমূল, কবরস্থান ও অন্যান্য স্থান হতে বহু লুক্কাইত

অপহৃত দ্রব্যাদি তার পূর্বস্বীকৃতি মতো বার করে দেয়। সেকালে গৃহ-তল্লাসীতে তথা হৃত-দ্রব্য উদ্ধারে সমগ্র জনগণ সাক্ষী হতো। এযুগে গৃহ-তল্লাসীতে সাধারণত দু'জন স্থানীয় ব্যক্তি সাক্ষী থাকে।

গুপ্তচরগণ কখনও পরস্পরের সহিত পরিচিত থাকতো না। দু'দল গুপ্তচরের সংবাদ এক হলে তবে বিশ্বাস করা হতো। তা সত্ত্বেও ব্যবস্থা-গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্ত করে সংবাদ যাচাই করা হতো। সেকালে মিথ্যা বা ভুল সংবাদ দিলে সংবাদদাতাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো। সত্য-সংবাদ সত্যরূপে বুঝলে তারা যথাযথভাবে পুরস্কৃত হতো।

[বর্তমান কালেও গুপ্তচরদের পরস্পরকে চেনার নিয়ম নেই। এদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দিনে ও সময়ে সাক্ষাৎ করা হয়। তার আগে বুঝতে হয় ওই সংবাদ তার পক্ষে জানা সম্ভব কিনা। কিছু ক্ষেত্রে অফিসাররা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে সংবাদ একরূপ করে। কিন্তু তাতে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। গুপ্তচররা সরকারী কর্মী না-হওয়াতে তাদের শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা-সংবাদের জন্য তাদের মাত্র বিদায় করে দেওয়া হয়। এ-যুগের মতো সে-যুগেও এক্সপোজড হওয়া চরদের বিতাড়িত করা হতো।]

বি. দ্র. সম্রাট অশোকের পন্থায় বাংলার উপ-রাজা বল্লাল সেন [১২৫৮-১১৭৯ খ্রী.] সীমিত ক্ষেত্রে মাত্র কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের মান রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য বংশগত উপাধির মতো নৈতিক ক্ষেত্রে কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি করেন। কিন্তু ওই প্রথা অধঃপতি হয়ে গুণগত না-হয়ে বংশগত হয়। বলাবাহুল্য যে এই প্রথা সীমিত ক্ষেত্রেও সফল হয় নি। উনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের পিতা ও বিজয় সেনের পুত্র।

প্রাচীন ভারতে বেশ্যাপল্লীর জন্য পৃথক আরোপক সংস্থা [Brothel Police] ছিল। জনৈক বেশ্যাধ্যক্ষ তথা বেশ্যার সুপারিনটেণ্ডেণ্টের উপর উহার ভার অর্পিত হয়। প্রয়োজন হলে এঁরা নগরের নগর-রক্ষীদের সাহায্য গ্রহণ করতেন। বর্তমান মিউনি-সিপ্যাল কোর্টের মতো বেশ্যাদের জন্য পৃথক আদালত ছিল। বেশ্যাদের চৌদ্দ বৎসর বয়স হতে নৃত্যগীত ও বাদ্য শিক্ষা দেওয়া হতো। এদের সুন্দরী সুদেহী সদালাপী ও ভদ্রা হতে হতো। এদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে রাষ্ট্র সাহায্য করেছে। রূপহীন হলে ওদের সেবিকা [নার্স], মালাকার ও গুপ্তচররূপে নিযুক্ত করা হতো। তাতে সর্বক্ষেত্রে ওদের ইচ্ছার উপরই প্রাধান্য দেওয়া হতো। বেশ্যা-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও তাঁর অধীন ব্যক্তিরা বেশ্যাদের দুর্জনদের হাত থেকে রক্ষা করতো। এদের আয়ের হিসাব রেখে উহা হতে আয়-অনুযায়ী রাজা কর নিতেন [পৃথিবীর প্রথম আয়-কর]। রূপো-

জীবিনী তথা বেশ্যানারীর ঐ যুগে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য ছিল।

অর্থ নেওয়ার পর উপপতিকে সুখী না-করলে বেশ্যাদের অর্থদণ্ড হতো। অন্য দিকে—এদের উৎপীড়ন করলে উপপতিরা দণ্ডিত হতেন। ইচ্ছামতো এরা বিবাহ করে গৃহস্থ জীবন-যাপন করতো। উত্তরাধিকারী না-থাকলে এদের ধন-সম্পদ রাজকোষে গৃহীত হতো [আজও তাই হয়।] এদের মধ্য হতে কেন্দ্রীয়-নারী গুপ্তচর সংগৃহীত হতো। এ জন্য এদের নগর-রক্ষীদের এক্তিয়ারে রাখা হয় নি।

এ-যুগেও পুলিশ্ বেশ্যাদের নিকট হতে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে। তস্করগণ ও প্রবঞ্চকরা বৃহৎ অপকর্মের পাপার্জিত অর্থসহ বেশ্যাগৃহে এসে আমোদ করে! কিছু ক্ষেত্রে বেশ্যা-সম্ভোগের জন্যই তারা অপকর্ম করে। ঐ সম্পর্কিত সংবাদ বেশ্যাদের নিকট হতে সংগ্রহ করে কলিকাতা ও বাংলা পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

বেশ্যাদের প্রাচীন ভারতে শ্রেণীগতভাবে বিভক্ত কবা হতো। রূপলাবণ্য, নৃত্যগীত, ভাষা-জ্ঞান, ধনসম্পত্তি, শিক্ষাদীক্ষা ও আযব্যয়, কটিদেশ ও বক্ষের মাপ, দৈহিক গঠন, বয়স, স্বাস্থ্য ও ব্যবহারের উপব তাদের বিভাজন হতো। এরা সকলেই নির্বিচার যৌন-মিলনে উদ্‌গ্রীব ছিল না। এদের বহু নাবী একটিমাত্র প্রেমিককেই শুধু বেছে নিয়েছে। কেউ-কেউ স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিদেব মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখেছে। বহু-গুণসম্পন্না না-হলে সে-যুগে বেশ্যা হওয়া যেতো না।

বি. দ্র কলিকাতার সোনাগাছি রামবাগান প্রভৃতি বনেদী বেশ্যাপল্লীতেও অনুরূপ বেসরকারী বিভাজন আছে। যেমন—এক : বাঁধা, দুই : টাইমের ও তিন : ছুটা। যারা একজনের রক্ষিতা তারা বাঁধা। দু'জন বা তিনজন উপপতি তথা বাবু থাকলে সেই নারী টাইমের। একজন সোম ও মঙ্গল, দ্বিতীয় জন বুধ ও বৃহস্পতি এবং তৃতীয়-জন শুক্র ও শনিবার আসেন বা থাকেন। রবিবার ওদের ছুটি বা রেস্ট। বাবু-বদলের সময় বাবুদের মধ্যে পান-বিনিময় হয়। তারপর তারা চার্জ মেক্-ওভার ও টেক্-ওভার করে সেকহ্যাণ্ড করে বিদায় নেন। যে-সব নারী প্রেম-বিবর্জিতভাবে অর্থের জন্য নির্বিচারে নাগরকে গ্রহণ করে তারা ছুটা-বেশ্যা। এ-যুগের আইনে প্রেমবিবর্জিত শুধু অর্থের বিনিময়ে যৌন-সঙ্গমকে বেশ্যা-বৃত্তি বলা হয়। কিন্তু কেবল প্রেমের জন্য তা ঘটলে আইনত তারা বেশ্যা নয়। সে-যুগের সতী, দ্বিচারিণী, স্বৈরিণী প্রভৃতি নারী-শ্রেণীও এখানে উল্লেখ্য। পাঁচজনের বেশি উপপতি আছে এমন নারীকে বেশ্যা বলা হতো। পাঁচের অধিক উপপতি নারীদের মধ্যে যৌনজ কারণে বন্ধ্যাত্ব আনে।

এ-যুগে শাসক-নিযুক্ত লৌহচরিত্র সদস্য-সহ কোনোও ব্রথেল-পুলিশ নেই। কলিকাতা-পুলিশে গোয়েন্দা-বিভাগে একটি ব্রথেল-সেকশন আছে। তারা মাত্র ভদ্রপল্লীতে বেশ্যা-লয় স্থাপন নিবারণ করে। কিন্তু পৃথিবীতে ভ্যাকুয়েমের কোনোও স্থান নেই। তাই

বেশ্যারা নিজেদের রক্ষণার্থে এক প্রকার প্রাইভেট-পুলিশ তৈরি করেছে। রামবাগান ও সোনাগাছি প্রভৃতি স্থানে বেশ্যাদের সম্মতি-ক্রমে বাড়িউলী মা'দের সংস্থা আছে। বাড়িউলীদের মধ্য হতে একজনকে সমাজ-নেত্রী করা হয়। দুপুরে এদের পঞ্চায়েৎ ও বিচার-সভা বসে। প্রত্যেক বেশ্যা এই সংস্থাকে মাসিক চাঁদা দেয়। তা থেকে বারোয়ারী পূজা, রুগ্ন বেশ্যাদের চিকিৎসা, [বেশ্যা-নারীদের দ্বারা] বেশ্যাদের মৃত-দেহ বহন ও সৎকার, কাউকে পুলিশ ধরলে উকিল-খরচ ও জামিনের ব্যবস্থাদি করা হয়। কারণ—এদের ডাকে প্রায়ই পুলিশ তাচ্ছিল্য করে সময়ে আসে না।

বাড়িউলীরা নিজ-নিজ বাড়ির প্রাথমিক শান্তি-রক্ষা ভৃত্যদের সাহায্যে করে। উন্মত্ত মাতাল ও তস্করদের কবল হতে নারীদের রক্ষার জন্য এরা গৃহস্থ-গুণ্ডাদের মাসিক মাহিনায় রাখে। এরা বেশ্যা-পল্লীর নিকটে সপরিবারে বাস করে। ভৃত্যদের দ্বারা সংবাদ পাঠানো মাত্র এরা ঘটনাস্থলে সদলে এসে অবাঞ্ছিতদের দূর করে দেয়। এই ব্যবস্থাকে এদের বেতনভুক প্রাইভেট-পুলিশ বলা হয়। প্রাইভেট পুলিশের মতো এদের নিজেদের আদালতও আছে। একজনের বাবু অন্যজন ভাঙিয়ে নিলে, নাবালক বালকদের কেউ উপপতি করলে, উপপতির পিতা বা পুত্রকে গৃহে রাখলে, বিধর্মী ও তস্করদের এরা স্থান দিলে, উপপতিদের সহিত খারাপ ব্যবহার করলে, [এতে পাড়ার বদনাম] বাড়িউলী পঞ্চায়েৎ বিচার করে এদের জরিমানা করে।

প্রাচীন ভারতের বেশ্যারা ছলা-কলাবতী হলেও এ যুগের মতো সমাজে এতটা ঘৃণ্য ছিল না। এ-যুগের মতো সে-যুগেও ধনীদের পৃথক বাগানবাড়ি ছিল। সে-যুগেও স-বন্ধু ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্য এরা নৃত্যগীত করতো। এরা নিজেরাও বহু বাগান-বাড়ির [উদ্যান বাটিকা] অধিকারিণী ছিল। সে-যুগে যৌন-রোগ না-থাকায় নাগরিক-গণ ও করদাতারা মহাসুখী ছিল। সে-যুগে বেশ্যারা ধর্মকর্মে অর্থ ব্যয় করতো। বেশ্যা আম্রপল্লী তথাগত বুদ্ধদেবকে একটি বাগানবাড়ি দান করেছিল। এ-যুগেও বহু বেশ্যা-নারী দান-ধ্যান ও পূজা-ধর্মচর্চা করে।

বারাণসী নগরে সোমা নামে এক অতি-সুন্দরী বেশ্যানারী ছিল। প্রতি রাত্রে সে উপপতিদের নিকট সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করতো। রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠী-প্রধানদের সে অতি প্রিয়পাত্রী ছিল। ওই বেশ্যানারীর পাঁচশত পরিচারক ও পরিচারিকা ছিল। সে এক সুদেহী তস্করের প্রেমে পড়ে। সেই তস্কর তাকে ভুলিয়ে এক বাগানবাড়িতে এনে তাকে অচৈতন্য করে তার অলঙ্কার অপহরণ করে পালায়। বারাণসীর অন্য-এক সুদর্শনা বেশ্যানারী সুলতাকেও জনৈক দস্যু-উপপতি সুবিধাজনক স্থানে এনে অচৈতন্য করে তার দেহ হতে যাবতীয় অলঙ্কার অপহরণ করে [প্রসটিটিউট ড্রাগিং কেস]। এর বিপরীত ঘটনাও মধ্যে মধ্যে ঘটেছে। জনৈক বেশ্যানারী তার

ধনী-উপপতিকে হত্যা করে তার সর্বস্ব আত্মসাৎ করেছিল। মগধের পরমা-সুন্দরী [রাজা বিম্বিসারের প্রিয়] আম্রপল্লী নামে বেশ্যানারী প্রতি রাত্রে পঞ্চাশ খর্পনা [পঞ্চাশ টাকা] অর্থ গ্রহণ করতো। উজ্জয়িনীর পরমাসুন্দরী ও গুণবতী বেশ্যানারী মগধরাজ বিম্বিসারকে মুগ্ধ করে। রাজগৃহের সুন্দরী বেশ্যা পদ্মাবতী প্রতিরাত্রে এক-শত খর্পনা [একশত টাকা] গ্রহণ করতো।

রাষ্ট্র-নিযুক্ত বেশ্যা-অধিকারীগণ [সুপারিনটেনডেণ্ট] ইচ্ছুক-বেশ্যাদের মাসিক বেতনে রাজকার্যে নিযুক্ত করতো। ফুলের মালা গাঁথতে এরা পারদর্শী ছিল। দুষ্টা বেশ্যারা অলংকারে বিষ-মিশ্রিত করে তার আঘাতে প্রাণনাশ করতে পারতো। অধিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য তারা ও-রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। এজন্য মৌর্য-সম্রাটরা বেশ্যা-পল্লীতে ভ্যাকুয়েম না-রেখে ব্রথেল-পুলিশ তৈরি করেন।

[এ-যুগেও বেশ্যাপল্লীতে বহু অপরাধ সংঘটিত হয়। ওদের জন্য পৃথক আরোপক-সংস্থা না-থাকলেও কলিকাতা ও বাংলা-পুলিশ ওদের পল্লীর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখে। এ-যুগেও তস্করেরা মদে বিষ মিশিয়ে এদের অচৈতন্য বা হত্যা করে অলংকারাদি অপহরণ করে। প্রতি বৎসর পূজার সময় বেশ্যাপল্লীতে ওই সকল অপরাধের সংখ্যা বাড়ে।

তবে এ যুগের উচ্চ-শ্রেণীর বেশ্যাদের ফিস্ (Fees) প্রাচীন ভারতীয় বেশ্যার মতো অত বেশী নয়। প্রাচীন ভারতীয় বেশ্যারা এ-যুগের ব্যারিস্টারদের মতো উপার্জন করতো। কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর বেশ্যারা দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও ঘণ্টা-পিছু মাত্র দশ টাকা ফিস ধার্য করে। [বেশ্যারা মরে চোরকে ভালোবেসে এবং চোররা মরে বেশ্যাদের বিশ্বাস করে।]

প্রাচীন ভারতে প্রতিটি অপরাধের তদন্ত করার রীতি ছিল। তদন্ত দ্বারা অপরাধ সত্য বুঝলে রক্ষীরা অপরাধীদের প্রমাণাদি সহ বিচারার্থে বিচারালয়ে প্রেরণ করতো। প্রাচীন তদন্ত-রীতির সহিত বর্তমানকালীন কলিকাতা ও প্রদেশ-পুলিশের তদন্ত-রীতির কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সম্পর্কে মহাবীর চরিত্র, সর্গ ১১, ১-১২০ দ্র.।

রোহিণীয়া নামক তস্করের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে নাগরিকরা রাজসমীপে অভিযোগ করলে উপরাজা শ্রেণীক নগরের রক্ষী-প্রধানকে ডেকে ভৎর্সনা করে বললেন— 'তোমাদের বৃথাই রাজকোষ হতে বেতন দেওয়া হয়। তোমরা নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থে অপারগ।' [এ-যুগেও ঊর্ধ্বতনরা ওরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ বলেন।] প্রত্যুত্তরে পুলিশ-প্রধান উপরাজাকে সবিনয়ে নিবেদন করলো, 'মহারাজ! রোহিণীয়া ছাদ-হতে-ছাদে বাঁদরের মতো লাফায়। তারপর নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে নিচে নামে। [ক্যাট্ বার্গ্লার] আমরা দৌড়ে তাকে ধরতে বা নিহত করতে পারি

না।' [এ-যুগেও পুলিশ ঐরূপ কৈফিয়ত উর্ধ্বতনদের দেয়।]

রক্ষীন-পুঙ্গবদের সহিত মন্ত্রণা সভা বসলো। [এ-যুগেও ঐরূপ মিটিং বসে] তারপর তস্কর রোহিণীয়াকে ধরার জন্যে প্রয়োজনীয় [Trapping] ব্যবস্থা গৃহীত হলো। [এ-যুগেও ঐরূপ পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়]।

পর রাত্রে প্রাচীরের বহির্দেশে সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা হলো। শহরের ভিতরে রক্ষীকুল তথা পুলিশ সতর্ক রইলো। রাত্রে রোহিণীয়া গোপনে নগরে প্রবেশ করলে পুলিশের তাড়ায় সে বাইরে লাফালো। কিন্তু প্রাচীরের বাইরে অপেক্ষমাণ সেনা-বাহিনী তাকে ঘিরে ফেললো।

এ-যুগেও পুলিশের সাহায্যে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। সে-যুগে পুলিশ তথা রক্ষী ও সেনাবাহিনী যে পৃথক সংগঠন তা এই কাহিনীটি প্রমাণ করে।

সকালে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রক্ষী-প্রধান তস্করপ্রবর রোহিণীয়াকে উপরাজ-সমীপে আনলে তৎক্ষণাৎ তার একটি বিবৃতি [Statement] গ্রহণ করা হলো। সুষ্ঠু তদন্ত ব্যতিরেকে কাউকে বিচারালয়ে পাঠাবার রীতি ছিল না। প্রথমে পুলিশী তদন্ত এবং প্রমাণ সংগ্রহ। তারপর বিচার ও দণ্ডের নিয়ম। সে-যুগের মতো এ-যুগেও অপরাধ-তদন্ত ওইভাবে করা হয়। তস্কর রোহিণীয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছিল :

'আমার নাম দুর্গা চন্দ। কালিগ্রামের আমি এক গৃহস্থ। আমি ব্যবসায়িক বিষয়ে নগরে আসি। রাত্রে ক্লান্ত হয়ে এক মন্দিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙার পর আমি ঘরে ফিরতে যাচ্ছি। হঠাৎ রক্ষীকুল আমাকে তাড়া করলেন। আমি ভয় পেয়ে নগর-প্রাচীর ডিঙাই। সেখানে সৈন্যরা আমায় ধরে ফেললেন। আমি নিরপ-রাধী হওয়া-সত্ত্বেও ওরা আমাকে এখানে শুধু ধরেই আনে নি। তারা আমাকে এখানে বেঁধেও এনেছে। এমন-কি অন্যায়ভাবে প্রহার পর্যন্ত করেছে। [এ-যুগেও অপরাধীরা ওইরূপ মিথ্যা-প্রহারের অভিযোগ করে।]

উপরোক্ত বিবৃতিটি গ্রহণের পর তাকে কারাগারে পাঠানো হলো [জেল-হাজত]। উপরাজা শ্রেণীক তৎক্ষণাৎ জনৈক রক্ষীকে তার গ্রামে তার চরিত্র ও বৃত্তি আদি সম্বন্ধে তদন্ত করতে পাঠালেন। সুবিচারের জন্যে ওই বিবৃতি-সমূহের সত্যতা তৎ-ক্ষণাৎ যাচাই করা হতো। এ-যুগেও কলিকাতা-পুলিশে ওইরূপ তদন্ত কার্য করা হয়ে থাকে।

তস্কর-প্রবর রোহিণীয়া তার গ্রামবাসীদের তার পক্ষ অবলম্বনের জন্য আগে থেকেই শিখিয়ে রেখেছিল। গ্রামবাসীরা বললে যে দুর্গা চন্দ ওই গ্রামের অধিবাসী। তার গৃহ ও কাজকর্ম আছে। তার স্বভাব-চরিত্র অতি সৎ। ওইদিন জরুরী কাজে সে

অন্য গ্রামে গেছে।

কলিকাতা ও প্রদেশ-পুলিশকর্মীর মামলা-সংক্রান্ত ডায়েরি পড়লে হুবহু উপরোক্ত রূপ তদন্ত-রীতিই পরিলক্ষিত হয়। পাহারা দ্বারা অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি। অপরাধ-নির্ণয়ে প্রাচীন ভারতে ফোরেনসিক-সায়ান্সের সাহায্য নেওয়া হতো। একটি সুপ্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

এক মালিনী ও এক রজকিনীর মধ্যে কার্পাস সূত্রে গ্রথিত একটি স্বর্ণ গুটিহারের দখলী-স্বত্ব নিয়ে বিবাদ বাধলো। স্নানের ঘাটের চাতালে ওই গুটিহারটি রাখা ছিল। স্নানের পর উপরে উঠে দু'জনেই সেটি নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করলো। নগর-কোটাল তাদের দু'জনকে গুটিহার-সহ উপরাজার নিকট আনলে তিনি ফোরেনসিক-বিদ্যা প্রয়োগে মামলার নিষ্পত্তি করে দিলেন।

রাজা একটি কাঁচ-পাত্রের তিন-চতুর্থাংশ জলে পূর্ণ করলেন। তিনি গুটিহার হতে কার্পাস সূত্র ছিন্ন করে করে সেটি ওই জলপূর্ণ পাত্রে রাখলেন। তারপর ঢাকনা দিয়ে পাত্রটি আবৃত করা হলো। জলের উপরিভাগ ও ঢাকনার নিম্নাংশের মধ্যবর্তী কিছুটা ফাঁক [Air-space] রাখা হয়েছিল। ফলে, দ্রবীভূত গন্ধকণা জলবাষ্প-সহ ধীরে ধীরে সেই ফাঁকে জমা হয়ে ঘনীভূত হয়। কিছু পরে পাত্রের ঢাকনা খুলে জলবাষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করে রাজা ওই হার মালিনীর সম্পত্তি বলে রায় দিলেন।

মালিনী বৃত্তিগতভাবে অহরহ ফুল তোলে ও ফুলের মালা গাঁথে। তাতে ধীরে ধীরে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অদৃশ্য ফুলরেণু ও গন্ধকণা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণগুটির মধ্যে ঢুকে ওই কার্পাস সুতায় অলক্ষ্যে সন্নিবেশিত হয়। সিক্ত কার্পাস সূতার গন্ধকণা জলেতে দ্রবীভূত হয়ে জলবাষ্পের সঙ্গে উপরে উঠে ঘনীভূত হয়। তাই অত সহজে রাজা হারটি মালিনীর সম্পত্তি রূপে বুঝতে পেরেছিলেন।

ফোরেনসিক সায়ান্স এখন বহুগুণে উন্নত। দ্রব্যাদি সনাক্তকরণে ও অপরাধ-নির্ণয়ে কলিকাতা ও প্রদেশ-পুলিশ তার সাহায্য গ্রহণ করে। একটি রক্তকণা, একটি কেশ, কিছু ভস্ম ও মৃত্তিকা-কণা, কাঁচের টুকরো ইত্যাদি অধুনা ঘটনাস্থল হতে পুলিশ উদ্ধার করে বহু মামলার কিনারা করেছে। প্রাচীন ভারতে তার মূলসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীনিদের পদচিহ্নের মধ্যে রাধার পদচিহ্ন চিনতে পারতেন। মৌর্য-রাজাদের গুপ্তচররাও ওই বিদ্যা জানতো। ভারতীয় খোঁজি-সম্প্রদায় [জাত-গোয়েন্দা] পদ-চিহ্ন-বিদ্যার স্বীকৃত আবিষ্কারক। এখন পৃথিবীর সর্বরাষ্ট্রের পুলিশে এটি সমাদরে গ্রহণ করা হয়েছে।

[এ-যুগে তদন্ত হয় দু'রকমে। যেমন—এক. অগ্রগামী এবং দুই. পশ্চাদ্‌গামী। একে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তদন্তও বলা হয়।

অগ্রগামী তদন্তে ঘটনাস্থলে প্রথমে চক্রাকারে ও পরে মধ্যস্থল পরিদর্শন করে অপরাধীদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি এবং অকুস্থল হতে সংগৃহীত দ্রব্যাদি, পদচিহ্ন ও অঙ্গুলি টিপ ইত্যাদি গ্রহণ করে সংরক্ষিত করা হয়। তারপর প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে আসামীকে খুঁজে গ্রেপ্তার করে তার বিবৃতি-গ্রহণ বা আদায় করা হয়। সেই বিবৃতি-মতো চোরাই-মালের গ্রহীতাকে গ্রেপ্তার করে তার বাড়ি বা দোকান তল্লাস করে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু পশ্চাদ্‌গামী-তদন্তে প্রথমে গোয়েন্দা বা ইনফরমারের সাহায্যে চোরাই দ্রব্য গৃহাদি তল্লাস করে তা উদ্ধার করে তার গ্রহীতাকে পাকডাও করা হয়। তারপর সেই বামাল-গ্রহীতার বিবৃতি মতো প্রকৃত চোরকে খুঁজে গ্রেপ্তার করার রীতি। সেই ধৃত তস্করের বিবৃতি মতো ঘটনাস্থলে ফরিয়াদীকে খুঁজে তাকে দিয়ে তার দ্রব্য সনাক্তকরণ করানো হয়।]

দেহ-তল্লাস, খানা-তল্লাস তথা গৃহ-তল্লাস, ওয়াচ ও ফলো করা, ট্রাপিং এবং সনাক্তকবণ ও দ্রব্য-সনাক্তকরণ তদন্ত-কাজের এক-একটি অঙ্গ। অপহৃত সমস্ত দ্রব্য অনুরূপ অন্য দ্রব্যের সঙ্গে একত্রে রেখে মালিককে তার জিনিসগুলি চিনতে বলা হয়। মুখোশপরা ডাকাতকে রাত্রে চিনতে পারা সম্ভব নয়। তখন মিছিলে [T.I.Parade] দাঁড়ানো লোকেদের পিছনে সাক্ষীদের একে-একে এনে তাদের একে-একে নাম বলতে বলা হয়। তাদের গলার স্বব শুনে সাক্ষীরা প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করে।

কয়েকটি প্রাচীন ভারতীয় গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে শাসনের কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমাধা করা হতো। তাতে একটিও নিরপবাধ ব্যক্তির দণ্ড সম্ভব ছিল না। [ছয় শত খ্রী. পূ.]। এজন্য বিচারকদের প্রভাবিত হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষী দ্বারা মামলা প্রমাণ করা অসম্ভব ছিল।

একদল রাজপুরুষ অপরাধী ও সাক্ষীদের পূর্ণ বিবৃতি গ্রহণ এবং তার সত্যতা প্রকাশ্য ও গোপন তদন্ত দ্বারা যাচাই করতেন। অপরাধীরা নির্দোষী বুঝলে তাদের তখনই মুক্তি দেওয়া হতো। কিন্তু কাউকে দোষী বুঝলে নিজেরা দণ্ড না-দিয়ে তাকে অন্য বিচারক-সংস্থার নিকট তাঁরা পাঠিয়ে দিতেন। ওঁরা ওদের অপরাধ সম্বন্ধে পুনরায় তদন্ত করতেন এবং নির্দোষ বুঝলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতেন। কিন্তু তাঁরা দোষী বুঝলে বিচারের জন্য এক বিচারক-মণ্ডলীর নিকট তাদের পাঠাতেন। সেই বিচারক-মণ্ডলী সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দোষী বুঝলে অপরাধীদের জনৈক উপরাজার [Sub-king] নিকট উপস্থিত করতেন। উচিত বুঝলে তিনি আবার তাদের শেষ-বিচারের জন্য রাজার নিকট পাঠাতেন কিংবা নিজেই বিচারের পর দণ্ড দিতেন। ব্যাপারটি কিছুটা এ-যুগের নিম্ন-কোর্ট ও সেসন-কোর্টের মতো ছিল। এই রাজা ও উপরাজা

বংশগত না-হয়ে দেশের প্রধানদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। এঁরা দু'জন [রাজা ও উপরাজা] বর্তমান রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তুলনীয়!
[পুরোনো কলিকাতাতেও পূর্বের মিসডিমনার ডিপার্ট কিছু মামলা নিজেরা বিচার করে বাকিগুলি ফেলনি-ডিপার্টে বিচারের জন্য পাঠাতো। ফেলনি-ডিপার্ট কিছু মামলা নিজেরা বিচার করে বাকিগুলি সুপ্রীম-কোর্টে পাঠাতো। উক্ত প্রতিটি বিভাগে তথা সংস্থায় দু'জন জাস্টিস অফ্ পিস একসঙ্গে বিচারে বসতেন।]
মৌর্য-পূর্ব যুগে রচিত বৃহস্পতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে সেইকালে একজন বিচারক দ্বারা বিচারের কাজ রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। দণ্ডসমূহ অতি কঠোর হওয়ায় ভুল-বিচারের সুযোগ দেওয়া হয় নি। প্রতিটি বিচারালয়ে অন্তত তিনজন বিচারক একসঙ্গে বিচার করতেন। একত্রে তিনজনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। উপরন্তু একযোগে তিনজনকে প্রভাবিত করাও সম্ভব হতো না।
ওই গ্রন্থপাঠে আরও জানা যায় যে, সেনানিবাসে সৈন্যদের বিচারের জন্য এবং বেশ্যা-লয়ে বিচারের জন্য সাধারণ বিচারালয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক বিচারালয় ছিল ['ভারত-কোষ' দ্র.]।
বি.দ্র. পরবর্তী কালে ভারতের গ্রামীণ পঞ্চায়েৎ-আদালতগুলিতে পাঁচজন ব্যক্তি এক সঙ্গে বিচার করতেন। উর্ধ্বতন বিচারালয়ে তিনজন ব্যক্তি পঞ্চায়েৎ-আদালতের আপীল শুনতেন। সর্বোচ্চ আদালতসমূহে দুই ব্যক্তি এবং শেষ-বিচারালয়ে রাজা বা নেতা একা নিম্ন-আদালতগুলির আপীল শুনতেন।
বহু ক্ষেত্রে বড়-বড় মামলার বিচার স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি বা বিচারকরা নিজেরা না-করে উর্ধ্বতন বিচারক-মণ্ডলী কিংবা উপরাজা বা রাজার নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু প্রতিটি বিচার-কার্য লিপিবদ্ধ করে আইনমতো সমাধা হতো। অপরাধসমূহের বিশেষ-বিশেষ আইনী সংজ্ঞাও বিধিবদ্ধ ছিল।
মনু ও স্মৃতি-শাস্ত্রে ও অন্য গ্রন্থে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও মিউনিসিপ্যাল বিচারালয়-সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। ওই-সব গ্রন্থে বহু দণ্ডবিধি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রযোজ্য দণ্ডের উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে বহু ইংরাজী পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেইকালে সংঘটিত অপরাধসমূহের নাম ও আইনী সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হলো।
'চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, হিসাবে কারচুপি, তহবিল-তছরূপ অনধিকার-প্রবেশ, রাজকর-আত্মসাৎ, উপকারী পশুবধ, কর্তব্যে অবহেলা, অগ্নিসং-যোগ, অন্যায় চুক্তিনামা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মিথ্যা-অভিযোগ, নারী-নির্যাতন, জন-সাধারণের ব্যবহার্য স্থান বা গৃহের ক্ষতিসাধন, সীমানা-অতিক্রম [এনক্রোচমেণ্ট]

রাস্তাবন্দী, প্রতিবেশীর জমিদখল, বেআইনী বিবাহ ও বেআইনী পুনর্বিবাহ, প্রতি-বেশীর গৃহের ক্ষতি, হত্যা ও জখম করা, ভৃত্যকে অন্যায় বরখাস্ত, উৎকোচ-গ্রহণ, ভীতি-প্রদর্শন, মানহানি, প্রহার করা, সিঁদচুরি, ভ্রূণহত্যা, মুদ্রা-জাল, বিষপ্রদান, নারীহরণ ও সেই কাজে সাহায্য-করা, গুজব রটানো হত্যা ও হত্যাকারীকে সাহায্য, রাহাজানি ও সেই কাজে সাহায্য, রাজদ্রোহিতা, রাজাকে অপমান, বলাৎকার, নির্বীর্যকরণ।'

উপরে তৎকালীন রক্ষী-গ্রাহ্য অপরাধী-সমূহ উল্লিখিত হলো। এবার কয়েকটি অপ-রাধের তৎকালীন আইনী সংজ্ঞা এবং সেইগুলির উপকরণ [ingredients] সম্বন্ধে বলা যাক। বর্তমান কালের আইনী সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে সেগুলির প্রভেদ যৎসামান্য।

(ক) চৌর্য অপরাধ : এক. অপহৃত দ্রব্যের মালিক বা অধিকারী অন্য এক ব্যক্তি হওয়া চাই এবং সে ওই দ্রব্য ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে দণ্ডনীয় হবে না। দুই. অপরাধী জ্ঞাত থাকবে যে সে ওই দ্রব্যের মালিক বা অধিকারী নিজে নয়। তিন. সে জ্ঞাতসারে চুরির উদ্দেশ্যে ওই দ্রব্যের গ্রাহক বা অপহারক হবে। চার. অপরের মালিকানা বা অধিকারভুক্ত দ্রব্য গ্রহণ বা অপহরণ করার জন্যে তার কিছু প্রচেষ্টা চাই।

অপহৃত দ্রব্যের কম-বেশি মূল্য অনুযায়ী দণ্ডও কম-বেশি দেওয়া হতো। অনুরূপ, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানে কম-বেশি ক্ষতি বা ক্ষতির সম্ভাবনামতো দণ্ডও কম-বেশি নির্ধা-রিত হতো। ক্ষতির উদ্দেশ্যে বাক্য কিংবা কার্য দ্বারা ক্ষতি করা অপরাধ। কারোর ক্ষতি করতে কিংবা বিভেদাদি আনতে মিথ্যা-ভাষণও অপরাধ ছিল।

(খ) মিথ্যা ভাষণ : এক. তার ইঙ্গিত, বক্তব্য ও ভাষা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতরূপে মিথ্যা হওয়া চাই। দুই. কারোর মধ্যে বিভেদ আনতে কিংবা কারোর ক্ষতির জন্য ইচ্ছা-কৃত বাক্য-ব্যবহার বা কার্যসাধন করতে হবে। তিন. বিভেদ সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য উভয়-পক্ষের জ্ঞাত থাকা চাই। চার. তাকে নিজে সেই মিথ্যা-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাহায্য-কারী বা নির্দেশক হতে হবে।

অপরাধ নিজে না-করে অন্যকে তা করার জন্যে প্ররোচিত করলেও সে অপরাধী। ওই কাজ মুখে বলার মতন প্রাচীর-গাত্রে লিখলেও [আধুনিক পোস্টারিং] সেই একই অপরাধ হবে। অন্যে ওই কাজ ওর তরফে করলেও ধরে নেওয়া হবে যে সে নিজেই কাজটি করেছে। এই অপরাধ বাক্য, কার্য, চিহ্ন, ইঙ্গিত প্রভৃতি দ্বারাও সমাধা হয়।

বর্তমানকালে অপরাধ-সমূহ বলপ্রয়োগে ও বিনা বলে সমাধা হলে তাদের যথাক্রমে উইথ এবং উইদআউট ভায়লেন্স-অপরাধ বলা হয়। মনু-সংহিতাতেও অনুরূপ দুই

প্রকারের অপরাধের বিষয় বলা আছে, যথা চৌর্য এবং সাহস [রবারী]। অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও মনু-সংহিতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবিধ অপরাধ, সেগুলির সংজ্ঞা তথা ডেফিনেশন ও তার জন্য প্রযোজ্য দণ্ডের বিষয় বলা হয়েছে। [মহামোহপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ-রচিত 'ভারতীয় দণ্ডবিধি' দ্র.]।

প্রাচীন ভারতে গ্রামীন বিচার-পদ্ধতি আপোসমূলক [মধ্যযুগীয় ভারতের মতো], ক্ষমাশীল ও মিটমাট-পন্থী ছিল। কিন্তু ভারতের কোনও-কোনও শহর-অঞ্চলে দণ্ড-প্রথা ছিল অতি নিষ্ঠুর। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামে ও নগরে প্রাণদণ্ড, কারাবাস ও অর্থ-দণ্ড ব্যতীত অত্যুগ্র দণ্ড ছিল না। সেখানে সাধারণত অপরাধীরা অর্থ বা শস্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ ক'রে বা গ্রামের জনহিতকর কার্যে বেগার খেটে রেহাই পেতো।

ভারতীয়রা সাধারণত সত্যবাদী, নিরপরাধ ও শান্তিপ্রিয় [মেগাস্থিনীস দ্র.] থাকায় কঠোর দণ্ডের প্রয়োজনও ছিল না। অবশ্য কোনো-কোনো কালে ও স্থানে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো। বিচারের কাজে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও নিম্নোক্ত দণ্ডগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। তবে অধিকাংশ গ্রামে ও নগরে এরূপ নিষ্ঠুর দণ্ডরীতি ছিল না।

এক : মাথার খুলি ফুটো করে তার মধ্যে একটি তপ্ত-রাঙা লৌহগোলক প্রবেশ করানো হতো। ওই তপ্ত-রাঙা লৌহগোলক মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটাতো। দুই : মুখ-বিবর স্থূল কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা উন্মুক্ত করে জ্বলন্ত মশাল তার মধ্যে বলপূর্বক সেঁদিয়ে দেওয়া। তিন : সমস্ত দেহ তৈলসিক্ত করে বা দাহ্য পদার্থ লেপন করে তাতে অগ্নিসংযোগ করা। চার : গলদেশ হতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহের ছাল ছাড়িয়ে তাকে উলটানো পালটানো। পাঁচ : খুঁটিতে বেঁধে সমস্ত দেহের স্থানে-স্থানে আগুন দিয়ে চামড়া ঝলসে দেওয়া। ছয় : দেহের চামড়া ও শিরাসমূহ প্রকাণ্ড বঁড়শিতে গেঁথে সেটি বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখা। সাত : দেহ হতে স্তবকে-স্তবকে ক্ষুর দ্বারা মাংসপিণ্ড তুলে নেওয়া। আট : তাকে উপুড় বা চিত করে শুইয়ে ফেলে কানে হাতে হুক বিঁধিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা। নয় : দেহকে দুরমুশ করে হাড় ও মাংস গুঁড়িয়ে খড়ের মতো নরম করা। দশ : পোষা নেকড়ে বা ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে দেহ হতে বারে বারে মাংস খুবলানো।

বেত্রদণ্ড ও মুগুর পেটা, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন, এমন-কি পর্বত হতে নিম্নে নিক্ষেপ করাও হতো। কর্ণ ও নাসিকা ছেদনের সংখ্যাধিক্যে প্রাচীন চিকিৎসক বৈদ্যরা তাদের পুনরায় সুদর্শন করতে সেই যুগেও উন্নত প্ল্যাসটিক সার্জারি আবিষ্কার করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশে প্রাণদণ্ডের ক্ষেত্রে পূর্বে শূল ব্যবহার করা হতো। সূচ্যগ্র দণ্ডের উপর

সকালবেলা অপরাধীকে বসিয়ে দিলে সন্ধ্যাকালে ধীরে ধীরে সে শূলের নিচে নামেতো। হেঁটোয় কাঁটা ও কোমরে কাঁটা রেখে গর্তে পোঁতা অন্য এক প্রকার শাস্তি। মশানে মুণ্ডচ্ছেদ [ফ্রান্সে গিলোটীন] বাংলার প্রধান প্রাণদণ্ড প্রথা।

[উপরোক্ত শাস্তিপ্রদানের জন্য এক শ্রেণীর অভিজ্ঞ বংশগত সম্প্রদায় [জহ্লাদ] সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম যুগে বাংলাদেশে ফৌজদারী পুলিশের এলাকায় চাবুক দ্বারা প্রাণ-দণ্ড দেওয়া হতো। এই দণ্ডদাতাদের সেকালে চাবুক-সোয়ারী বলা হতো। অভিজ্ঞ চাবুক-সোয়ারীগণ একটা আঘাতেই মানুষের মৃত্যু ঘটাতো। ফাঁসি এদেশে ব্রিটিশরা প্রচলিত করে।]

মানুষের ওই দণ্ডভোগে যে খুব কষ্ট হতো তা নয়। কারণ, তারা প্রথম শকেই [Shock] অজ্ঞান হয়ে যেতো। মানুষের কম আঘাতে বেশি ও বেশি আঘাতে কম কষ্ট হয়। শকের জন্য ওই মানুষ জৈব কারণে কষ্টহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু দর্শকদের পক্ষে সেটি ভীতিপ্রদ দৃষ্টান্তের কাজ করতো।

এ-রকম উৎকট-দণ্ড স্বভাবতই অপরাধীদের সংখ্যা কমাবে। এত গুরুদণ্ড নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। তবু, সাম্প্রতিক মারদাঙ্গা-কালে ওইরূপ দণ্ডের পুনঃপ্রবর্তনের সাধ মনে জাগতো। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছি যে কঠোর দণ্ড দ্বারা সেকালেও অপরাধী-দের নির্মূল করা যায় নি। অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন।

অধিকাংশ শহরে ও গ্রামে দণ্ডসমূহ বিবেচনার সঙ্গেই দেওয়া হতো। সংশোধন-যোগ্য অপরাধে বিচারকরা সহানুভূতিশীল ছিলেন। বহু ক্ষেত্রে ফরিয়াদীর অনুরোধে একে-বারেই দণ্ড দেওয়া হয় নি। কিন্তু গুপ্তচরেরা মিথ্যা সংবাদে রাষ্ট্রকে বিপথগামী করলে ওইরূপ দণ্ড তাদের প্রাপ্য হতো। পর পর আটবার অপরাধ করলে কোনও কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রে উক্তরূপ দণ্ড দেওয়া হতো। কেউ হত্যার চেষ্টা বা চৌর্যকার্য করলে হাত কেটে দেওয়ার নিয়ম ছিল।

অন্যায় হতে পাপ এবং পাপ হতে অপরাধের সৃষ্টি হয়। এ-যুগে অন্যায়কারী ও পাপী-দের শাস্তি দেওয়া হয় না। এজন্যে অপরাধীদের দমন আজও সম্ভব হয় নি। প্রাচীন ভারতে অপরাধীদের মতো অন্যায়কারী ও পাপীদেরও দমন করা হতো। তাছাড়া, গুরু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা ধর্মোপদেশ দ্বারা নৈতিক পুলিশের কাজ করতো।

বর্তমানকালে অপরাধ-বিজ্ঞানে অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি, সু-পরিবেশে ও সুসঙ্গে তার সুপ্তি বা হ্রাস এবং কুপরিবেশে ও কুসঙ্গে [Bad Association] তার বৃদ্ধির বিষয় বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয়রা সেই একই তথ্য বহু কাহিনী ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে উপনিষদের একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এক গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলো। গৃহস্থ তাকে পরিতৃপ্ত আহারে আপ্যায়িত করে রাত্রে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করে। মধ্যরাত্রে ব্রাহ্মণ সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে গবাক্ষপথে দেখলো, একটি গোরুর গলায় ঐ ঘণ্টা বাঁধা। ব্রাহ্মণের চিত্ত ঐ ঘণ্টার প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং সেটি পাবার জন্যে দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগলো। ভাবল, ঐ ঘণ্টা গৃহস্থের নিকট হতে চেয়ে নেবে। কিন্তু চাইলে গৃহস্থ যদি তাকে না দেয় ? তখন ঠিক করলো যে চুরি করে সে ঘণ্টা সংগ্রহ করবে। পরক্ষণে ভাবলো এ কী পাপ-চিন্তা তার মনে আসছে! স্বস্তি পেতে চাইল এই ভেবে যে ঘণ্টা তো সে ঠাকুর-ঘরের জন্য নেবে। দেবতার জন্য সংগৃহীত হলে চৌর্য-অপরাধের পাপ তাতে স্পর্শাবে না। আবার চিন্তা: উঁহু! চুরি-করা ঘণ্টায় দেবতার পূজা হয় না। সারারাত্রি মনে মনে দগ্ধ হয়ে প্রত্যুষে সে ঐ লোভ দমন করতে পারল।
প্রত্যুষে গৃহস্থ তার কুশল-সংবাদ নিতে এলে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রশ্ন করল: 'তুমি সত্য করে বলো, তোমার বৃত্তি কি ? তোমার পেশা নিশ্চয়ই চৌর্যবৃত্তি। দুদিন তোমার সাহচর্যে বাস করেছি। অসৎ সঙ্গদোষে আমার মনে কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে।'
গৃহস্থ তখন করজোড়ে বিনীতভাবে উত্তর করল: 'হ্যাঁ দেবতা! আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি তস্করবৃত্তি দ্বারা সংসার প্রতিপালন করি।'
প্ররোচনাতেও মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত হয়। বাক্-প্রয়োগের Su-[ggestion] মতো ঘটনার দ্বারাও অপস্পৃহা জাগ্রত হয়। মহাভারতে একটি তার সুন্দর উদাহরণ আছে।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিন বীর—কৃপাবর্মা, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অশ্বত্থামা গহন বনে আশ্রয় নিলেন। রাত্রে তাঁদের কারো চক্ষে নিদ্রা নেই। তাঁরা দেখলেন, একটি বৃক্ষশাখায় সাতটি কাক ঘুমে অচেতন। কাক রাত্রে ঘুমায়। এই সুযোগে তিনটি পেচক সাতটি কাককে ভক্ষণ করল। ঘটনাটি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে জাগ্রত করল। তাঁরা তিনজন ঐ সময় ঐ তিন পেচকের মতো জাগ্রত রয়েছেন। কিন্তু দ্রৌপদীর সাতপুত্র এখন কাকেদের মতো ঘুমন্ত। তাঁরা তিনজন গোপনে পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে দ্রৌপদীর সাতপুত্রকে হত্যা করলেন। [হতাশা ও ভয় তাঁদের প্রতিরোধ শক্তিকে বিনষ্ট করেছিল।]
[হিন্দু রাজাদের সময় বাংলার রাজধানী গৌড় নগরীতে ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থে সৈন্যদল ছাড়াও একটি বিরাট রক্ষীবাহিনী ছিল। তার সংগঠ-প্রণালী সমসাময়িক নগর রাজগৃহ, পাটলীপুত্র ও কপিলাবস্তুর মতো ছিল। প্রাচীর-বেষ্টিত গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তার তোরণগুলির দু'পাশে সারিবন্দী রক্ষীদের

কক্ষগুলি আজও বর্তমান। আজকের গার্ডরুমের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। এই-রূপ রক্ষণ-ব্যবস্থা হিন্দু-যুগের মতো মুসলিম-যুগেও রাজধানী গৌড় নগরে অব্যাহত ছিল।]

প্রবঞ্চনা-অপরাধ দুই প্রকার : সাধারণ ও গূঢ়হৈষী। শেষোক্ত প্রবঞ্চনাতে মানুষের মনকে অস্বাভাবিক করা হয়। টপকা ঠগী, বিডগ্যাম্বলিঙ, নোট-ডবলিঙ প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। এই ক্ষেত্রে বাক্-প্রয়োগ [Suggesion] দ্বারা ফরিয়াদীদের মনকে অস্বাভাবিক করা হয়। তাদের মধ্যে হিপনোসিস সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে প্রবঞ্চিত করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থাতে তারা কখনই ওভাবে প্রবঞ্চিত হতো না।

গূঢ়ৈষ-মূলক অপরাধ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়রা অবহিত ছিলেন। পঞ্চতন্ত্রে 'প্রবঞ্চক-ছাগ-ব্রাহ্মণ' সম্পর্কিত কাহিনীতে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অপরাধীদের কার্য-পদ্ধতি তথা মোডাস অপরাণ্ডাই তাঁরা ভেবেছিলেন।

এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগ-স্কন্ধে করে বাটী ফিরছিলেন। দূরে দূরে এক-একজন প্রবঞ্চক অপেক্ষা করছিল। প্রথমজন ব্রাহ্মণকে বললে, 'ঠাকুরমশাই! ওই কুকুরটা কাঁধে কেন?' এভাবে প্রতিটি স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে একই কথা শুনে ব্রাহ্মণের ধারণা হলো যে ওটা ছাগল না হয়ে কুকুরই। এই বিশ্বাসে ছাগলটিকে পথে নিক্ষেপ করে উনি ঐ স্থান ত্যাগ করলে ঐ ছাগলটিকে তারা বিনা বাধাতে লাভ করলো।

এই রকম কাহিনীগুলিতে প্রকারান্তরে অপরাধী, অপস্পৃহা, পরিবেশ, কুসঙ্গ এবং প্রতিরোধ-শক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। উহাতে আরও বলা হয়েছে যে বাক্-প্রয়োগের মতো ঘটনাও তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। উপরোক্ত তথ্যটি এই যুগে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত ফরমুলাটির দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করে থাকেন।

$$C = \frac{T+S}{R}$$

T অর্থে টেনডেনসি তথা প্রবণতা, S অর্থে সিচুয়েসন তথা পরিস্থিতি, R অর্থে রেজিসটেন্স-পাওয়ার তথা প্রতিরোধ-শক্তি এবং C অর্থে ক্রাইম তথা অপরাধ। T এবং S এর সম্মিলীত শক্তি অপেক্ষা R এর শক্তি বেশী হলে মানুষ নিরাপরাধী হয়। বর্তমানকালে নওসেরা-দল, বিড গ্যাম্বলার এবং টপকা-ঠগীরা অনুরূপ পদ্ধতিতে বাস্তব অভিনয় করে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের ঠকায়। এই কাজে বহু ব্যক্তি যুক্ত থেকে কেউ পথচারী কেউ শুভানুধ্যায়ী কেউ-বা বোকা জমিনদার, দরো-য়ান, দেওয়ান, দালাল ইত্যাদি কুশীলব হয়। এই উপায়ে ওরা টকটকে পিতলের বাটকে সোনার বাট রূপে তাদের বিশ্বাস করায়। লোভী লোকেরা এদের সমবেত ভাঁওতায় ভুলে নিজেরাই ঠকে। এ অবস্থায় ফরিয়াদীরা নিজেরাই কিছুটা অপরাধীর

মতো হয়।

প্রাচীন ভারতে দু-রকম আইন প্রচলিত ছিল, যথা: সাধারণ ও শাসন। শাসন আইন বর্তমান কালের অর্ডিনেন্সের সঙ্গে তুলনীয়। এই আইন-বলে বিয়োগান্ত নাটক এবং মঞ্চে যুদ্ধাভিনয় প্রাচীন ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের গ্রামীণ অজ্ঞ গৃহস্থরাও নিজ পদ্ধতিতে অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করত। গৃহস্থগণ কর্তৃক সৃষ্ট নিম্নোক্ত প্রবচন সমূহ তার প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো। এই বিষয়ে গবেষক সংকলকরা আরও তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারেন।

"চোরে কামাবে দেখা নেই। সিঁদ মোহনাতে চুবি।"

—চোর গভীর রাত্রে কামারশালার দুয়ারে সিদে ও কড়ি কিংবা পাঁচটি সিকা রাখত। প্রত্যুষে কর্মকার তা গ্রহণ করে সিঁদকাটি তৈরি করে রাত্রে সেখানেই সে রেখে দিত। এই লেনদেন সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। এতে একজন অন্য-জনকে সনাক্ত করতে পারত না।

"চোরের এক পাপ। কিন্তু গৃহস্থের সাত পাপ।"

—চোর চুরি করে মাত্র একবার পাপ করে। কিন্তু গৃহস্থ সেজন্য বহু লোককে মিথ্যা সন্দেহ করে তাদের অপদস্থ ও হয়রানি করে। এই জন্য গৃহস্থরা এ বিষয়ে সাতবার তথা বহুবার পাপ করে।

(১) চোরের মায়ের কান্না। (২) সাত মারে রা নেই। (৩) সাত চোরের মার। (৪) চোবের মন বোঁচকার দিকে। (৫) চোবের সাতদিন গৃহস্থের একদিন। (৬) চোরের উপর রাগ করে ভুঁইয়ে ভাত [বাসন চুরি] (৭) চোবা না শুনে ধর্মেব কাহিনী। (৮) চোরের দেখা পুঁই আদাড়ে। (৯) ডানপিটের মরণ মগডালে। (১০) চৌকি-দারের হাঁকডাক। ডাকাতের জিরগা হাঁক। (১১) মনের শয়তান বড়ো শয়তান। (১২) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের তস্করদের বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। পূর্বে তস্করদের উৎপাত এড়াতে পর্বত-শিখরে দুর্গ, ধনাগার ও প্রাসাদ নির্মিত হতো। ধনী-গৃহস্থরা প্রায় গবাক্ষহীন প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহনির্মাণ করছে। চাপা-সিঁড়ি, চোর-কুঠরি প্রভৃতি ধনীদের গৃহে মধ্যযুগে নিরাপত্তার জন্য তৈরি হতো।

মধ্যযুগে ভারতে পাহাড় ও দেওয়াল অতিক্রমের কাজে গো-হাড়গিল জীব ব্যবহৃত হয়েছে। বাঁদর ও কুকুরে সাহায্যে বেদেরা আজও চুরি করে। সিঁদকাটি লাঙলের মতো প্রাচীন যন্ত্র। ডাকাতদের দ্বারা দুয়ার ভাঙতে ঢেঁকিকল [Battery Ram] ব্যবহৃত হতো। চিত্র ও-শব্দসঙ্কেত এবং গুপ্ত-লিখন পদ্ধতিতে ওদের জ্ঞান ছিল।

হত্যাকার্যে বিষকন্যার প্রবাদ শোনা গিয়েছে। ঐ নারীকে বাল্যকাল হতে একটু একটু করে বিষ খাইয়ে উহাতে তাকে অভ্যস্ত করানো হতো। অবশ্য উহা একটি কাহিনী হতে পারে। ক্ষণভঙ্গুর দ্বারা তৈরি করে মৃত্যু ঘটানো হতো। রাজনৈতিক অপরাধ ভারতে মধ্যে মধ্যে ঘটেছে। বিষ-প্রদান এড়াবার জন্য খাদ্য-পরীক্ষার ব্যাপারে পোষা পশু-পক্ষী ছিল। পুকুরের দূষিত জল পরীক্ষার ও ব্যবস্থা ছিল। রানীরা বিষ-মাখানো কঙ্কণের [বালা বা তাগা] আঘাতে রাজার প্রাণনাশ করতো।

প্রাচীন ভারতে এ-যুগের মতো প্রমাণ ছিল দু-রকমের। যেমন, সাধারণ ও পারি-বেশিক। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের সম্যক্ জ্ঞান ছিল। প্রত্যক্ষম্ আগম্ অনুমানানী প্রমাণানী [ইতি পাতঞ্জল। ষষ্ঠ খ্রী. পূ.]।

প্রমাণ অর্থে যা চক্ষু কর্ণ ও ত্বকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে অবগত হওয়া যায়। পুলিশ-কর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যা দেখে তা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে ঘটনা-সম্পর্কে শোনা বিবরণকে আগম বলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের ঘটনা-সম্পর্কে বিবৃতি হচ্ছে আগম প্রমাণ। অনুমান-ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটি বস্তুর চারটি গুণ আছে। প্রত্যক্ষম্ ও আগম্ দ্বারা তার তিনটি গুণ অবগত হওয়া গেল। তাব চতুর্থ গুণটি কি হবে তা উক্ত উপায়ে [প্রত্যক্ষম ও আগম্ দ্বারা] পরি-জ্ঞাত তিনটি গুণেব স্বরূপ হতে নির্ভুলভাবে অনুমান কবা সম্ভব। [পারিবেশিক প্রমাণ] পর্বত হতে ধূম নির্গত হতে দেখলে ওখানে অগ্নি আছে তা অনুমানে বোঝা যায়, কিন্তু তাতে ভুল হওয়াও সম্ভব। ওই বিষয়ে তাঁরা সতর্ক হতে বলেছেন। এই ভ্রান্তিগুলিকে বিকল্প বলা হয়। তাই বিকল্প দু-রকম : অন্তর্বিকল্প [হ্যালুসিনেসন] এবং বহির্বিকল্প [ইলিউসন]। বহির্বিকল্পের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মুক্তা-শুক্তি ও সর্পরজ্জু সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

প্রথম ক্ষেত্রে ভুল ছবি মস্তিষ্কে তৈরি হয়ে চক্ষুতে প্রবাহিত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভুল ছবি চক্ষুতে সৃষ্ট হয়ে মস্তিষ্কে প্রবাহিত।

শহর-পুলিশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক বলা হয়েছে। নগর-পুলিশগুলির মধ্যে পার-স্পরিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গ্রামীণ-পুলিশগুলি ভারতে সর্বকালেই স্থানীয় ও বিকে-ন্দ্রিত। এজন্য স্থানীয় জনগণের ইচ্ছামতো স্থান-ভেদে তারা বিভিন্ন হয়। তাদের পদগুলির নামও বিভিন্ন। যেমন—মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ-পুলিশ প্যাটেলের অধীন। কোনও কোনও স্থলে তারা মণ্ডল [মোড়ল] বা সর্দার নামে পরিচিত। ভারতে অন্যান্য স্থানে তারা অন্য নামে পরিচিত। বহু জায়গায় গ্রামীণ-পুলিশ নবাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করেছে। কয়েক স্থানে গ্রামীণ-পুলিশ নিজেরাই তাদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ নিজ-নিজ গ্রামবাসীদের নিকট হতে সংগ্রহ করতো। তাতে

তারা গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিনতো ও বুঝতো।

[বাংলাদেশের গ্রামীণ জমিদারী পুলিশ সব দিক থেকে সুসংগঠিত ও সমুন্নত ছিল। তাদের ধারাবাহিক ঐতিহ্যও এ-সম্বন্ধে উল্লেখ্য। তাদের দক্ষতায় জমিদার-শাসকরা বহুকাল আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বাংলার জমিনদারী পুলিশের থানাগুলি পৃথিবীর প্রকৃত পুলিশ-সংগঠনের পথিকৃৎ। রাজ-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হতে ওইগুলির সৃষ্টি। এই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য। এই থানাসমূহ তথা 'পুলিশ-স্টেশন' ইংলণ্ডে ও পরে য়ুরোপে বাংলা-দেশের মতো স্থাপিত হয়।]

বর্তমান ভারতের মতো প্রাচীন ভারতেও বহুবিধ দ্যূতক্রীড়া প্রচলিত ছিল। তার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ বা ব্যবহারের রীতিনীতি ও তার কুফল প্রাচীন বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে নারদস্মৃতি ঋগ্‌বেদ অথর্ববেদ অর্থশাস্ত্র মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা মৃচ্ছকটিকা দশকুমার-চরিত কথাসরিৎসাগর পাণিনি মহাভারত জাতক ভাগবত ও দশম মণ্ডল ঋগ্‌বেদ এবং স্মার্ত রঘুনন্দন আদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অক্ষব্রধ্যু শলাকাদৈঃ দৈবণং
জিক্ষ্ম কারিতম্
পণ ক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং
দ্যূত সমাহ্বয়ম্—

আচার্য মনু স্পষ্টতঃ বলেছেন যে দ্যূতক্রীড়া প্রত্যক্ষ চুরির সংখ্যা বাড়ায়। রাজার রাজ্য-নাশেরও উহা অন্যতম কারণ। [বর্তমান অপরাধ বিজ্ঞানীরাও তাই বলেন] তার কুফল সম্বন্ধে সকলে নিন্দামুখর হলেও এ যুগের মতো সে যুগেও মানুষের এই অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি শাসকরা চেষ্টা সত্ত্বেও বন্ধ করতে পারেন নি।

তৎকালীন শাসকরা দ্যূতক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ করে তা থেকে রাজকর গ্রহণ করতেন। প্রকাশ্য স্থানে দ্যূত-গৃহে দ্যূত-সভার ব্যবস্থা হতো। গোপন দ্যূত-সভা প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীয় ছিল। জুয়া-আসরের নাল গ্রাহকদের সভিক বলা হতো। এই সভিক আপন লভ্যাংশ হতে রাজকোষে একটি অংশ শুল্ক রূপে জমা দিতেন [বর্তমান রেস-কোর্সের মতো]। অবশ্য বিশেষ তিথিতে যত্র-তত্র দ্যূতক্রীড়ার অনুমতি মিলতো। বর্তমান গ্যাম্বলিং অ্যাক্টের মতো কিছু রাজ অনুশাসন তৎকালে ছিল। দ্যূতক্রীড়াতে কেউ প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিলে সেই ব্যক্তি দণ্ডিত হতো। এটি নগরের অপরাধ হওয়াতে নগর-রক্ষীরা উহার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন। মোট আয়ের একদশমাংশের অধিক অর্থ দ্যূতক্রীড়াতে নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।

অপরাধ নির্ণয়ে ট্র্যাপীং তথা ফাঁদ পাতার রীতিও প্রাচীন ভারতে ছিল। পটীয়সী

গুপ্তচর-বেশ্যাদের এই কাজে নিযুক্ত করা হতো। এরা মদিরা-বিহ্বল করে ও সোহাগ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপকার্যের সংবাদ নিতো।

অন্যদিকে টোপ ফেলে [Bait] রথ ও পশু-চোরদের ধরা হতো। বণিক-গুপ্তচরগণ ভূয়া-ক্রেতা সেজে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করতো। এ যুগেও দূরে অরক্ষিত সাইকেল রেখে রক্ষীরা ছদ্মবেশে সাইকেলচোর ধরে। ভূয়া-ক্রেতা সেজে জাল নোট, জাল ভূয়া ঔষধ ও কালোবাজার ধরা হয়।

প্রাচীন ভারতে দণ্ডবিধি [সাধারণ আইন] এবং রাজ-অনুশাসন তথা অর্ডিনেন্স ছিল। অনুশাসন দ্বারা বিয়োগান্ত নাটক এবং রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ আদি দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। এ জন্যে শকুন্তলা নাটককে বিয়োগান্ত থেকে মিলনান্ত করা হয়।

মধ্যযুগীয় পুলিশ কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে। সেই-সব অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাকের নমুনা ও চিত্রাদি বহু বনেদী বাড়িতে আজও সংরক্ষিত আছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বলা যাবে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রক্ষীদের ব্যবহৃত পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করে বুঝতে হবে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তার বিবরণ পাওয়া যায়। উপরন্তু প্রাচীন মন্দির ও হর্ম্যাদির গাত্রে রক্ষীদের প্রস্তরখোদিত মূর্তি হতে তাদের ব্যবহৃত পোশাক ও অস্ত্রাদি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। এই সব খোদিত চিত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের যুদ্ধ ও সৈন্য-সমাবেশের সন্ধান মেলে। মাউন্ট আবু-র দিলওয়ারা জৈন-মন্দিরে মধ্যযুগের একটি যুদ্ধচিত্র খোদিত আছে।

হস্তী-চমূকে বর্তমান ট্যাঙ্ক-বহরের মতো বাহিনীর অগ্রে রাখা হতো। তারপর যথাক্রমে রথ, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং সর্বশেষে রক্ষীবেষ্টিত রসদবাহী গো ও অশ্বযান। এ যুগেও হস্তীর বদলে প্রথমে ট্যাঙ্ক ও তারপর রথের বদলে আর্মাড্‌কার ও তার পশ্চাতে পদাতিকরা কুচ করে থাকে।

সাধারণত প্রাচীন পুলিশ যষ্টি, মুদ্গর, তরবারি, তীরধনুক ও বর্শা ব্যবহার করেছে। ওই সব অস্ত্র দেব-দেবীর প্রাচীন মূর্তিতেও দেখা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে তার বহু বর্ণনা রয়েছে।

তবে প্রাচীন ভারতীয়রা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত কিনা—এটি নিশ্চয়ই একটি বিতর্কিত বিষয় ও অবিশ্বাস্য। আশ্চর্য এই-যে কয়েকটি পুরানো পুস্তকে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। পুস্তকগুলি মধ্যযুগে প্রণীত হলেও সেগুলি বিজ্ঞান-পুস্তক রচনার একটি সার্থক প্রচেষ্টারূপে উল্লেখ্য।

[বলা হয় যে বাবর ভারতে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করে। কিন্তু ভারতের বাহিরে তাঁর ওই অস্ত্র-ব্যবহারের কোনও উল্লেখ নেই। ব্যবহৃত হওয়া ও আবিষ্কৃত হওয়ার

মধ্যে প্রভেদ আছে। নতুবা যুদ্ধে বাবর কামান ব্যবহার করামাত্র ভারতীয়রা প্রতি-রোধার্থে দ্রুত কামান ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করল কি করে? এই বিতর্কিত প্রশ্নটিও গবেষক-ছাত্রদের বিবেচ্য বিষয় হবে।]

মগধ-গৌড় রাজ্যের সীমানায় লৌহচূর উল্লেখ্য খনিজ। মগধের ওই খনি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সহায়ক। মগধকে কেন্দ্র করেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে ব্যক্তিগত ও দলগত বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ কম। তার ব্যবহার-চাতুর্য সকলের আয়ত্তাধীন নয়। ওতে যুধমানদের মতো জনগণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের যুদ্ধস্থলের অনতিদূরে কৃষকরা নিশ্চিন্তে হলকর্ষণ করেছে। এই যুগের এ্যাটম বোমার মতো সে যুগেও সম্ভবত বজ্র ঘৃণিত ও যুদ্ধে নিষিদ্ধ ছিল। তাই কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত উহা যুদ্ধের পরিবর্তে পরবে বাজী হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উন্নত অস্ত্র-ব্যবহারে সেকালের লোকেদের অনীহা ছিল। কারণ, তারা বীররূপে খ্যাত হতে চেয়েছে। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন তাদের পছন্দ ছিল না। এই কয়টি কারণে ভারতীয়রা পরে কিছু ক্ষেত্রে বিদেশীদের দ্বারা পরাজিত হয়। অবশ্য সাম্রাজ্য থাকা কালে ভারত বিদেশীদের নিকট অপরাজিতই ছিল।

'শক্রনীতি' একখানি প্রাচীন পুস্তক—খ্রীষ্টজন্মপূর্বে কিংবা উহার পরে রচিত। উহা মধ্যযুগেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। এই পুস্তকে স্পষ্টভাবে লেখা আছে আগ্নেয়াস্ত্র তিন প্রকার : নালিকা, নালিক ও বৃহন্নালিকা [চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম প্রকরণ]।

লঘুনালিকার বিবরণে বলা হয়েছে যে এটি পঞ্চবিতস্তি তথা আড়াই হাত দীর্ঘ লৌহ-নির্মিত নল বা নলি। এর মূলে আড়ভাবে একটি ছিদ্র এবং মূল হইতে ঊর্ধ্ব পর্যন্ত আভূতি বা গর্ত। মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্যার্থে তিল বিন্দু মাছি। যন্ত্রের আঘাতে অগ্নি নির্গমনের জন্য যুক্ত প্রস্তরখণ্ড [চকমকি বন্দুক?]। অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদের আধারভূত কর্ণ। উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরবার মুঠ। মধ্যাঙ্গুলি প্রবেশে সক্ষম অগ্নিচূর্ণের গহ্বর এবং ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশের দৃঢ় শলাকা। যেরূপ আয়তন সেইরূপ উহা দূরভেদী।

বৃহন্নালিকা গর্ভ মধ্যে নীরেট লৌহ গোলক, ফাঁপানো গোলার মধ্যে ক্ষুদ্র গুলি। লঘু-নালিকের নাল বা ছিদ্রের উপযুক্ত সীসক ধাতু গুলিকা—নালাগ্র লৌহসার দ্বারা নির্মিত।

অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ সম্বন্ধে শুক্রচার্যের উক্তি : সুভচি, গন্ধক ও কয়লা যথাক্রমে পাঁচ, এক ও এক পল বা অংশ [আয়ুর্বেদ মতে সুভচি অর্থে সোরা] অর্ক স্নুহী ও অন্য এক বৃক্ষের কাঠ [বঙ্গস্থানে কয়লার জন্য জ্বালানো ঐ কাঠকয়লা] গুঁড়া করে ঢেলে স্নুহী অর্ক লশুন আদিরসে মিশিয়ে ও শুকনো করে কাঁকি করে অগ্নিচূর্ণের

তৈরি। ১৪০৪ খ্রীঃ প্রেমনগর কামান ও বন্দুকে রক্ষিত ছিল [Vide T.A.S. B. Vol. XXX VIII P. I (1869) pages-40-41]। বর্তমান ইংরাজ লেখকদেরও মতে ভারতে কামান ও বন্দুক প্রথম সৃষ্টি। প্রতীত হয় যে ওগুলি পারিবারিক ঘরানাতে ছিল। যুদ্ধ অপেক্ষা পরবে বেশি ব্যবহৃত হতো।

হাউই তথা রকেট ভারতে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত। প্রাচীন বহু গ্রন্থে আগ্নেয়াস্ত্রের আভাস বা বিবরণ আছে। এইগুলি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ধৈর্য ও উৎসাহ জনগণের হয়তো ছিল না। সম্ভবত ধনুকের তীরের অগ্রমুখে হাওয়াই বাঁধা হতো। জ্যামুক্ত তীর কিছুটা দূর চলে গেলে বাকি পথ [অগ্নিদাহের পর] উহা নিজ বলে অতিক্রম করতো। এইরূপ অস্ত্রকে অগ্নিবাণ আখ্যা দিলে ভুল হবে না। [বন্দুক যে ভারতে আবিষ্কৃত তা যুরোপীয়রাও স্বীকার করে]।

কিন্তু 'শুক্রনীতি' এই সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নির্ধারিত না হলে বিষয়টি বিতর্কমূলক থেকে যাবে। [বলা বাহুল্য—আগ্নেয়াস্ত্র অতি-উন্নত না-হওয়া পর্যন্ত তীর-ধনুকের চলন ছিল।] ভারতের মতো প্রতিবেশী প্রাচীন দেশেও বারুদ তৈরি হতো। পুরাকালে চীন ও ভারতের মধ্যে আনাগোনা ও লেনদেন সুবিদিত।

বিষ্ণুপুরের রাজারা একশ' মন ওজনের বহু লৌহ-কামান তৈরি করেন। তার নলেব বিরাট ব্যাসে প্রকাণ্ড গোলা পোরা যেত। ওইসব কামানের সাহায্যে বাঙালী যোদ্ধারা বহুবার মারাঠা-বর্গীদের হটাতে পেরেছিল। [নবাবের কালে বাঙালী কর্মকাররাই কামান ও বন্দুক তৈবি করেছে।]

সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা ভারতের জনগণ দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, বহন ও রক্ষণ লাইসেন্স ব্যতিরেকে 'একসপ্লোসিভ এ্যাক্ট ও আর্মস্ এ্যাক্ট' দ্বারা নিষিদ্ধ করেন। হিন্দু ও মুসলিম সরকার ভারতের জনগণকে ইংরাজের মতো নিরস্ত্র করে নি।

এই পুস্তকটিতে আমি মূলতঃ ভারতের ও বাংলাদেশের বিচার ও পুলিশের ইতিহাস বিবৃত করেছি। এইজন্য স্বভাবত হিন্দুজাতি ও বাঙালীরা তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মূল হিন্দুজাতি ও বাঙালী উপজাতির একাংশ পরে ধর্মান্তরিত হয়ে দেশীয় মুসলিমরূপে পরিচিত হয়। দেশীয় মুসলিমদের পূর্বপুরুষ হিন্দু হওয়ায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই ইতিহাস। এজন্য সমভাবে উভয়েই গর্ব অনুভব করিতে পারে। ধর্ম একটি পরিবর্তনযোগ্য বহিরাবরণ মাত্র। ঐরূপ পরিবর্তনে জাতির রক্তের পরিবর্তন হয় না।

জার্মান ও ইংরাজ উভয়ে খ্রীষ্টান হলেও তাঁরা দুটি পৃথক জাতি। তেমনি বিদেশী মুসলিম ও দেশীয় মুসলিমরাও দুটি পৃথক জাতি। ক্যাথলিক ও প্রোটেসটেণ্টে বিভক্ত হলেও উভয়েই ইংরাজ জাতি। তেমনি দেশীয় হিন্দু ও দেশীয় মুসলিমরাও একই

জাতি। মহাচীনে চীন জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ও মুসলিম আদি আছে। ওদের সকলের চীনা ভাষার নাম থাকায় জাতীয় পার্থক্য নেই। ইন্দোনেশীয় মুসলিমরাও আরব নাম গ্রহণ করে নি। ওদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ও বৌদ্ধের সংস্কৃত নামেই ওরা পরিচিত। পূর্ব জাতির উপর প্রাধান্য দিলেও ধর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়ার রীতি কখনও ছিল না। কিছুকাল পূর্বেও বহু বাঙালী মুসলিম তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভারতীয় নামে পরিচিত হতো।

ভারতের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। এ যুগে জাতি গঠন সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ কোনও জাতি আজ আর পৃথিবীতে নেই।

[হিন্দুদের বহু প্রাচীন উপাস্য মনীষীদের উত্তরপুরুষ হয়তো আজ মুসলিম-ধর্মাবলম্বী। বিদেশী মুসলিম-আক্রমণ রুখতে বর্তমান হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের পূর্ব পুরুষরাই সমভাবে সীমান্তে রক্ত ঢেলেছে। তাদের পরাজয়ের গ্লানি উভয়েব পক্ষে সমভাবে গ্রহণীয়। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অস্বীকার করলে হানমন্যতা আসে।]

ধর্মে কেউ হিন্দু, কেউ খ্রীষ্ট, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলিম বা শিখ হলেও জাতিতে তাবা সকলেই হিন্দু। বাদশাহরাও এটি স্বীকার কবে এদেশকে হিন্দুস্থান বলেছেন। ব্রাহ্মরা দেবদেবী পূজা বন্ধ করলেও হিন্দুই রয়ে গিয়েছেন। এই সব তথ্য স্মবণে না রাখলে পুস্তকটির বিষয়বস্তু বোধগম্য হবে না। বক্তব্য বিষয় বুঝতে হলে হিন্দুজাতির প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝতে হবে। [১]

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর একমাত্র ডেমক্রেটীক তথা গণতন্ত্র ধর্ম। ইহার কোনো স্রষ্টা না থাকাতে উহা অপৌরুষেয়। আযোত্তর ভারতে কয়েকটি মানব-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ দ্বারা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির সৃষ্টি হয়। এই ধর্মের মধ্যে পৃথিবীর সকল মতাবলম্বীর স্থান হয়েছে। এজন্য প্রাচীন ভারতীয় পুলিশ ও তৎপরবর্তী পুলিশকে বুঝতে হলে হিন্দু বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বিবৃত করা উচিত।

বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধ ও খ্রীস্টানদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দু-বৈষ্ণবদের ধর্মের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় শাক্তপন্থীদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের ধর্মের এতটুকু মিল নেই। এই বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও উভয়েই কিন্তু হিন্দু। যীশুখ্রীস্ট

---

(১) [ভারতীয সমাজ একটি বহুরঙা শতরঞ্চির সহিত তুলনীয়। তার লম্বালম্বি সুতা হলো ভাষা ও আড়ের সুতা ধর্ম। তার উপরকার বহুবর্ণ রঙ হলো বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণী। তাই তারা ঐ শতরঞ্চির মতো একই সঙ্গে চলে ফেরে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই যে ভারতীয় রাজাদের ও সন্ন্যাসীদের কোনও জাত নেই। বিভিন্ন জাতির রাজপরিবারে অবাধ অন্তর্বিবাহ চলে। অন্যদিকে যে কোনও জাতির লোক সন্ন্যাসী হওয়া মাত্র তার কোনও পদবী থাকে না। তাকে তখন ব্রাহ্মণরাও পদধূলি গ্রহণ করে প্রণাম করে তার প্রসাদ খায়।]

ও হজরত মহম্মদ ভারতে জন্মালে তাঁদের শিষ্যরা শিখ ও বৌদ্ধদের মতো মৌলিক ভারতীয় সম্প্রদায়রূপে গণ্য হতেন। বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতিদের মতো ধর্মনির্বিশেষে অন্তর্ধর্মীয় বিবাহে বাধা থাকতো না। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অন্ত-র্বিবাহ প্রথা না থাকলেও তাঁদের এক জাতিত্বে কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই।

ভারতে হিন্দু কোনও ধর্মের নাম নয়। উহা একটি জাতির নাম। ভারতীয়রা মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও জাতি ও সংস্কৃতিতে সকলেই হিন্দু। এই বিষয় স্বীকার করে নবাব বাদশারাও এদেশকে হিন্দুস্থান বলেছেন। হিন্দু শব্দটি কোনও ধর্মের সংজ্ঞা নয়। হিন্দু নামে ধর্মের কোনও প্রচারক নেই। কোনও নিয়ম ও আচার পালন না করেও লোকে হিন্দু হয়। এমন কি নাস্তিক ও জডবাদী, একেশ্ববাদী প্রভৃতিও হিন্দু। ইহা একটি সমন্বয়বাচক [ফেডারেশন অফ রিলিজনস্] অপৌরুষেয় ধর্ম। এতে ব্যক্তিগত মত ও পথ সর্বতোভাবে স্বীকৃত। ['হীনতাবর্জনকারী মানব-নিচয়। হিন্দু বলে আপনারে দেয় পরিচয়'] হিন্দু অর্থে সৎব্যক্তিমাত্রেই বুঝায়। অর্থাৎ—'শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই'—[চণ্ডীদাস]। তবে এ-কথাও ঠিক যে ওই হিন্দুধর্মই সমগ্র ভারতকে একতাবদ্ধ করে রেখেছিল।

আসিন্ধু সিন্ধু পর্যাপ্তাঃ যস্য
ভারত ভূমিকা পিতৃভূ পুণ্যভূ
শ্চৈব স বৈ হিন্দুরীতি স্মৃতিঃ।

এই মতবাদ আবহমানকাল হতে প্রচলিত না-থাকলে হিন্দুরা ধর্ম সম্বন্ধে এত উদার হতো না। কিন্তু ইংরাজরা কায়েমী স্বার্থ রক্ষার্থে হিন্দু-বিদ্বেষী হয় এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতে থাকে। তবে স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও ব্রিটিশ-বিরোধিতার জন্য বাঙালীরাই তাদের লক্ষ্য হয়।

আশ্চর্য এই যে প্রথমদিকে এই বাঙালীদেরই ইংরাজরা মস্তকে তুলে রেখেছিল। তৎকালে বড়সাহেব বলতে জনৈক ইংরাজকে ও ছোটসাহেব বলতে জনৈক বাঙালী-কেই বোঝাত।]

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণার জন্য হিন্দু-রাজন্যবর্গ ও জমিনদারশাসকরা প্রজাদের ধর্মান্তর গ্রহণে বাধা দেয় নি। ভারতীয়রা চিরকালই ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা ও মত শুনতে আগ্রহী ছিল। এক ধর্ম হতে অন্য ধর্মে আসা তারা বৈষ্ণব হতে শাক্ত হওয়ার মতো মনে করতো। এজন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীই নিজেদের বাঙালী উপজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেছে।

বি. দ্র.—হিন্দুধর্ম কারো জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত না করে প্রত্যেক গোষ্ঠীকে অঙ্গীভূত

করার পক্ষপাতী। সম্ভবতঃ এই কারণে জাতিভেদ-প্রথা ওদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রাচীন ভারতে পদবী [Surname] ব্যবহার করা হতো না। এযুগেও রায় মল্লিক চৌধুরী প্রভৃতি পদবী হতে জাতি-ধর্ম বোঝা যায় না। বর্তমানে কারখানা-শ্রমিকরাও পদবী লেখায় না।

কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীভেদে প্রত্যেক জন সমান অধিকারে ও সম্মানে কার্যরত ছিল। এখানে নিম্নশ্রেণীর অধীনে উচ্চশ্রেণীরা সানন্দে কার্য করে। রাজকার্যেও তৎকালে এই একই রূপ ব্যবস্থা দেখা যেত। যুদ্ধস্থলে, কর্মক্ষেত্রে ও তীর্থস্থানে জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গ নিষিদ্ধ ছিল। কেউ রাজা বা রাজকর্মী বা সন্ন্যাসী হলে তিনি জাতিহীন হয়ে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান পান। এর কারণ এই যে তাঁরা সমানভাবে পরিচ্ছন্ন কর্ম করেন। ভারতে এই পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতা জাতিভেদের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের প্রশাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা বুঝতে হলে এই জাতিভেদের স্বরূপ বুঝতে হবে।

বলা হয় যে বৃত্তি তথা পেশামত জাতিভেদের সৃষ্টি। যদি তাই হয় তাহলে এতে ছোঁয়াছুঁয়ি তথা ছুঁৎমার্গ ও উচ্চ-নিম্নশ্রেণী এলো কি করে? প্রকৃতপক্ষে কর্মসমূহে কমবেশী পরিচ্ছন্নতার মান মতো জাতি [Caste] গুলি সৃষ্ট হয়।[২] মেথর অপেক্ষা চর্মকার কম অপরিচ্ছন্ন। ফলে, চামাররা মেথরদের চাইতে উঁচু জাত। এদের উভয়ের চাইতে গয়লা মাহিষ্য সদ্‌গোপ কুম্ভকার কর্মকার স্বর্ণকার ও হলকর্ষীদের কর্ম বেশী পরিচ্ছন্ন। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণরা সব চাইতে বেশী পরিচ্ছন্ন কর্ম করে।

[কাস্ট্ হিন্দুদের চাইতে সিডিউলদের কাস্ট-এর সংখ্যা আরও বেশী। এদের মধ্যে খানা-পিনা ও বিবাহাদি আজও নেই। রাজনৈতিক কারণে ইংরাজরা মন্দ উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে মনগড়া বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। এদের মধ্য হতেই হিন্দুরাজারা সৈন্য ও পুলিশ সংগ্রহ বেশী করতো। উভয় শ্রেণীর হিন্দুরা একত্রে দেশ ও রাজার জন্য প্রাণপণ করেছে।]

সম্ভবতঃ কর্মগত পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে মান মতো সীমারেখা টেনে জলচর ও অজলচরের সৃষ্টি হয়েছিল। অপরিচ্ছন্ন কর্মের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হতে এটি উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে অজলচররা সচেতন থাকায় তারা তাদের নিজের শিশুদেরও ছোঁয় না। কিন্তু এদের প্রত্যেকের সম্মানজনক স্থান ছিল। এদের পারম্পরিক প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল। তাই স্নান করার পর এরা শুদ্ধরূপে বিবেচিত হতো।

---

(২) জার্মানীর হিটলারের মতে অনার্যদের সহিত আর্যদের রক্তের মিশ্রণের কম-বেশী পরিমাণমতো হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ-নিম্নশ্রেণী ভেদ হয়েছিল। অতএব তাঁর মতে ভারতে আরও একটি এরিকান ইনভেসনের প্রয়োজন। কিন্তু হিটলারের সহিত আমরা কেউই একমত নই।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানুষমাত্রেই শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে পরে স্ব স্ব কর্মমতো উচ্চ-নিম্নশ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কর্মদোষে ব্রাহ্মণরা পুনরায় শূদ্র হতে পারে।
শিল্পকর্ম ও তার শিক্ষা প্রত্যেক বৃত্তিধারী আপন স্বার্থে স্বস্ব পারিবারিক ও জাতিগত ঘরানার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাওয়ায় এই কর্মভিত্তিক জাতিভেদ পবে সমাজে বংশগত হয়ে ওঠে। ঐ সময় শিল্পশিক্ষানিকেতনগুলির অভাবে শিল্প-পরিবারে তথা উপজাতিতে অন্যকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। শিল্পকর্মের ঘরোয়ানা রক্ষার্থে নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহাদিও তারা বন্ধ করে। [বিদেশী আক্রমণে হিন্দুরাজাদের পতনে শাসনের অভাবে এই ব্যক্তিগত প্রথা বিকৃত হয়ে ক্ষতিকর হয়।]

তৃতীয় অধ্যায়

॥ মধ্যবর্তী পুলিশ ॥

ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস একটি দুঃখজনক ইতিহাস। সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালে শের'শা বাদশা আকবব ছত্রপতি শিবাজী জন্মগ্রহণ না-কবলে অবস্থা আরও শোচনীয় হতো। ভারতের মধ্যযুগীয় সংগঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নি। এ-বিষয়ে বরং বাংলার পুলিশী সংস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। মৌয রাজাদের ও গুপ্ত রাজাদের পতনেব পর ভারতের অন্ধকার-যুগ শুরু হয়।
পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের পুলিশী সংস্থা ও বিচারের কার্যাদির কিছুটা অদল-বদল হযেছিল। সেই সময় শক-হূন প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে ভারতীয় শাসকদের ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সেজন্য প্রশাসনিক বিষয়ের মতো সাংস্কৃতিক বিষয়েও অধোগতি দেখা যায়। গুপ্ত-সম্রাটরা এবং অন্য কয়েকজন ভারতের পূর্ব-গৌরব সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধাব করলেও তাঁদের সাম্রাজ্যও পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতীয়দের প্রধান দোষ এই যে বহিঃশত্রুকে পরাজিত করার পর তাদের পশ্চাদধাবন করে নিজ-দেশের পুনরাক্রমণের ঘাঁটিগুলি বিধ্বস্ত না-করা। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তারা নিজবলে লডলেও কখনও সমবেতভাবে তাদেরকে রোখার চিন্তা করেন নি।
[শক-হূণদের বিতাডনে ভারতীয় নৃপতিরা পূর্বাকালে একবার মাত্র একত্রিত হয়েছিল। পরবর্তী নৃপতিরা পূর্বপুরুষদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নি। মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মতো মধ্যে-মধ্যে সীমান্তের ওপরে পররাজ্যগুলি [ভীতি প্রদশনার্থে] তাঁরা আক্রমণ করতেন না। এটিও ভারতীয় নৃপতিদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল।]
বড়ো-বড়ো সাম্রাজ্যের পতন হওয়ায় বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করা

সম্ভব হতো না। ছোট ছোট রাজ্যের পক্ষে বিরাট বাহিনী পোষণ ও ব্যয়বহুল আধুনিক অস্ত্র রক্ষণও সম্ভব হতো না। সর্বোপরি এ-সম্পর্কে মানসিক ও অন্যান্য প্রস্তুতিরও অভাব ছিল। অহিংসবাদ, অতি-ধর্মাচরণ এবং ন্যায়বোধও এজন্য দায়ী কিনা তা-ও এ-বিষয়ে বিবেচ্য।

সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হিন্দু-নৃপতিরা সংযত করতো। মুসলমানদের আক্রমণে হিন্দু-নৃপতিদের পতনে সমাজ অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-নির্ভর হয়। এই পরিণতি ভারতীয় সমাজের পক্ষে শুভ হয় নি। যে কোনো কারণেই হোক, ব্রাহ্মণদের উপর আওরঙজেব পর্যন্ত জিজিয়া-কর আরোপ করেন নি। 'দিল্লিশ্বরো-বা জগদীশ্বরো-বা' মন্ত্রটি সেকালে ব্রাহ্মণ-রাই সৃষ্টি করেছিল। তবে ব্রাহ্মণদেরই এক অংশ এই দুর্বিপাক থেকে ভারতকে রক্ষা করেছিল। শিবাজীর গুরু ও মন্ত্রীরা এবং পেশোয়ারবাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। [ব্রাহ্মণদের সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করার অর্থ বুঝা যায় না।]

বিদেশী শাসনের প্রথমদিকে কেবল ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেই দুর্যোগে সামন্ত হিন্দু-রাজারা তাদের পুলিশ ও সেনাদলের সাহায্যে প্রজা-দের জীবন ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছিলেন। এইজন্য সাধারণ প্রজারা কোনোদিনই বিদেশী শাসকদের স্বীকার করেন নি। রাজা বলতে তারা স্ব স্ব স্থানীয় উপরাজাদেরই জানতো ও বুঝতো।

ব্রিটিশদের অধিকারের প্রথম দিকেও তাদের মনোবৃত্তি এই-রকম থাকায় চতুর ব্রিটিশ তাদের তোয়াজ করে তাদেরই মাধ্যমে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। এজন্য তাঁরা এই দেশীয় রাজাদের সকলকে এবং অধিকাংশ জমিনদারদের স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

পাঠান-শাসকরা দিল্লি প্রভৃতি রাজধানীগুলিতে ঘাঁটি স্থাপন করলেও স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজাদের বা জমিনদারদের আভ্যন্তরীণ শাসন, বিচার ও পুলিশী কাজে হস্ত-ক্ষেপ করেন নি। এই বিশাল দেশে ও-রকম কোনও কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা আত্মরক্ষার্থে এজন্য বড়ো-বড়ো দুর্গনগরী তৈরি করেছিলেন। খাজনা কিংবা কর বা উপঢৌকন না-পাঠালে এঁরা মধ্যে-মধ্যে দুর্গগুলি হতে অভিযান পাঠাতেন। ওই-সব দুর্গগুলিতে সেজন্য সর্বদা সুসজ্জিত বেতনভুক বিদেশী সৈন্যদলকে রক্ষা করা হতো।

পাঠান-শাসকরা তাদের রাজধানীতে এবং সেনানিবাসগুলিতে সেনাবাহিনীর দ্বারা শান্তিরক্ষা করতেন। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ভূভাগে শাসন, বিচার ও পুলিশী কাজ হিন্দু-উপরাজারা পূর্বের মতো সমাধা করতেন। এই সকল উপরাজারা বহুগুণে উন্নত পর্বতন পুলিশী-ব্যবস্থা উত্তরাধিকারী-সূত্রে পেয়েছিলেন।

পাঠানরা মোগলদের মতো ভারতীয় পুলিশ প্রথা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না। একমাত্র সম্রাট আলাউদ্দীন তাঁর রাজধানী ও সেনানিবাস সমূহে তৎকালীন ভারতে মৌর্য রাজাদের অনুকরণে প্রথম আরোপক-সংস্থা তথা এনফোর্সমেণ্ট-বিভাগ স্থাপন করেছিলেন।

বহু পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতায় ব্রিটিশরা সম-অর্থে এনফোর্সমেণ্ট-পুলিশ স্থাপন করেছিলেন। তৎকালে দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্য হলে ওইগুলির জন্য নূতন প্রণীত নিয়ন্ত্রিত আইন আরোপণের জন্য পুলিশেতে ওই নূতন বিভাগ সৃষ্ট হয়েছিল। আজও পর্যন্ত ওই আরোপক বিভাগ এদেশের পুলিশেতে আছে।

সম্রাট অশোক [প্রিয়দর্শী অশোক] বাজার-সমূহের নিয়ন্ত্রণে প্রথম আরোপ-সংস্থা তৈরি করেন। সম্ভবত গুপ্ত-সম্রাটরাও তার অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজী [১২১৬-১৩১৬] মধ্যযুগীয় ভারতে ওঁদের মতো প্রথম আরোপক-সংস্থা তথা এনফোর্সমেণ্ট-পুলিশের স্রষ্টা। বাজারের লেনদেন ও দর-নিয়ন্ত্রণে শাহান-ই-মুণ্ডি [শাহান = তত্ত্বাবধায়ক। মুণ্ডি = বাজার] নামে এক রাজ-কর্মচারীর অধীনে ওই আরোপক-সংস্থা ছিল। ক্রেতাকে ঠকালে কিংবা সপ্তাহে একদিন বাজার বন্ধ না রাখলে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ওজনে কম দিলে ব্যাপারীর দেহ হতে সম-পরিমাণ মাংস কেটে নেওয়া হতো। শাহান-ই-মুণ্ডির কাছারি বাজারগুলির মধ্যে এক স্থানে থাকতো। ছুটির দিন তথা সাপ্তাহিক বন্ধের দিন সেটি হরতাল রঙে রঞ্জিত করা হতো। তাই আজও বাজার বন্ধ করা হলে তাকে 'হরতাল' বলা হয়। এ থেকেই বর্তমান কালের রাজনৈতিক হরতালের সৃষ্টি। ছাড়পত্র তথা পারমিট ব্যতীত ব্যাপারীদের কৃষকদের নিকট হতে শস্য ক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। মজুত বিরোধী আইনে ধনী ব্যক্তি ও ওমরাহরাও অধিক দ্রব্য বাজার হতে কিনতে পারতেন না।

[বি. দ্র.] বিদেশী আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের শক্তিশালী 'স্ব স্ব সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে পড়েছিল। কেন্দ্র শক্তিহীন ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীনপ্রধান' পারস্পরিক কলহরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার রাজ্যে সমগ্র ভারত বিভক্ত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মতো ওদের ভৌগোলিক সুবিধা নেই। ওরা অনেকে বেতনভুক বিরাট সেনাবাহিনী পোষণে অক্ষম। পূর্বের মতো উন্নত অস্ত্র আবিষ্কার ও রক্ষণের এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ও রসদ-সরবরাহের মতো সক্ষম কোনও কেন্দ্রীয় শক্তি তখন ভারতের ছিল না।

ফলে ভারতের এখানে-ওখানে বহু ভূমি বিদেশী কবলিত হয়েছিল। ভুঁইয়া উপরাজাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ভারতে কোথাও হলো না। বরং বিদেশীদের তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে স্বাধীন কিংবা অর্ধস্বাধীন রইলো। এতে স্বভাবতই ভারতে সংস্কৃতি-রক্ষার ভার গ্রামীণ ভুঁইয়ার উপরাজাদের উপরই পড়লো। এই দায়িত্ব তাঁরা উত্তম-

রূপেই পালন করেছিলেন। [এঁদেরকে এখন সামন্ততান্ত্রিক তথা বুর্জোয়া বলা নিরর্থক।] আভ্যন্তরীণ পুলিশ এবং বিচার ও শাসন-ব্যবস্থায় এঁরা বিদেশীদের হস্তক্ষেপ করতে দেন নি। বার্ষিক কর দেওয়ার অতিরিক্ত বিদেশীরা দাবী করলে তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই রাজ-করও তারা সকল সময় তাদেরকে দিতেন না।

বাংলাদেশে রাজা গণেশের নেতৃত্বে বাঙালী ভূঁইয়ারা পাঠানদের প্রথমে হঠায়। সম্ভবত সেই সাহসে বলীয়ান হয়ে ভারতের অন্যত্রও ভূঁইয়া-রাজারা বিদ্রোহ করে পাঠানদের পর্যুদস্ত করে। এইভাবে বহু স্থান তারা পুনরায় সম্পূর্ণ স্বাধীনও করেছিল। পাঠানদের এই বিপাকের সুযোগে মোগলরা এদেশ আক্রমণ করে দিল্লি অধিকার করে সাম্রাজ্য বিস্তার করলো।

প্রথমদিকে বাঙালী ভূঁইয়ারা গৌড়ের দুর্বল পাঠান-শক্তির সঙ্গে একযোগে মোগলদের সার্থকভাবে প্রতিরোধ করেছিল। বাঙালী ভূঁইয়ারা [পাঠানদের শেষ অবস্থায়] তখন কার্যত স্বাধীন। গৌড়ে কোনও বিদেশী-শক্তি রাখা না-রাখা তখন তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। তবে নিজেদেব মধ্যে রেষারেষি থাকায় তাঁরা কাউকে নৃপতি-পদে মনোনয়নে অক্ষম ছিলেন। অবশ্য তারা নতুন বিদেশী মোগলদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন।

উপরোক্ত কারণে মোগল-সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে পাঠানদের বদলে বাঙালী-দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে লিখেছিলেন: 'আমি বাঙালীদের দেখে নেবো। তাদের আমি উচিত-শিক্ষা দেবো।' মোগলদের পক্ষে নদীবহুল বাংলার কর্দমাক্ত পথ-ঘাট ও জলা-জমিতে যুদ্ধ করা কঠিন ছিল। বাবর তাঁর পুস্তকে রাজপুতদের তাচ্ছিল্য করলেও এ-কথা স্বীকার করেছিলেন যে বাঙালীরা ভালোই যুদ্ধ করে।

[এই সময় বাংলাদেশে একজন মাত্র হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত-মুসলিম ভূঁইয়ার ছিল। অন্যদিকে—বিহারে জন্ম সূত্রে বাঙালী বা বেহারী শেরশা নামে অন্য এক ভূঁইয়ারও ছিল। তবে এঁর পিতা জনৈক বিদেশাগত পাঠান ছিলেন।]

এই কালে উভয়-সম্প্রদায়ের উপরাজারা পরস্পর-বিদ্বেষী হওয়ার কারণ দেখেন নি। ধর্মে ভিন্ন হলেও তাঁরা জাতিতে নিজেদের হিন্দু ভাবতেন। তখনও তাঁরা হিন্দু-জাতিরই একটি উপজাতি বাঙালী ছিলেন।

সেইকালে মোগল কর্তৃক অন্য পাঠানদের আগমন-পথ সম্পূর্ণ বন্ধ। তাঁরা স্বদেশের পাঠানদের সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্পর্ক না-রেখে বঙ্গবাসী হয়েছিলেন। সেজন্য পাঠান-সুলতানদের পক্ষে বাঙালী ভূঁইয়াদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। তৎকালে বঙ্গদেশ বলতে বঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড বোঝাতো।

[বি. দ্র.] শেরশাহের পিতা ভাগ্যান্বেষী বিদেশী পাঠান হলেও শেরশাহ নিজে বাঙালী

ভাবাপন্ন ছিলেন। ওঁরা বিহারের একজন ভুঁইয়ার উপরাজা ছিলেন। ওইকালে বিহারের মগধী ও মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্য। তৎকালে মগধ-গৌড়ের সংস্কৃতিও ছিল অভিন্ন। শেরশাহকে নিজেদের নেতারূপে গ্রহণ করে বৃহৎ বাংলার ভুঁইয়া-রাজারা গৌড়ের অকর্মণ্য সুলতানদের হটিয়ে গৌড় দখল করতে সাহায্য করেছিলেন। এই গৌড়-মহানগরী হতে বেরিয়ে শেরশাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে দিল্লী অধিকার করেছিলেন। চিরাচরিত প্রথামত বাঙালী ভুঁইয়ারা তাঁকে সৈন্যদল-সহ সাহায্য করে থাকবেন। কারণ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করার মতো পর্যাপ্ত পাঠান-সৈন্য বিহার ও বাংলায় নিশ্চয় ছিল না। তাদের সংখ্যা তখন পূর্বভারতে স্বভাবতই অতি নগণ্য। এই থেকে তৎকালীন বৃহৎ বঙ্গের সামন্তদের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

[লৌহ-আকর পর্যাপ্ত থাকায় পূর্বভারতের এই ভূভাগে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির সুবিধা ছিল। এজন্য পূর্বভারতেই মৌর্য ও পাল সাম্রাজের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলির উত্থান হয়েছিল। বিদেশী আক্রমণ রুখতে ব্যস্ত থাকতে না-হলে এদেশে য়ুরোপের পূর্বে শিল্প-বিপ্লব শুরু হতো। এ-কারণে সর্ববিষয়ে প্রারম্ভ চমৎকারভাবে হলেও তা সম্পূর্ণ হতে পারে নি। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্পর্কেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।]

[এখানে উল্লেখ্য এই-যে বাবর বিহার দখল করলেও বঙ্গদেশ অধিকার করতে পারে নি। প্রতিরোধে দৃঢ়শক্তি বাঙালীদের উপর বিষোদ্গার করে তাঁকে বিহার হতে ফিরে যেতে হয়েছিল।]

শেরশাহের মৃত্যু হলে হুমায়ুন ফিরে এসে বাংলাদেশ বাদে উত্তর ভারতের অন্যত্র আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পুত্র সম্রাট আকবর ভারতের বহু প্রদেশ জয় করলেও বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি। জাহাঙ্গীরের পক্ষেও বাংলার ভুঁইয়া-রাজাদের সম্পূর্ণ বশীভূত করা সম্ভব হয় নি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই-যে সাজা-হান সর্বপ্রথম বাংলার ভুঁইয়া-রাজাদের নিকট নিয়মিত কর-আদায়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। সমস্যাসংকুল বাংলাদেশে-তৎকালেও মোগল সুবাদাররা বহাল হতে প্রায়ই অনিচ্ছুক হয়েছেন। বলা বাহুল্য নাতি-উষ্ণ বাংলাদেশ তখন নিশ্চয় স্বাস্থ্যপ্রদই ছিল।

সম্রাট আকবর দিল্লিতে একটি সুগঠিত পুলিশ সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। রাজা টোডর-মল শাসনের ও রাজস্ব-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করায় ওই দুটির মধ্যে প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতির বহু সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

[শেরশাহের সময়েও বাংলার ভুঁইয়া-রাজারা পূর্ব কালের মতো অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করতে না-পারলে অভিযোগকারীদের ক্ষতিপূরণ করে

দিতেন। অর্ধেক সম্পত্তি উদ্ধার করে বাকিটা উদ্ধার করা সম্ভব না-হলে তাঁরা স্বেচ্ছায় তার ক্ষতিপূরণ করতেন।]

শেরশাহ উত্তর ভারতের সম্রাট হলে তিনি প্রাচীন বাংলার পুলিশের ওই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারতের অন্যত্র স্থানীয় জায়গীরদারদের ও সামন্ত রাজাদের পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পাঠানরা বিদায় নিলে তাদের স্থলে মোগলরা দিল্লিতে এসে ঘাঁটি করলো। ওই দিল্লিকে কেন্দ্র করেই তারা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। কিন্তু সমগ্র দেশের প্রশাসন ব্যাপারে তারা পাঠানদের মতো হিন্দু সামন্তদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

পাঠানদের কোনও সুগঠিত পুলিশ ছিল না। তাঁরা তাঁদের রাজধানীতে ও ফৌজা ঘাঁটিগুলিতে সৈন্য দ্বারা শান্তি রক্ষা করতেন।

সর্বপ্রথম সম্রাট আকবর তাঁর মন্ত্রী টোডর মলের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন পুলিশের অনুকরণে প্রাচীর বেষ্টিত দিল্লীনগরীর মধ্যে একপ্রকাব পুলিশ্রী সংস্থা স্থাপন করে-ছিলেন। কিন্তু পাঠানদেব মতো মোগলরাও অন্যত্র সামন্ত রাজাদের বিচাব পুলিশ ও শাসন-ব্যবস্থায় একটুকুও হস্তক্ষেপ করেন নি। তৎকালীন দিল্লির পুলিশকেই মোগল-পুলিশ বলা হয়।

মোগল পুলিশ

সুগঠিত মোগল-পুলিশ ব্যবস্থা কেবল রাজধানী দিল্লি নগবীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেনানিবাসগুলিতে এবং উল্লেখ্য ঘাঁটিগুলিতে ফৌজদাবদের অধীনে ফৌজী-পুলিশ ছিল। সেখানে মূলত সেনাবাহিনী দ্বারাই শান্তি রক্ষা করা হতো। জায়গীরদারগণ এবং উপরাজগণ স্ব স্ব জমিদারীতে ও রাজ্যে নিজস্ব পুলিশ, শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

মোগলরা ভারতের জায়গীরদারদের অধীনে গ্রামীণ পুলিশ সম্বন্ধে সম্পর্কহীন হলেও রাজধানীতে তাদের সুগঠিত নগর-পুলিশ ছিল। সম্ভবত সংস্কৃত-সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ্ আকবরের মন্ত্রী রাজা টোডরমল রাজস্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে তার আরও উন্নতি করেন। এজন্য প্রাচীন ভারতের নগর-পুলিশের প্রভাব ও কার্যাদি তাতে সুস্পষ্ট। রাজস্ব-আদায়ের সঙ্গে ওই যুগে পুলিশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। পূর্বে কলিকাতা-পুলিশও ওই দু-কাজ একসঙ্গে করতো। আরব ও মিশর দেশের রক্ষীদের সঙ্গে মোগলদের দিল্লী-পুলিশের মিল কম। সেখানে ওইকালে কোনও প্রকার সুগঠিত পৃথক পুলিশ-দল ছিল না।

প্রাচীন ভারতের পুলিশের মতো মোগল-পুলিশও জনগণের আয়-ব্যয়ের উপর নজর রাখতো। তারা শহরে নবাগত ব্যক্তিদের এবং কৃত্রিম বাটখারা, দাঁড়িপাল্লা ও ওজনাদির সংবাদ নিতো। তবে প্রাচীন ভারতের মতো অপরাধ-নির্ণয়ের জন্য তাদের বেতনভুক সুগঠিত গোয়েন্দা তথা গুপ্তচর-বিভাগ ছিল না। তাহলেও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা স্থানীয় প্রাচীনকালীন হিন্দু খোঁজী-সম্প্রদায়ের উপয় নির্ভর করতো। এই বিষয়েও উভয় পুলিশের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। [ভারতীয় খোঁজী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরে বলা হবে।]

সিরিয়া ও মিশরে অবশ্য প্রাচীনকালে মামুলী চর-নিয়োগ প্রথা ছিল। [BOGHAZ Kol এবং Tel-el amavna শিলালিপি দ্র.] কিন্তু এদেরকে ঠিক পুলিশ-পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

মোগল-আমলে দিল্লির পুলিশ-সংগঠন একজন কোতোয়ালের অধীন ছিল। দোষী ব্যক্তিদের তিনি গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখতেন। তিনিই তাদের বিচারের জন্য কাজীর নিকট আনতেন। বিচারে যা দণ্ড হতো তা কার্যকর করার ভারও তাঁর উপর। এ ছাড়া তাঁকে সরকারী প্রচারকের কাজও করতে হতো। শহরের মাঝখানে একটি চবুতরা তথা প্ল্যাটফর্ম স্থাপিত ছিল। এই চবুতরায় বাদশাহের ফরমান ও হুকুমত আদি সাধারণের জ্ঞাপনার্থে টাঙানো থাকতো। বিদ্রোহীদের ছিন্নমুণ্ডও এখানে প্রদর্শনীরূপে রক্ষিত হতো।

কোতোয়ালকে আকবরের হুকুম মতো করণিকদের সাহায্যে একটি নথি তৈরি করতে হতো। তাতে দিল্লি শহরের বাড়িগুলির সংখ্যা ও তার বাসিন্দাদের সংখ্যা, নামধাম ও পেশা প্রাচীন ভারতীয় রক্ষীদের মতো লিপিবদ্ধ করতে হতো। শহরের বাজারী, সৈন্য, শিল্পী ও দরবেশদের হিসাবও তাদের রাখতে হতো।

[এই পদ্ধতিকে বর্তমান পুলিশদের ডায়েরি তথা স্মারক-লিপি লেখা এবং বিবিধ নথিপত্র তথা রেজিস্টার রক্ষার সঙ্গে তুলনা করা চলে।]

এই কোতোয়াল সমগ্র দিল্লি শহরকে কয়েকটি মহল্লায় ভাগ করতেন। প্রত্যেক মহল্লার অধিবাসীদের মধ্য হতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মহল্লা-সর্দার নিযুক্ত করে তার উপর ওই মহল্লা-সম্পর্কে কিছু কর্তব্যের ভার অর্পিত হতো। কোতোয়াল নিযুক্ত স্থানীয় গুপ্তচররা দিনে বা রাত্রে সংঘটিত উল্লেখ্য ঘটনা নথিভুক্ত করতো। নবাগত ব্যক্তি ও অতিথিরা তাঁদের আগমন-বার্তা জানাতে বাধ্য হতেন। কোতোয়াল-নিযুক্ত ব্যক্তিরা মহল্লার হালালখোর তথা স্ক্যাভেনজারদের নিকট হতে অপরাধসম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করতো। [মৌর্য পুলিশের সহিত উহার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট]

[অধুনা কলিকাতা নগরের মুসলিম-বস্তিগুলিতেও প্রতি মহল্লায় উপরোক্ত ঐতিহ্-

মতো গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সংশ্রবহীন স্বতঃস্ফূর্ত-নির্বাচিত মহল্লা-সর্দার আছে। এইসব মহল্লা-সর্দারদের মুসলিম-জনগণের উপর প্রচুর প্রভাব রয়েছে। কলিকাতা-পুলিশ প্রায়ই তদন্ত ও অন্য কাজে এদের সাহায্য নেন এবং তা পান। এই জনগণ সকলেই বহির্বাংলা হতে আগত মুসলিম।]

কিন্তু অপরাধ-নির্ণয় ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধারে প্রাচীন বংশগত হিন্দু খোজী-সম্প্রদায়ের উপর মোগলরা নির্ভরশীল ছিল [স্যার যদুনাথের প্রবন্ধ দ্র.]। মৌর্যদের ভ্রাম্যমাণ-গুপ্তচরদের বংশধররূপে এরা নিজেদের দাবী করে। গুরুগাঁও-এর ইংরাজ-ম্যাজিস্ট্রেট লরেন্স সাহেব [ব্রিটিশদের সময়ে] বহু দুরূহ মামলা এদের সাহায্যে কিনারা করে-ছিলেন ['লাইফ জন লরেন্স' দ্র.]। বড.বড দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন ও শান্তি-রক্ষার কাজ মোগল-যুগে শহরে সশস্ত্র-সৈন্যরা করতো।

মোগল-চবুতরার পথ দিয়ে কসাইরা বাজারে গেলে কিছু মাংস সেখানে ভেট দিতে হতো। ১৬৮০ খ্রী. এই প্রথা বে-আইনী আওয়াব সাব্যস্ত হওয়ায় রহিত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের এক থানায় মৎস্য-দস্তুরী নেওয়ার জন্য থানাদার দণ্ডিত হন। কোতোয়ালী চবুতরায় প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতেরও ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু প্রাচীন ভারতে প্রকাশ্যে অপরাধীকে বেত্রাঘাত কিংবা কারো ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শন-করা নিষিদ্ধ ছিল। যা-কিছু দণ্ড তা কারাগারের মধ্যে নিরালা মশানে তথা বধ্য-ভূমিতে সমাধা হতো। 'উনি দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা' বাংলার এই প্রাচীন প্রবাদ-বচনে অন্য দণ্ডের সঙ্গে মুণ্ডচ্ছেদও বোঝানো হয়েছে।

[বি দ্র.] ভারতীয় কোটাল-পদ হতেই সম্ভবত কোতোয়াল-পদটির উৎপত্তি। প্রাচীন কাহিনীতে কোটাল-পুত্র মন্ত্রী-পুত্র রাজ-পুত্রের নাম একসঙ্গে উল্লিখিত। কোটাল যে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি তা ইহা প্রমাণ করে। মোগল-পুলিশের উপর প্রাচীন ভার-তীয় রক্ষী-সংগঠনের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাজা টোডরমল দিল্লির নগর-পুলিশের উন্নতি করেন। কারণ রাজস্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশ-সংগঠনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

দিল্লি নগরের কোতোয়ালরা দাঁড়ি-পাল্লা-বাটখারা-ওজনাদি পরীক্ষা করতেন। তাঁরা পণ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতিও রোধ করতেন। কিন্তু এই কাজ পরে মুস্তফি নামে কর্মীদের উপর ন্যস্ত হয়। এই মুস্তাফিদের উপর মুসলিম ধর্ম-বিরোধী কাজ নিবারণেরও ভার ছিল।

[অশোক ও অন্যান্য মৌর্য-সম্রাটদের নগর-রক্ষীরাও ওজন বাটখারা ও দাঁড়িপাল্লা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতেন। তদুপরি তাঁরা নাগরিকদের নৈতিক মান অক্ষুণ্ণ রাখতেও সচেষ্ট ছিলেন। তবে ধর্মমতগুলি সম্বন্ধে উদার-নীতি থাকায় তাঁরা তাতে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁরাও মোগলদের মতো নাগরিকদের আয়-ব্যয়ের উপর লক্ষ্য রেখে-

ছেন। তাছাড়া,বেশ্যপল্লীগুলিতে ও সেনানিবাসে তাঁদের পৃথক পৃথক পুলিশ ছিল।]

[বি. দ্র.] মোগল অধিকারের পূর্বে পাঠান-সম্রাট শেরশাহ্ ভারতের কয়েক স্থানে গ্রামীণ পুলিশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ নির্ণয়ে ব্যর্থ গ্রাম-প্রধানকে তিনি দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তবে এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে দিল্লির চতুস্পার্শ্বের গ্রামগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি বাংলাদেশের প্রথা মতো ভারতের অন্যত্রও চুরির ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা জমিদার-শাসকদের উপর আরোপ করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা ওই-সব স্থানে মাত্র সাময়িকভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। শেরশাহ সুবা-বাংলার [বঙ্গ, বিহার ও ছোটনাগপুর] সুসংগঠিত জমিনদারা পুলিশ-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে সাহসা হন নি।

শেরশাহ্ বাংলার রাজধানা গৌড় মহানগরী হতে যাত্রা করে হুমায়ুনকে ভারত হতে বিতাড়িত করেন। প্রচলিত প্রথা মতো বাঙালা ভূঁইয়া-রাজারা স্বসৈন্যে নিশ্চয়ই ওই যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। বাংলার ভূঁইয়ারা রাজা গণেশকে সাহায্য করার মতো গৌড়ের সুলতানকে বিতাড়িত করে শহর দখল করার ব্যাপারে তাঁকেও সাহায্য করেছিলেন। কারণ ওই সময় ভূঁইয়া রাজাদের নিকট গৌড়ের তৎকালীন সুলতান কয়েকটি কারণে বিরাগভাজন হয়েছিলেন।]

বর্তমান ভারতের পুলিশ-সংগঠনে প্রাচীন ভারতের প্রশাসন-সংক্রান্ত প্রভাব কতটুকু তা ইতিহাসের গবেষক-ছাত্রদের ,গবেষণার বিষয়। তবে এই-যে পরবর্তী কালের বাংলার জমিদারী-পুলিশের প্রভাব তাদের উপর সুস্পষ্ট ছিল।

বাংলার প্রশাসন, বিচারকার্য এবং পুলিশী-ব্যবস্থা বুঝতে হলে প্রাচীন ভারতীয় এবং মোগল-পুলিশ সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আছে। তাই এই দুই যুগের পুলিশ সম্বন্ধে এইখানে আলোচনা করা হলো।

উপরে পাঠান ও মোগল-পুলিশ সম্বন্ধে বলা হলো। ওই সময় ওরা ভারতের গ্রামীণ-পুলিশে হস্তক্ষেপ করে নি। গ্রামীণ-পুলিশ পূর্বের মতো সামন্তরাজাদের অধীন ছিল। পাঠান ও মোগলরা ফৌজী ক্যাম্পে ও রাজধানীতে রক্ষীদল রেখেছিল। তবে ওই-গুলি ফৌজী-পুলিশের সহিত তুলনীয়। পাঠানরা মূলতঃ ;সৈন্যদ্বারা তাদের ঘাঁটি-গুলিতে শান্তিরক্ষা করতো। মোগলরা মাত্র রাজধানী দিল্লিতে একটি পুলিশ-দল তৈরি করে। সেই দল-গঠনেও প্রাচীন ভারতীয় পুলিশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

এবার বাংলার পুলিশ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবো। কিন্তু তৎপূর্বে বাঙালী উপজাতি সম্বন্ধে বুঝতে হবে। বাংলার ইতিহাস বলতে বাঙালীর ইতিহাস বোঝায়। পূর্বতন বাঙালীদের সঙ্গে অধুনাতন বাঙালীর প্রভেদ রয়েছে। এই পুস্তকে আমি প্রাচীন বাঙালীদের সম্বন্ধে অধিক বলেছি। তাঁদের স্বভাব-চরিত্র বর্তমান বাঙালীদের মতো

ছিল না। তুলনার জন্য বর্তমান বাঙালীদের চরিত্র নিয়ে উদ্ধৃত হলো।

এখানে বর্তমান বাঙালীদের সংশোধনযোগ্য জাতীয় ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কোনও জাতির বা উপজাতির উত্থান-পতন জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন হলে জাতীয় ইতিহাসেরও পরিবর্তন হয়। সেই অবস্থায় পশ্চাদপদরা অগ্রগামীদের চাইতে আরও বেশী এগোয়। তাই প্রত্যেক জাতির ও উপজাতির পূর্বাপর জাতীয় ইতিহাস অবশ্য পঠিতব্য। তবেই তাদের পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করার সুযোগ হবে। তাতে ফলাফল বুঝে সময়ে সাবধান হওয়া যায়। কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বারে বারে ঘটেছে। জাতীয় চরিত্রে অদল-বদলের ইতিহাসও প্রয়োজনীয় ইতিহাস।

কেউ কেউ বলেন বাঙালীরা আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট জাতি। এজন্য সর্বভারতীয় বোধ ও প্রীতি বাঙালীদের রক্তে প্রবাহিত। বাঙালীর [হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ] দেহাকৃতি, ব্লাড গ্রুপিং নৃতাত্ত্বিক তথ্য এ বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই তথ্য হিন্দু-মুসলিমের দ্বিজাতি-তত্ত্ব স্বীকার করে না। এরা কখনও [ভূঁইয়ারাও] এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হয় নি। বরং পারস্পরিক বিদ্বেষ ও আত্মধ্বংসী রাজনীতির মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখে সহজে অন্যের শিকারে পরিণত হয়েছে। কারো কারো মতে, এরা ঘর-জ্বালানে পর-ভুলানে হলেও বারে বারে নিজেদের ক্ষতি করে সমগ্র ভারতের উপকার করেছে। এরা একেবারে ভাবপ্রবণ, দুঃখবিলাসী ও আদর্শবাদী। এদের প্রথম আন্দোলনে এরা রাজধানী হারায় ও প্রদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ বেহাত হয়। দ্বিতীয় আন্দোলনের ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ওরা নিজদেশে পরবাসী হয়েছে। তৃতীয় আন্দোলনে ওদের প্রদেশ খান খান হয়ে তিনখান হয়ে যায়। চতুর্থ আন্দোলন করলে ফল কি হবে সেটা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। কিন্তু প্রতিবারই এরা নিজেরা পিছিয়ে সমগ্র ভারতকে এগিয়ে দিয়েছে। এজন্য কারো নিকট হতে কখনও সাধুবাদ না-পেলেও এরা আত্মস্বার্থ ভুলে সকলের জন্য ভেবেছে ও প্রাণপণ করেছে। এত বড় স্বার্থত্যাগী ও আত্মভোলা জাতি পৃথিবীতে বিরল। এদের মুষল-পর্বের দিন এখনও বিলম্বিত। এখনও নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও হানাহানি করে এরা আকণ্ঠ বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে আছে।

এই অহেতুক রাজনীতি-সর্বস্ব বাঙালীরা আজ আর কোথাও চাকরি পায় না। তাদের চাষের জমিতে অন্যেরা ফ্যাক্টারি তৈরি করেছে। এদের অর্থহীন রাজনীতি ও অন্তর্বিরোধের সুযোগে অন্যেরা প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ উন্নত। এরা এই যুগে নিজভূমে প্রায় পরবাসী। অথচ সামান্য প্রতিকার বা প্রতিবাদ করতেও এদের অসীম লজ্জা।

এই উপজাতি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরই দুয়ারে চাকরির প্রত্যাশায় বৃথা ঘোরাঘুরি করে। যে সকল ইংরাজ-বণিকেরা একমাত্র তাদেরই চাকরি দিত, ওদেরকে তাড়িয়ে এরা অন্যদের সুবিধা করে দিয়েছে। এরা নিজেরাই নিজেদের অন্যতম শত্রু। অথচ কিছুকাল পূর্বেও এরা ইংরাজদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবসা করেছে।

[বাঙালী নির্মাণশিল্পীরা পূর্বে সমুদ্রগামী যুদ্ধ-জাহাজ ও বাণিজ্য-জাহাজ তৈরি করতো। বাঙালী কর্মকারদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রের মতো উৎকৃষ্ট কামান ও বন্দুক তৈরিরও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।]

এটি স্বীকৃত সত্য যে পূর্বকালে নৌবাণিজ্যে বাঙালীরা অদ্বিতীয় ছিল। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সুদূর বন্দরে বাণিজ্য-তরীসহ বাঙালীদের দেখা যেত। প্রমাণ স্বরূপ—আজও ব্রত-উদ্‌যাপনে বাঙালী কন্যারা সেই দিনের স্মৃতি বহন করে। তাদের পূর্বসূরীরা সমুদ্রগামী পতিপুত্রের নিরাপত্তা-কামনায় পুষ্করিণী ও নদীতে প্রদীপ-সহ ক্ষুদ্র ভেলা ভাসাতো। তাদের উত্তরপুরুষের কন্যাদেব ব্রতানুষ্ঠানে এই প্রথা আজও রয়েছে।

[বাণিজ্য ও শিল্পের উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভরশীল। বহির্বাণিজ্যের জন্য বাঙালীর মন প্রথম সংস্কারমুক্ত হয়। এজন্য পূর্বতন বাঙালীদের ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বলবো। জাতীয় চরিত্রের ও ইতিহাসের সহিত ওইগুলির সম্পর্ক আছে।]

নৌশিল্পের মতো বাঙালীদের বস্ত্র-শিল্পেরও খ্যাতি ছিল। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন রোম-সম্রাটদেরও ব্যবহার্য ছিল। কিন্তু বাঙালীদের নৌশিল্প উত্তরকালে ব্রিটিশরা দারোগাদের সাহায্যে ধ্বংস করলেও তাঁতিদের আঙুল কাটার কাহিনী অলীক। ঐ গণ-গল্প ইংরাজদের প্রতি বাঙালীদের রাজনৈতিক ঘৃণা হতে উদ্ভূত।

ইংল্যাণ্ডের মতো পরাধীন ভারতে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয় নি। ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রচালিত তাঁতের সঙ্গে বাঙালী তাঁতীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। কলিকাতার লাহা-পরিবার ইংল্যাণ্ডের লাট্টু-মার্কা বস্ত্রের সর্বভারতীয় এজেণ্ট হলেন। তাঁরা ওই ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন। পরে, বিড়লারা ওই ব্যবসায়ে তাঁদের বেনিয়ান হন। লাহা-পরিবার ব্যবসা ছেড়ে অধিক সম্মানের প্রত্যাশায় জমিদারী কিনে জমিদার হলেন। ফলে বিড়লা-হাউস তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলো।

বাণিজ্য-লক্ষী বাঙালীদের ত্যাগ করে ক্ষেত্রীদের নিকট ও ক্ষেত্রীদের ত্যাগ করে মারোয়াড়ীদের নিকট চলে যায়। এখন আবার তাদের নিকট হতে ভাটিয়াদের কাছে চলে যাচ্ছে। জমিদার হওয়ার লোভ, আয়েসী জীবন ও ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্র-হানি তার কারণ। বস্তুতপক্ষে বর্ধমান বা নাটোর-রাজের পাশে বিড়লারাও আসন পেতো না। বাঙালী ব্যবসায়ীরা নাম-মাত্র মহারাজা হতে চাইলেন। রাজনীতি ও

চাকরি-সম্বল বাঙালীদের পূর্বস্থানে ফেরার চেষ্টা কম। তাই এখন তাদের একমাত্র বুলি : 'সব কিছু জাতীয়করণ করো।' এ ভিন্ন তাদের আজ বাঁচবার অন্য কোনোও উপায়ও বোধহয় নেই।

হিন্দু-বাঙালীদের পূর্বকালে জাহাজী বাণিজ্য ও কলোনী স্থাপন সুবিদিত। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দেও ফস্টার সাহেব হীরাট নগরে একশ' জন এবং ভার্সিস নগরে একশ' দশজন হিন্দু-বণিক দেখেছেন। বাজমশীদ, আস্ত্রারণ, ভেজদ, কাম্পিয়ন ও পারস্য সাগর-কূলেও বহু হিন্দু-বণিক সপরিবারে বাস করতো। কলিকাতা শহরে বসাক ও শেঠ পরিবার ও অন্যরা প্রাচীন ব্যবসায়ী। সপ্তগ্রাম ও চুঁচড়ার স্বর্ণ বণিকরাও তখন সক্রিয়। পরে এরা সকলে কলিকাতায় ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা ভাগাভাগি করে। ১৮৫১ খ্রী. বণিক-সভা প্রতিষ্ঠাকালেও তাতে বহু বাঙালী ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হতে হটলেও ব্যবসা-ক্ষেত্রে তারা তখনও হটে নি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা তখনও পরাধীন নয়। কিন্তু সরকার-অনুগৃহীত বিটিশ-উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুচি, মাঝি প্রভৃতি দেশীয় কারিগররা হেরে চাষের মাঠে ভিড় জমালো। বাঙালী ধীরে ধীরে ব্যবসায়-ক্ষেত্র হতেও বিদায় নিলো। পুস্তকের এই অংশে প্রসঙ্গ ক্রমে বাঙালীকে আমি তাদের পূর্ব-কৃতিত্ব স্মরণ করালাম। তাদের আমি বলতে চাই যে 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেদের চিনুন ও পূর্ব পুরুষ-দের স্মরণ করুন।

[বি. দ্র.] পূর্বতন বাংলাদেশে বাঙালীদের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা যৎসামান্য ছিল। শাসক যাজক বণিক ও শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিগত বৃত্তি-ধাবী ওদের প্রতিটি শ্রেণীতে ছিল। সেইকালে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি উচ্চ-শ্রেণীরা পরভুক জীবন [প্যারাসাইট লাইফ] যাপন না করে অন্যদের মতো কৃষি-কার্য করতো। কিছুকাল পূর্বেও বাঙালী বাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতিরা লাঙল না ধরলেও কোদাল কোপাতে জমি নিড়োতে ও বেড়া বাঁধতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। অন্যদের দ্বারা উৎপাদিত শস্যের ভাগ না নিয়ে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশরা ইংরাজি শিক্ষা দিয়ে এঁদেরকে মধ্যবিত্ত করে মূল সমাজ হতে দূরে সরায়।

বিহার প্রভৃতি স্থানে আজও ব্রাহ্মণ ও ছত্রী আদিরা তথাকথিত অচ্ছ্যুৎদের সহিত পাশাপাশি ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করে। একই পরিবারের এক ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যভাই লাঙল চষে বা ভঁইস্ চরায়। ওই সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক অসমতা না থাকায় ঈর্ষাও নেই।

উপরোক্ত সামাজিক কারণে বিহার ও বাংলার সাহিত্যেও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

কোনও পথহারা ভূঁইয়ার পুত্র বা রাজপুত্র কৃষক-গৃহে আশ্রয় নিলে বিবাহের জন্য তার কৃষক-কন্যার সহিত প্রণয় সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে ঐ পথহারা ব্রাহ্মণ-পুত্রকে গৃহস্বামী বলবে : তোমাকে আমাদের অন্ন কি করে খাওয়াবো? জাত-সাপের কোনও ছোট বড় নেই। গৃহস্বামী তখন তাকে গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং সেই বাড়ির কন্যার সহিত প্রণয়েব পর গল্পটি শেষ হবে।

প্রাচীন বাংলায় জাতিভেদ থাকলেও এইরূপ অর্থনৈতিক অসমতা কোনও দিনই ছিল না। উচ্চ নিম্ন শ্রেণীভেদে গোলায় ধান ও পুকুরে মাছ থাকতো। প্রণম্য ব্রাহ্মণরাও অন্য শ্রেণীদের মতো মাটির ঘরে বসবাস করেছে। অপরদিকে উভয় শ্রেণীর অবস্থা-পন্নদের ও সমুদ্রগামী বণিকদের অট্টলিকা ছিল। সকল শ্রেণীর লোকই দেশের শাসক-কুলে ছিল।

[পরে ব্রিটিশ-শাসনে সমাজের বুদ্ধিজীবীরা দ্রুত ইংরাজি শিক্ষা করে পৃথক সমাজের সৃষ্টি করে। বুদ্ধিজীবীদের এইভাবে পৃথক করে ব্রিটিশরা লড়াকু জনগণকে বিভ্রান্ত করে।]

পূর্বে ব্রিটিশরা বাঙালী কণ্ট্রাকটার দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা তৈরি করতো। জমিদার-শাসকরা অর্থনৈতিক কারণে—সম্রাট ও বাদশাহের তৈরি মুদ্রাদির উপর নির্ভরশীল ছিল। ওই সব ধাতুতে খাদ না থাকায় তার সমমূল্যের জন্য মুদ্রা জাল করা অলাভজনক ছিল। বহু পরে ইংরাজ গভর্নমেণ্ট নিজস্ব ট্যাঁকশাল স্থাপন করে খাদ-মিশ্রিত মুদ্রা তৈরি করতে থাকেন।

উপরে অধুনা-দৃষ্ট বাঙালীদের সম্বন্ধে অধিক বলা হয়েছে। এবার পূর্বতন বাঙালীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবো।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বৃহৎ বাংলার বিচার, পুলিশ ও শাসন সম্পর্কিত ইতিহাস ৬০০ খ্রী. পূ. কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমি বিবৃত করবো। এটাকে প্রাচীন কাল, মধ্যবর্তী কাল ও বর্তমান কাল—এই তিনভাগে বিভক্ত করেছি। তাতে কার্য-করণ-সহ বাংলার প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসও উদ্ধার করা হয়েছে।

আশা করা যায় যে অন্য গবেষকদের দ্বারা এই বাংলায় পুলিশের ইতিহাসের আদর্শে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিচার ও পুলিশের পৃথক পৃথক ইতিহাস রচিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বাংলা পুলিশ ॥

বাংলা-পুলিশ বলতে বৃহৎ বঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক পুলিশ এবং তৎসহ [বর্তমান] কলিকাতা পুলিশকেও বোঝায়। প্রাচীন বাংলার বহু প্রশাসনিক রীতিনীতি এবং পুলিশী সংগঠনের বহু বিষয় বর্তমান বাংলায় দেখা যায়। বস্তুত পক্ষে ক্রমিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেগুলি বর্তমান আকারে বহাল হয়েছে। বাংলার পুলিশী সংগঠনের প্রভাব বর্তমান ভারতের পুলিশে এবং য়ুরোপীয় বহুদেশের পুলিশেও সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশ হতেই, ব্রিটিশদের রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে উহা ভারতের অন্যান্য এবং ব্রিটিশদের স্বদেশের মাধ্যমে য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও প্রসার-লাভ কবেছিল।

ব্রিটিশ-অধিকারের প্রথমদিকে সমগ্র ভারতে বড়সাহেব বলতে ইংরেজদের এবং ছোটসাহেব বলতে বাঙালীদের বোঝাতো। বাঙালী কর্মচারীরা ইংবেজদের সাম্রাজ্য-শাসনে সাহায্য করেছিলেন। এই-সব কারণেই বাংলায় প্রচলিত বহু বিষয় ভারতের অন্যত্রও প্রসারিত হয়।

রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি-আই-ই মহোদয় খেদ করে বলেছিলেন যে আজও বাঙালীদের কোনও ইতিহাস লেখা হয় নি। তিনি 'দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন সত্ত্বেও' বাংলাদেশে হিন্দু-জমিদারদের আধিক্যের কারণও জানতে চেয়েছিলেন। বাংলার প্রশাসনিক ইতিহাস তথা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিস্ট্রি প্রথম এই পুস্তকে লেখা হলো। বাংলার আদ্যোপান্ত বিচার ও পুলিশ-ব্যবস্থার গবেষণায় বিভিন্ন যুগের রাজনৈতিক অবস্থা স্বভাবতই এসে যায়।

প্রমাণ মূলত দুই প্রকার হয়, যথা, প্রত্যক্ষ ও পরিবেশিক [Circumstancial evidence]। প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাবে মাত্র পরিবেশিক প্রমাণ দ্বারা অপরাধীদের ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। তাই কোনও দেশের ইতিহাস গঠনেও তা গ্রহণীয়। বহু বিষয়ে কিছু 'হাঁ' উল্লেখের সাহায্য নেওয়ার পর [পসিটিভ এভিডেন্স] কিছু 'না' উল্লেখের [নেগেটিভ এভিডেন্স] কারণও বিবেচ্য। অর্থাৎ—এটি এমন ভাবে ওরা করতে পারতো কিন্তু তারা তা না-করে অমনটি করলো কেন? ইহার কারণও ঐতিহাসিকদের সত্যনির্ধারণে বিবেচনা করে বুঝতে হবে।

অন্যান্য দেশের জনগণের মতো বাঙালী জনগণও তাদের রাজধানীর ভাষা গ্রহণ করেছিল। এজন্য রাজধানী গৌড় ও শান্তিপুরের মার্জিত ভাষার প্রভাব বাংলাভাষার

উপর সুস্পষ্ট। কলিকাতার ভাষাও এই কারণে সমগ্র বাংলায় প্রচারিত হয়েছে। এই ভাষা অবলম্বন করে এদেশেতে বাঙালী উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য এই-যে কয়েকজন জবর-দখলী রাজন্যবর্গ ও নবাবদের ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চয়ই ইতিহাস নয়। প্রশাসনিক ইতিহাসই সর্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস। এই প্রশাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধা বিজড়িত। এরই সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসেরও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু বঙ্গদেশ বরেন্দ্রভূমি রাঢ় দেশ ও ঝাড়খণ্ড আদি মতো 'মগধ-গৌড়' সাম্রাজ্যের একটি বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও তার নামেই সমগ্র দেশের নাম বাংলাদেশ হওয়ার কারণও বিবেচ্য। এর উত্তর হবে এই-যে বঙ্গদেশের [মহাসামন্ত] বর্মন-রাজারা সেন-রাজা ও পাল-রাজাদের পূর্বে গৌড় দখল করে বহুকালব্যাপী সমগ্র দেশের নৃপতি ছিল। সেই সময়েই বঙ্গদেশের নাম অনুযায়ী সমগ্র দেশটি বাংলা-নামে পরিচিত হয়েছিল।

প্রথমে বঙ্গভূমির মহাসামন্ত, পরে বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্ত পাল রাজারা, শেষে রাঢ় ভূমির মহাসামন্ত সেন-রাজারা গৌড় দখল করে পর পর সমগ্র বাংলার নৃপতি হয়েছিলেন।

এবার বাংলাদেশের [বৃহৎ বঙ্গ প্রশাসন, বিচারকার্য ও পুলিশী-ব্যবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করবো। বাংলাদেশের বিচার ও পুলিশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পুলিশ অন্তঃশত্রু হতে এবং সৈন্যরা বহিঃশত্রু হতে জনগণকে রক্ষা করে। রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সঙ্গে পুলিশও পরিবর্তিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশী-ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই বক্তব্য বিষয় বাংলার নিজস্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে।

বাংলার জাতীয় ইতিহাসের বহু টুকরো-টুকরো কাহিনী একত্রিত করে হারানো অংশগুলি [মিসিং লিংক] অনুমানে বুঝে পুনর্গঠিত করতে হবে। পরিবেশিক প্রমাণেরও মূল্য যথেষ্ট। প্রয়োজনে শিলা-লিপি, তাম্র-শাসন, প্রবাদবাক্য ও পুঁথির সাহায্য নিতে হবে। বংশগত মণ্ডল, সামন্ত, ঢালি, ধানুকী, রথ [রথি] প্রভৃতি এরূপ বহু পদবী আজও আছে। খাঁড়া ইত্যাদি অর্থবোধক পদবীগুলিও গ্রহণীয়। প্রাচীন কাব্যগুলিতে বহু রাজপ্রশস্তি আছে। শিলালিপির রাজপ্রশস্তির মতোই সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো প্রশাসনিক ইতিহাসেরও প্রয়োজন আছে। জমিনদারি সেরেস্তাতে রক্ষিত জমির স্বত্বসম্পর্কিত পরচা ও দাখিলা গুলির ও সাহায্য এই সম্পর্কে গ্রহণীয়। পূর্বে বহুস্থলে বেতনের বদলে রাজ কর্মচারীদের স্বত্ব মতো জমি জমা দেওয়ার রীতি ছিল।

ভারতের অন্যস্থানের মতো বাংলাদেশেও পুলিশফৌজ দু-ভাগে বিভক্ত ছিল : নগর-

পুলিশ ও গ্রামীণ-পুলিশ। নগর-পুলিশগুলি শাসক-আরোপিত ও গ্রামীণগুলি জন-গণ-সৃষ্ট। গ্রামীণ পুলিশ বিকেন্দ্রিত, স্থানীয় ও স্বয়ম্ভর ছিল। ভারতের নগর-পুলিশ-গুলি একই রূপ হলেও গ্রামীণ-পুলিশ স্থানভেদে বিভিন্ন রূপ হতো।

কপিলাবস্তু, রাজগৃহ ও পাটলীপুত্রের মতো বাংলার রাজধানী গৌড়নগরও রক্ষীগণ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পূর্বোক্ত নগরগুলি অপেক্ষা গৌড় ছিল আয়তনে বৃহৎ। এইরূপ সুবৃহৎ নগরী রক্ষার জন্য বৃহৎ রক্ষীবাহিনী অবশ্যম্ভাবী। তার রক্ষীদের সংগঠন সম-কালীন অন্য শহরের মতো হতে বাধ্য। কারণ সব-কটি নগরই সমকালীন ও একই সভ্যতার অধিকারী। গৌড়-নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নগর-প্রাচীর সংলগ্ন সারি-বন্দী রক্ষী-কক্ষগুলি আজও বর্তমান।

গৌড় স্থাপিত হয় ৮০০ খ্রী. পূ.। তার শহরতলি ও উপনগর-সহ আয়তন ২০ বর্গ-মাইল। গৌড়ে দশ লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল [১৯০২ খ্রী. কলিকাতার লোক-সংখ্যাও দশ লক্ষ]। আয়তনে, অট্টালিকাসমূহে ও ভাস্কর্য আড়ম্বরে তখন উহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী, [কলিকাতা নগরীর সমতুল] তার অধিবাসীদের পান যোগাবার জন্য ত্রিশ হাজার পানের দোকান ছিল। দীর্ঘকাল বাংলা দেশের রাজার রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও, মহারাজ লক্ষ্মণসেন গৌড় জয় করে তার নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার নাম দেন, জেনেতাবাদ। প্রাচীন গৌড় যে-সকল প্রদেশের রাজ-ধানী ছিল সেই সকল প্রদেশে গৌড়ীয় ভাষার প্রচলন ছিল। তাকেই সাধারণত বাংলা-ভাষা বলা হয়। কয়েকটি সীমান্ত ভূমি ব্যতীত দেশের সর্বত্রই ওই ভাষা প্রচলিত [আবুল ফজল দ্র.]।

এই রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গভূমি [পূর্ববাংলা], রাঢ়ভূমি [পশ্চিম-বাংলা], বরেন্দ্রভূমি [উত্তরবাংলা], মিথিলা ও ঝাড়খণ্ড প্রদেশ ছিল। মধ্যে মধ্যে এ-সবে মগধের ও ওড়িশার কিছু অংশ যুক্ত হয়। বাংলার রাজারূপে স্বীকৃত হতে হলে গৌড়-নগর দখল করতে হতো। গৌড় বহুবার সমগ্র বাংলার রাজধানী ছিল।

জনৈক ব্রিটিশ সেনা-নায়ক গৌড়-সম্বন্ধে গবেষণার জন্য কিছুকাল গৌড়ে ছিলেন। তাঁর মতে গৌড়ের নগরের উপর নগর সৃষ্টি হয়েছে। এই মহানগর কালক্রমে কিছুটা দূরে সরে এসেছে। সেজন্য ওই স্থানে গভীর ও ব্যাপক উৎখননের প্রয়োজন। গৌড় সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি তাঁর 'স্কেচেস অফ্ ইণ্ডিয়া ফায়ার-সাইড ট্র্যাভেল' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে :

'তুমি গৌড়-মহানগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বিচরণ করছো। তার ইঁটগুলো যুগ-যুগান্তে পূর্বের মানুষেরাই তৈরি করেছিল। সেই নগরের মন্দির, প্রাসাদ ও অট্টালিকা সমূহ এইখানে ধূলিলীন হয়ে রয়েছে। এই মহানগরের সন্ততিগণ একদা শৌর্যে বীর্যে

খ্যাত ছিল। তার দুর্গ-সমূহ সমৃদ্ধ, প্রাকারগুলি সুরক্ষিত, ধনাগারগুলি [ব্যাঙ্ক ?] পূর্ণ এবং তনয়ারা সুন্দরী ছিল। তার ভোজনাগার [হোটেল ?] গুলি প্রাচুর্য-পূর্ণ ছিল। এই মহানগর আজ প্রায় ধূলিলীন হয়েছে। তার গৌরবকালের মধ্যে ব্যাবিলন, টায়ার, সাইডেন, মিশর, কার্থেজ, রোম, বাইজানটিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়েছে। কিন্তু তার পরও এই মহানগর বহুকাল উন্নতশির ছিল।'

[পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের বহুখ্যাত প্রাসাদ সমূহ গৌড় হতে অপহৃত কারুকাজ-করা পাথর দিয়ে তৈরি। ব্রিটিশরাও গৌড় হতে বহু নিদর্শন য়ুরোপে পাঠায়। কলিকাতার দুটি পাথরের বাড়ি গৌড়ের উপকরণ দ্বারা তৈরি।]

প্রাচীন গৌড়ের মহারাজার অধীনে বঙ্গভূমি, রাঢ়ভূমি ও বরেন্দ্রভূমি প্রভৃতি প্রদেশগুলির শাসনের ভার এক-একজন মহাসামন্তেব [উপরাজা] উপর অর্পিত ছিল। মহাসামন্তদের অধীনে জিলাগুলিতে [পৌণ্ড্র, সমতট আদি] সামন্ত-রাজারা ছিলেন। স্তবে স্তরে বিকেন্দ্রিত স্বয়ংভর প্রশাসন ভারতের বৈশিষ্ট্য। মহারাজার ও মহাসামন্তদের রাজধানীতে নগর পুলিশ ও তাঁদের অধীনে সামন্ত-রাজাদের কর্তৃত্বে গ্রামীণ পুলিশ ছিল। সামন্ত-বাজারা নিজস্ব সেনাবাহিনী, বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিশসহ বিকেন্দ্রিত স্থানীয় শাসক ছিল। এঁরা মহাসামন্তদের অধীনে সৈন্যপরিচালনা করতেন। আজও সৈন্য-সামন্ত শব্দ দুটি একত্রে উচ্চারিত হয়। বাঙালীর স্মৃতি হতে এঁরা আজও বিদূরিত হন নি। এঁদের বংশধররা আজও সামন্ত পদবী ব্যবহাব কবেন।

সামন্ত-রাজাদের অধীনে গ্রামাঞ্চলে মণ্ডলেশ্বরগণ ছিলেন। প্রতিজন মণ্ডলেশ্বরেব উপব নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রামের শাসনভার ছিল। প্রতিটি গ্রাম একজন গ্রামীণ মণ্ডলের [মোড়ল] অধীনে ছিল। বংশানুক্রমে মণ্ডল পদবী আজও এদেশে প্রচলিত রয়েছে।

প্রতিটি জাতীয় মণ্ডল পৃথক হওয়াতে গণ-সভা জনৈক মহা-মণ্ডলের অধীনে বসতো। বর্তমান পঞ্চায়েৎ-প্রথা তা থেকেই সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ-পুলিশ ও বিচার এঁদের অধীন ছিল। পঞ্চ-মুখের বাণী এক মত হলে তা ঈশ্বরের বাণী। পাঁচ জনের বাক্য ও আশীর্বাদ গ্রহণ প্রাচীন প্রথা। এঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নির্বাচিত হওয়াতে সর্বজন গ্রাহ্য ছিলেন। প্রতিটি বিচারে এক মত হওয়া এঁদের বিশেষত্ব। সমগ্র গ্রামবাসীর মতের প্রয়োজন হলে ষোলোআনা পঞ্চায়েৎ ডাকা হতো। এই দুই প্রকারের পঞ্চায়েতের সহিত বর্তমান অ্যাসেম্বলী ও ক্যাবিনেট্ সমূহ তুলনীয়।

উপরোক্ত রূপ ক্ষমতার ভাগাভাগি হতে পরবর্তীকালীন ত্রিস্তরীয় জমিনদারি পুলিশের সৃষ্টি হয়। এতে কারুর পক্ষে অত্যাচারী ও অনাচারী হওয়া সম্ভব হতো না। সমগ্র বাংলা ও ছোটনাগপুরের এবং বিহার ও ওড়িশাতে পাইক-প্রধান জমিনদারি পুলিশ ছিল। এরূপ পুলিশী ব্যবস্থা ভারতের অন্যত্র ছিল না। উক্ত প্রদেশ কয়টি যে প্রাচীন

গৌড় [মগধ গৌড়] রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তা উহা প্রমাণ করে [জমিনদারি পুলিশ দ্রঃ]

[বি. দ্র.] মহারাজ শশাঙ্ক প্রথম জীবনে কর্ণসুবর্ণের সামন্ত-রাজা ছিলেন। ৬০০ খ্রীঃ উনি রাঢ় দেশের মহা-সামন্ত হন। বিহারে রোটাস-গড়ে গিরিগাত্রে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক এই নামটি খোদিত আছে। তৎকালে উনি গৌড়ের অধিপতি মহা-সেনগুপ্তের অধীন মহাসামন্ত ছিলেন। পরে গৌড়ের মহারাজাকে হটিয়ে [গৌড় দখল করে] তিনি বাংলার স্বাধীন রাজা হন। সম্রাট শশাঙ্ক সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকক্ষ ও সমসাময়িক ছিলেন।

শশাঙ্কের মতো সেন-রাজারাও গৌড় দখল করার পূর্বে প্রথমে রাঢ়ের বিজয়-নগরে সামন্ত-রাজা ছিলেন। পরে তাঁরা সমগ্র রাঢ়ের মহাসামন্ত হন এবং রাঢ়ের রাজধানী তথা উপ-রাজধানী নদীয়া দখল করেন। সেন ও পাল-রাজাদের পূর্বে বঙ্গভূমির মহা-সামন্ত বর্মন-রাজারাও গৌড় দখল করে কিছুকাল সমগ্র দেশের নৃপতি হয়েছিলেন। গৌড়ের পরবর্তী নৃপতিরাও গৌড়েশ্বর হওয়ার পূর্বে বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্ত ছিলেন। এতে অনুমিত হয় যে জনৈক সামন্ত-রাজাকেই মনোনীত বা নির্বাচিত মহাসামন্ত করা হতো। এঁরা গৌড়ের মহারাজার পক্ষে সামন্ত-রাজাদের কাজের তদারকী করতেন।

৭৫০ খ্রী. গৌড়ের নৃপতি কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্মা কর্তৃক নিহত হলে বাংলা দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। তখন বাংলার মহাসামন্তরা, সামন্তরাজাগণ ও জনসাধারণ একত্রে গোপাল নামক এক বীর-নায়ককে গৌড়ের নৃপতি নির্বাচন করেন। সম্ভবত তিনি বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্তদের বংশোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ছিলেন।

ওই পাল-বংশীয় বৌদ্ধ-নৃপতিরা রাজ্যের বাইরেও কামরূপ, ওড়িশা, কাশী, মগধপ্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন [৭৭০-১০৩৮ খ্রী.]। এই সময় বাংলাদেশে রাজ নৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নোক্তরূপ।

পাল-বংশীয় দুর্বল মহারাজা নয়নপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল প্রজা-বিদ্রোহে নিহত হলে বরেন্দ্রভূমির মহাসামন্ত দিবাকর গৌড় দখল করেন। কিন্তু মহীপালের ভ্রাতা রামপাল অন্য মহাসামন্তদের সাহায্যে [১০৮০—১১২৩খ্রী.] কৈবর্ত-রাজ ভীমকে নিহত করে গৌড় পুনর্দখল করেন।

১১৪৩ খ্রী.—১১৬১ খ্রী. বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা পুনরায় পরিবর্তিত হয়। রাঢ়-ভূমির [পশ্চিমবঙ্গ] মহাসামন্ত সেন-উপরাজারা বঙ্গভূমির [পূর্ববঙ্গ] মহাসামন্ত বর্মনদের বিতাড়িত করে তাদের রাজধানী বিক্রমপুর দখল করেন। মতান্তরে উভয় উপবাজবংশ বিবাহ-সূত্রে একত্রিত হন। তাদের মিলনে সেন-বর্মন [সেন-বর্মা] পদবিটি উদ্ভব হওয়া সম্ভব। এর পরে সেন-রাজাবা [রাঢ় ও বঙ্গের মিলিত শক্তিতে] ১১৭৯-১২০৬ খ্রী. গৌড়ের তথা সমগ্র বাংলার বৌদ্ধ-নৃপতিকে হটিযে বরেন্দ্রভূমি সহ গৌড দখল করে গৌডেশ্বর হলেন।

সেন-বংশীয় শেষ-রাজা লক্ষ্মণসেন একটি চরম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভুল করলেন। তিনি বাংলাব মহাসামন্ত-পদগুলির বিলোপ ঘটিয়ে বাংলা-শাসনের জন্য কেবল মাত্র সামন্ত-রাজাদের উপর নির্ভরশীল হলেন। তাই তদবধি মহাসামন্ত নামের কোনও উল্লেখ আমরা কোথায়ও দেখি নি। তিনি মহা-সামন্তদের সম্ভাব্য [তাঁদের নিজেদের মত] বিদ্রোহ হতে চিরমুক্ত হতে এইরূপ ব্যবস্থা নেন। কিন্তু তার ফল বিপরীত হয়ে গিয়েছিল। দূরবর্তী সামন্ত-রাজাদের উপব মহাসামন্তদের তদারকির অভাবে লক্ষ্মণ-সেনের বৃদ্ধ-বয়সে অধিকাংশ সামন্ত-বাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করেন। [লক্ষ্মণসেন। ভারতকোষ] তৎকালীন অনুন্নত পথ-ঘাটের জন্য বিদ্রোহ-দমনে অসুবিধা ছিল। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে সামন্ত-রাজাদের এই বিদ্রোহে লক্ষ্মণসেন সহায়হীন হয়েছিলেন।

[বি. দ্র.] বাংলাদেশ তখনও বৌদ্ধ প্রধান। মহা-সামন্তদের পদটির বিলোপন সামন্ত-রাজাদের মনঃপূত নয়। কারণ—তাঁদের মধ্য হতেই একজনকে মহা সামন্ত করা হতো। ভারতের অন্যস্থানের মতো বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধের বিবাদ তখন সম্পূর্ণ মেটে নি। হিন্দু সেন-রাজার বৌদ্ধ-নৃপতি বিতাডনে বৌদ্ধরা ক্ষুব্ধ। সেইকালে কিছু বৌদ্ধ নিশ্চয়ই উৎপীড়িত হয়ে পুনরায় হিন্দু হন। প্রমাণ, তৎকালীন কয়েকটি প্রাচীন গাথা! 'বুদ্ধের দেবতা আসে চাঁদ মাথায় দিয়ে।' সে-সময়ে কাশ্মীর, সিন্ধু, পশ্চিম-পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা বৌদ্ধ-প্রধান ছিল।

[জাতিভেদের দরুন বাঙালীরা হিন্দু হতে মুসলিম হয় নি। কাস্ট্ হিন্দুদের মতো সিডিউলরা-ও বহু জাতিতে বিভক্ত। ধর্মের চাইতে জাতির উপর তাদের প্রাধান্য বেশি ছিল। হিন্দুদের প্রতিটি জাতি এক-একটি ক্ষুদ্র রিপাবলিকের মতো। সেই

তুর্ভেন্ত তুর্গে অন্যের অনুপ্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু জাতিভেদহীন বৌদ্ধদের বৌদ্ধ-প্রধান স্থান কয়টিতে মুসলিম করা সম্ভব হয়। বৌদ্ধরা মস্তক মুণ্ডন ও লুঙ্গী করে বস্ত্র পরিধান করতো। তারা মুসলিম হওয়ার পরেও হিন্দুরা তাদের পূর্বের মতো নেড়া-মাথা বলে। লুঙ্গী আরব-দেশ হতে আমদানী করা নয়। পাকতুনস্থানে পাঠান ও বালুচ প্রভৃতি জাতিরা আজও মস্তক মুণ্ডন করে থাকে। এরাও পূর্বকালে অন্যদের মতো বৌদ্ধ হতে মুসলিম হয়েছিল।]

শশাঙ্ক ও সেন-রাজাদের বৌদ্ধ-বিরোধ বর্তমান বাংলা-বিভাগের এবং ভারত হতে বৌদ্ধ-ধর্মের বিলুপ্তি ভারত-বিভাজনের জন্য দায়ী। [শঙ্করাচার্য দ্র.]। এই তুটি ঘটনা না ঘটলে ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। আমরাও বহু তুর্ভোগ হতে মুক্তি পেতাম।

উপরোক্ত রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলাদেশে বিদেশী মুসলিম আক্রমণ শুরু হলো [১২০৪ খ্রী.]। দেশের এ-রকম অবস্থায় বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের পক্ষে গৌড় ও নদীয়া রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। পশ্চিম-ভারতের রাজন্যবর্গের অবস্থা তিনি শুনেছিলেন। তিনি এ-ও জানতেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহী দূতদের পশ্চাতে বিরাট মুসলিম-বাহিনী আছে। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীরা তাঁকে কলিকালে যবন-রাজ্যের বিষয় হয়তো বলে থাকবেন। সাম্প্রতিক চীনা-আক্রমণেও শাস্ত্রোক্ত পীত-জাতির রাজ্য হবে বলা হতো। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেনের অধীনস্থ সামন্ত-রাজগণ তাঁদের পুলিশ ও সৈন্যবল-সহ বিদ্রোহী হন।

বঙ্গভূমি ও রাঢ়ভূমির মহাসামন্তদের রাজধানী তুটি নদীয়া [নবদ্বীপ] ও বিক্রমপুর [মহাসামন্তদের বিলুপ্তিতে] লক্ষ্মণসেনের প্রত্যক্ষ অধিকারে আসে। তাই লক্ষ্মণসেন গৌড় ত্যাগ করে প্রথমে নবদ্বীপে ও পরে বিক্রমপুরে পশ্চাদ্‌পসরণ করেন। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুবিধা ছিল। রণবিদ্ লক্ষ্মণসেন এ-বিষয়ে একটুও ভুল করেন নি। পূর্ববঙ্গে তিনি স্বাধীন রাজারূপে দেহত্যাগ করেন।

কিন্তু—লক্ষ্মণসেনের বিদ্রোহী সামন্ত-রাজাদের নিকট নতিস্বীকার করে তাদের আহ্বান না-করে গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করা উচিত হয় নি। বাংলার বিদ্রোহী সামন্ত-রাজারা যখন জানলো তখন দেরি হয়ে গেছে ও সব শেষ হয়ে গেছে। তাদের একত্রিত করার জন্যে মহারাজা বা মহা-সামন্তরা উপস্থিত নেই। ওই পদগুলি নৃপতি লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর হওয়ার পর বাতিল করে দিয়েছিলেন। সামন্তরাজারা তখন নিজ-নিজ উপরাজ্য সমূহ রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গৌড় দখল অর্থে বাংলা দখল বুঝায় না। সামন্ত-রাজারা বারো-ভুঁইয়া নামে আভ্যন্তরিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন থাকে। এদের সৈন্য, আদালত ও পুলিশ তিনই ছিল। কেন্দ্র-শক্তিকে [পাঠানদের] তাগিদ দিলে এরা সামান্য কর দিত। বাংলার আভ্যন্তরীণ

ভাগ বিদেশীদের নিকট দুর্গম ও বিপজ্জনক ছিল। তারা পাহাড় দেখলেও এত জল কোথাও দেখে নি। উভয় পক্ষেই ঝঞ্ঝাট এড়াতে কিছুটা পারস্পরিক বন্দোবস্ত করে। দূরবর্তী সামন্ত-রাজারা পাঠানদের এইটুকু স্বীকৃতিও দেয় নি।
পাঠানরা গৌড় রাজধানী ও নবদ্বীপ আদি [পূর্বতন] মহাসামন্তদের নগরগুলিতে ঘাঁটি করে। ওই শহরগুলি শাসনের জন্য পাঠানরা বিচার-কার্যে কাজীদের নিযুক্ত করে। শ্রীচৈতন্যের সময়েও নবদ্বীপে কাজীর শাসন দেখা যায়। কিন্তু—বাংলার সমগ্র গ্রামাঞ্চল বার-ভূঁইয়া নামক সামন্ত-রাজাদের অধীন থাকে। পাঠানরা যুদ্ধকালে বার-ভূঁইযাদের সাহায্য নিতো। প্রাচীন কাব্যগুলিতে বাঙালীর সামগ্রিক যুদ্ধ-যাত্রার বহু বিবরণ আছে। তাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হাড়ী ডোম আদিকে একত্রে রণ-দামামা-সহ যুক্ত থাকতে দেখা যায়। মোগল-আক্রমণকালে যুদ্ধে এরা পাঠানদের সাহায্য করে। ফলে, বাবর বিহার অধিকার করলেও বাংলা দখলে অক্ষম হন। পাঠানদের উচ্চপদী কর্মীদের মধ্যে বহু হিন্দু ছিল।
[ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম অহিংসা প্রতিরোধ-নীতির প্রবর্তক। তিনি নিরস্ত্র জনগণ সমভিব্যাহারে শহরে কাজীকে নতিস্বীকারে বাধ্য করেন। অস্পৃশ্যতা বিদূরণ এবং হরিজন,উন্নয়নেরও পথিকৃৎ তিনি। জাতিভেদ বিলুপ্তি ও সাম্যপদ স্থাপনের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তাঁর অহিংসাবাদ প্রচারে উৎকলীদের শৌর্য-বীর্যের কত-টুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছিল কিংবা সম্রাট অশোকের অহিংসা-নীতির ফলে মৌর্যদের পতন হয় কিনা। এই বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। শ্রীচৈতন্য শেষ-জীবনে বিদেশী-কবলিত নবদ্বীপ ত্যাগ করে স্বাধীন ওড়িশা-রাজ্যে চলে যান।]
বিদেশী-অধিকার কালে শহরমুখী বাঙালীরা আবার গ্রামমুখী হতে থাকে। বিলুপ্ত-মহাসামন্তদের নবদ্বীপ আদি-উপ-রাজধানী ও গৌড় হতে বাঙালীরা দলে-দলে সামন্ত-রাজাদের আশ্রয়ে চলে যায়। এযুগের রিফিউজি-প্লাবন যারা দেখেছে তারা সে-যুগের রিফিউজি-প্লাবন অনুমান করতে পারবে। সেকালে বিতাড়িত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের নেপাল, রাজস্থান, ওড়িশা ও দক্ষিণদেশে আজও দেখা যায়। তারা অধুনা ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও আজও নিজেদের গৌড়ীয় [বাঙালী] ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় দেয়। তাদের উপাধি শর্মা অর্থাৎ দেবশর্মণ আজও তারা ব্যবহার করে। শহর হতে রিফিউজী তথা বাস্তুহারা আগমনের ফলে গ্রামাঞ্চলে নগর ও গ্রামীণ-সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে। গ্রামের আত্মরক্ষামূলক জলনিকাশী ব্যবস্থা হতে তা বোঝা যায়। শহরের মানুষ গ্রামে পর্ণকুটিরের পাশে অট্টালিকা তৈরি করে। বাংলাদেশে এই কারণে তৎকালে দ্রুত সামাজিক বিবর্তন ঘটেছিল।
[ইংরাজ সেচবিদ্ বার্নিয়ার বাংলাদেশে ১৬৬০ খ্রী. মানুষের তৈরি খালের উর্ণনাভ

দেখেছিলেন। মারাঠারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতি গিরিশীর্ষে দুর্গ তৈরি করে। কিন্তু বাঙালীরা আত্মরক্ষার্থে ঘন সন্নিবেশিত অসংখ্য নদী-যুক্ত খালের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য সেগুলি নৌবহ ও সেচের কার্যেও সাহায্য করেছে। কিন্তু আত্মরক্ষার কারণ ব্যতীত নদীমাতৃক দেশে এত বেশী খালের প্রয়োজন ছিল না। বাঙালী জনসাধারণ বিদেশীদের রুখতে দ্রুত উহা সমাধা করে। জলাশয়, অতিথিভবন, মন্দির, চতুষ্পাঠী স্থাপন করলেও বাঙালীরা বিদেশীদের রুখতে সাঁকো বা রাজপথ করে নি।]

গৌড়ের ভেঙেপড়া প্রস্তর প্রাচীর
ত্যাগ করে এলো ফিরে বাঙালী বীর।
কেন্দ্রহীন ক্ষত্রশক্তি নিস্তব্ধ নগর,
বাঙালী জানে না নোয়াইতে শির।
ফিরে এলো গ্রামে গঞ্জে অরণ্যে প্রান্তরে,
প্রয়োজন নেই যথা রথ গজ বাজী
শৌর্যে বীর্যে রণে সংকল্পতে ধীর।
আজ তারা মহারাজা মহাসামন্তহীন
আছে সামন্তরা আর আছে সৈন্যগণ,
দুর্ভেদ্য দুর্গ তাদের জলানদী বন।
সামন্ত-রাজ ভূঁইয়ার কিংবা জমিদার,
যে নামেই ডাক না তোমরা তাদের,
কৃষকের নেতা তাঁরা আমাদের রাজা,
বিকেন্দ্রীত বাঙালীরা রহিবে স্বাধীন।

বিকেন্দ্রিত বাঙালীরা সামন্ত-রাজাদের অধীনে স্বাধীন রইলো। কিন্তু কেন্দ্রেও তারা বেশী দিন পরাধীন থাকে নি। সামন্ত-বংশোদ্ভব রাজা গণেশ [খীঃ পূ. ১৪১৭-১৯১৮] সামন্ত-রাজাদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শক্তিকে বিতাড়িত করে বাংলার রাজা হন। ইনি গৌড় নগরীর শহরতলিতে পাণ্ডুয়া-নগরে রাজধানী করেন। রাজা গণেশের পুত্র মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলেও রাজবংশ বাঙালীই রইলো। রাজা গণেশ রাজনীতির সঙ্গে রণনীতির সংমিশ্রণ ঘটান এবং ভিতর ও বাহির হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত বারোজন ভূঁইয়ারাই বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন: আমি বাঙালীদের দেখে নেব। বাংলাদেশের নগণ্য সংখ্যক পাঠানদের উদ্দেশ্যে তিনি এ-কথা লেখেননি। পাঠান সুলতান বিবদমান বারো-ভূঁইয়াদের ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের জন্য টিঁকে ছিলেন। বাবর নদীমাতৃক বাংলার বারো-ভূঁইয়াদের শক্তিমত্তা বুঝতেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে তিনি বাঙালীদের

উদ্দেশ্য করেই তা লেখেন। সেইজন্য তিনি বিহার অধিকার করলেও বাংলাদেশে আসেন নি। পাঠানদের পরিবর্তে বাঙালীদের উপরই তাঁর ক্রোধ ছিল বেশি। পূর্ব-ভারতে পাঠানরা তখন মোগল-কর্তৃক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। নতুন পাঠান পশ্চিম হতে আসতে পাবে না। বাঙালী যোদ্ধা-ভূঁইয়ারা তখন তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। পাঠানদের শেষ সময়ে এই ভূঁইয়ারা পবিপূর্ণ স্বাধীন রাজা হন।

[বিহারের এক ভূঁইয়ার পুত্র শেরশাহ গৌড় হতে বহির্গত হয়ে হুমায়ূনকে ভারত হতে বিতাড়িত করেন। প্রথা মতো বাংলাদেশের ভূঁইয়াদের অধীনস্থ বাঙালী সৈন্যদের তিনি নিশ্চয় সাহায্য পেয়েছিলেন। কারণ ওই সময়ে বাংলা ও বিহারে তাঁর সকল শক্তি সীমিত ছিল। শেরশাহ বিদেশী পাঠান-বংশোদ্ভব হলেও নিজে একজন খাঁটি ভারতীয় ছিলেন। বাংলার ভূঁইয়া বাজারা তাঁকে নেতারূপে মেনে নিয়ে গৌড়ের দুর্বল স্থলতানকে বিতাড়িত করে তাঁকেই গৌড়ের নৃপতি করেন। মোগলদের রুখতে বাঙালী বীবদের সাহায্য তাব প্রযোজন হয়েছিল।]

মানসিংহের অধীনে রাজপুত বাহিনী এবং কিছু [বিক্ষুব্ধ] বাঙালী ভূঁইয়ার রাজাদের সাহায্যে মোগল-সম্রাট আকবব পাঠানদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু তিনি বারো-ভূঁইযার তথা সামন্ত-রাজাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। কিছু ভূঁইযাদেব সাহায্য না-পেলে পাঠানদেব [নদীবহুল দেশে] বিদূরিত করা সম্ভব হতো না। রাজা প্রতাপাদিত্য এই সাহায্য-দানে অস্বীকার করেন। তাঁকে দমন করতে বিবোধী ভূঁইয়াদের সাহায্য নিতে হয়। মধ্যবর্তীরূপে হিন্দু মানসিংহ ও তাঁর মোগল বাজপুত সম্মিলিত বাহিনী ও বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অর্থবল না-থাকলে তা সম্ভব হতো না।

[বাঙালী সামন্তদের অসন্তুষ্ট কবার জন্য রাজা লক্ষ্মণসেনের পতন হয়। পরে এদের অসন্তুষ্ট করার ফলে পাঠান-স্থলতানদের বিদায় নিতে হয়। এই অসন্তুষ্টির জন্য নবাব সিরাজদৌল্লারও পতন ঘটে। বাঙালী একহাতে মগেদের ও অন্য হাতে মোগলদের রুখেছিল।

নিজেদের ফৌজ-আদালত-পুলিশের অধিকারী জাতি পরাধীন নয়। পর্তুগীজ ও আরা-কান প্রভৃতি বিদেশী শক্তির সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাদের বাধা নেই। নিজেদের মধ্যে কিংবা অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহও এরা করেছে। এ জন্যে কারো অনুমতির প্রয়োজন হতো না।

বাংলার বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ পুলিশ ও বিচার-ব্যবস্থা বারোজন ভূঁইয়াদের অধীন ছিল। তৎকালীন গ্রামীণ-পুলিশ প্রয়োজনে সৈন্যদের সহায়ক হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ত্রিস্ত-রীয় শাসন ব্যবস্থা হতে ত্রিস্তরীয় জমিনদারী পুলিশের সৃষ্টি হয়। [ত্রিস্তরীয় শাসন

অর্থে মহারাজা, মহাসামন্ত এবং সামন্ত রাজার শাসন।]

উপরোক্ত সামন্ত রাজাদের বৃহৎ নৌকাগুলি ভাসমান দুর্গের মতো ছিল। ছিপ-নৌকা-গুলি দ্রুতগতিতে সেনা বহন করতো। রণ-পা দৌড় গেরিলা-সৈন্য ঝটিতে এসে ঝটিতে বিলীন হতো। এদের পাঠান ও মোগলরা যথাক্রমে ভূঁইয়ার ও জমিনদার বলেছেন। বস্তুতপক্ষে, এরা রাজ্যের মধ্যে উপরাজ্য স্থাপন করেছিল।

বাংলার ইতিহাস কয়েকজন দেশী বিদেশী জবর-দখলকারীর ইতিহাস নয়। উপরোক্ত উপশাসক তথা কৃষক-নেতৃবর্গের ইতিহাস বাঙালীর ইতিহাস। এই সকল সামন্তরা একজন নেতার অধীনে একত্রিত হলে বিদেশী শক্তিকে [রাজা গণেশের মত] বিতা-ড়িত করা সম্ভব ছিল। এই ক্ষেত্রে সেটা রাজাদের যুদ্ধ না হয়ে গণযুদ্ধ হতো। কিন্তু পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষ ত্যাগ করে তাঁরা কোনও দিনই একত্রিত হন নি। [উড়িষ্যা ব্যতীত ভারতে বিদেশীদের বিরুদ্ধে গণ-যুদ্ধ কোথাও হয় নি।]

[বি. দ্র.—প্রতাপাদিত্য রাজা গণেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। তিনি পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে কার্যে নামেন। পর্তুগীজদের সাহায্যে উন্নত অস্ত্র তিনি সংগ্রহ করেন নি। ওদের দ্বারা নিজের সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন নি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অন্য ভূঁইয়াদের তিনি একত্রিত করেন নি। অবস্থা সঙ্গীন না-হলে বিরাট রাজপুত ও মোগল-বাহিনীসহ স্বয়ং মানসিংহ আসতেন না। প্রতাপাদিত্যের বিরোধী-ভূঁইয়াদের সক্রিয় সাহায্যেরও মোগলদের প্রয়োজন হতো না। ভারতে রাণা প্রতাপ ও প্রতাপা-দিত্য প্রভৃতি বীর জন্মেছিলেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত, শিবাজী ও শৈলেন্দ্র-রাজার মতো জেনারেল কম জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রমাণ, প্রতাপাদিত্য-পুত্র উদয়াদিত্যের মোগলের সঙ্গে নৌযুদ্ধে স্থলে স্থাপিত বৃহৎ কামানের মুখে সংকীর্ণ খালে ছোট কামানসহ তাঁর নৌবাহিনী আনয়ন।]

এটি স্বীকৃত সত্য যে প্রতাপাদিত্য প্রদেশ-শাসক নবাবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু—এর পরও তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে কোনও কোনও ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন। অবস্থা সঙ্গীন না হলে মানসিংহের মতো সর্ব-শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষের অধীনে বিরাট সম্মিলিত মোগল ও রাজপুত-বাহিনী বাংলাদেশে প্রেরিত হতো না। মানসিংহকে এজন্য বহু প্রতাপ-বিরোধী বাঙালী ভূঁইয়াদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। প্রতাপাদিত্য বাখরগঞ্জ খুলনা যশোহর ঈশ্বরপুর ও গড় কমলে দুর্গ এবং সাগরদ্বীপে নৌঘাঁটি তৈরি করেন। তাঁর সর্দার শঙ্কর, কালী ঢালী, কমল খোজা ও সূর্যকান্তর মতো দক্ষ সেনাধ্যক্ষ ছিল। তিনি প্রদেশ নবাবের বিরুদ্ধে জয়ী হলেও তাঁর শক্তিক্ষয় হয়। সেই অবস্থাতে তাঁকে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ শক্তির সহিত যুদ্ধ করতে হয়। জনৈক ক্ষুদ্র নৃপতির পক্ষে উহা নিশ্চয়ই অসীম সাহস ও

শক্তির পরিচয়। জয় পরাজয় কিছুটা ভুল ভ্রান্তি ও ভাগ্যের উপরও নির্ভরশীল। আশ্চর্য এই যে তাঁর চিরশত্রু মির্জানাথের পুস্তকের উপর নির্ভর করে ওঁকে বিচার করা হয়। বাদশাকে খুশী করার জন্য প্রতাপ নিন্দা তাদের কাছে বিশ্বাস্য। কিন্তু—প্রাচীন কবিদের প্রতাপ প্রশস্তি [বাহান্ন হাজার যার ঢালি] গ্রহণীয় নয়। জিজ্ঞাস্য এই যে তাহলে অন্য ভূঁইয়াদের সম্বন্ধে ঐরূপ কবিপ্রশস্তি নেই কেন ? এখানে এক-মাত্র পরিবৈশিক প্রমাণ উভয় মতবাদের সুমীমাংসা করতে পারে।

মোগল-জেনাবেল মানসিংহ রাজপুত ও মোগলের সম্মিলিত বাহিনীর দ্বারা প্রতাপা-দিত্যকে বন্দী করলেও তাঁর বাজ্য দখল করতে পারেন নি। একটি যুদ্ধ কখনও শেষ যুদ্ধ হয় না। তাঁকে তাঁর উত্তবাধিকারীদের স্বীকার করতে হয়েছিল। এই পন্থা—পববর্তীকালে প্রজাদেব সন্তুষ্ট করতে ব্রিটিশরাও গ্রহণ করেছিলেন। মানসিংহ পৃথক পৃথকভাবে পরস্পর-বিবোধী ভূঁইয়া-রাজাদের অনুগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীপুবের সামন্ত-রাজা কেদার রায় তাঁর ওই চাতুর্য বুঝে অন্য ভূঁইয়া-রাজাদের একত্রিত করতে চেষ্টা কবেন। প্রতাপাদিত্যেব পরাজয় হতে উনি বুঝেছিলেন যে একক যুদ্ধ না করে সকলে একত্রে যুদ্ধ করা উচিত। তা সত্বেও উনি সকল ভূঁইয়াকে একত্রিত করতে পারেন নি। এতে মানসিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার প্রাক্কালে মিশ্রভাষাতে তাঁকে নিম্নোক্ত পত্রটি পাঠিয়েছিলেন :

"ভীষণ সমরসিংহ
মানসিংহ প্রষাতি
কাকলি চাকলি ত্রিপুরী
বঙ্গালী—
ভাগি যাও পলায়ি।"

কিন্তু এই চরম পত্রটি পেয়েও তাঁরা কেউ ভীত হয়ে পলায়নপর হন নি। উপরোক্ত পত্রটি হতে বাঙালী-ভূঁইয়াদের সেনাবাহিনীর সৈন্যদের জাতি ও শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে বাঙালী জমিনদার-শাসকদের সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের সঙ্গে ভোজ-পুরীদেরও গ্রহণ করা হতো। বিষ্ণুপুরের ও নাটোরের বাগদী-সৈন্যরা এককালে ভারত-বিখ্যাত ছিল। রাজপুত-সেনাপতি মানসিংহের উপরোক্ত পত্রটিতে বাঙালী-সৈন্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা অন্য পক্ষের পরাজয় উল্লেখ করলেও তাদের দীর্ঘ প্রতিরোধ ও যুদ্ধজয় সম্বন্ধে নীরব ছিলেন।

কিন্তু সম্রাট আকবর এই সকল ঘটনা হতে বাঙালী ভূঁইয়াদের তথা জমিনদারদের শক্তিমত্তা ও প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হন। প্রতাপাদিত্যের সহিত এই যুদ্ধে আকবরেরও বহু সৈন্য ও অর্থ নষ্ট হয়। তিনি বুঝেছিলেন যে নদীনালা ও জলা পার

হয়ে বাঙালীদের কায়দা করা কঠিন। তাই পাঠানদের মতো তিনিও প্রদেশ-রাজধানীতে ও অন্য কয়টি শহরে ফৌজদারদের রেখে এই সামন্ত-রাজাদের নিকট বাৎসরিক নির্দিষ্ট কর গ্রহণে সন্তুষ্ট হন। বাংলার ফৌজদারদের প্রতি আকবরের হুকুমৎ তথা সাবধান-বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এত উদারতা তিনি মেবারের রাণা প্রতাপের প্রতিও দেখান নি।

"বিদ্রোহী জমিনদারদের অবস্থান হতে বহুদূরে ছাউনি ফেলবে। হঠতারিতার সঙ্গে তাদের কোনও দুর্গ আক্রমণ করবে না। তাদের পথঘাট, সরবরাহ ও সংযোগস্থল শুধু অবরোধ করবে। কৃষকগণ ও তাদের নেতৃবর্গ কালেক্টাররা এবং প্রতিভূরা বিদ্রোহী হলে মিষ্টি কথায় অনুগত করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো কখনই নয়!" [ইংরাজি ভাষ্য পরিশিষ্ট দ্র.]

[বি. দ্র.] সেকালে মধ্যস্বত্বভোগী নামে কেউ ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে তৃতীয় কেউ নেই। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত-সমাজ ব্রিটিশদের সৃষ্টি। জনগণ হতে শিক্ষিত বাঙালীকে পৃথক করার এ এক অপচেষ্টা। তাদেব সাহায্যের জন্য একদল ইংরাজি-নবীশের প্রয়োজন হয়েছিল।]

উপরোক্ত স্বাধীনচেতা জমিনদার-শাসকদের পারতপক্ষে কেউ ঘাঁটাতো না। জমিন-দার-শাসকদের নিজস্ব ফৌজ, বিচাব ও পুলিশ ছিল। হিন্দু রাজন্যবর্গ মুসলিম নবাবরা [পাঠান ও মোগল] এই স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন বিকেন্দ্রিত বিচার এবং জাতীয় পুলিশে হস্তক্ষেপ করেন নি। ব্রিটিশরাও বহুকাল এই জমিনদারী পুলিশ ও বিচার সহ্য কবেছে। জমিনদারী পুলিশ [প্রাচীন]—হিন্দু পুলিশ, স্থানীয় পুলিশ ও কিছু মুসলিম প্রথার মিশ্র রূপ। জমিনদারী পুলিশের থানাগুলি পৃথিবীর আধুনিক পুলিশেব পথিকৃৎ। বিকেন্দ্রিত ত্রিস্তরীয় রাজশক্তি হতে ওইগুলি সৃষ্ট হয়।

পাঠান-রাজত্বের শেষদিকে বাংলার বারোজন ভূঁইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা। এজন্য তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আকবরকে পৃথক পৃথক চুক্তি করতে হয়েছিল।

১৬০৩ খ্রী. সম্রাট আকবর সমগ্র সুবা-বাংলাকে ৫৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। পাঠান-আমলের বারোজন ভূঁইয়ার শাসন হতে মোগল-আমলে ২৫ জন জমিনদার-শাসক হন। আকবর বাংলার [বাংলা-বিহার-ছোটনাগপুর] ৫৮২ পরগণার শাসনের ভার ওই ২৫ জন জমিনদার-শাসকের উপর অর্পণ করেন। তাঁদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংকোচ করার বিষয়ে তিনি চিন্তাও করেন নি। বিকেন্দ্রিত জমিনদার-শাসকদের মধ্যে বেশির ভাগ কায়স্থ, কিছু ব্রাহ্মণ এবং দু'জন ক্ষত্রিয় ছিল। জমিনদারী উপরাজ্য-গুলি ছোট বড় জেলা নামে অবহিত হতো। এই ব্যবস্থা জমিনদার-শাসকরা মেনে নেন। কারণ বাৎসরিক কর দেওয়া নেওয়া ছাড়া তাঁরা অন্য বিষয়ে স্বাধীন।

মোগলরা কয়েকটি শহরে ফৌজদারদের অধীনে ফৌজ ও ফৌজদারী পুলিশ রাখে। কিন্তু অবশিষ্ট বাংলাদেশ [পূর্বের মতো] এই ২৫ জন জমিনদার-শাসকদের অধীনে থাকে। জমিনদারদের রাজ্য তথা জিলাগুলিতে তার পরগণার সংখ্যানুযায়ী পুলিশের জটিলতা বা সারল্য ছিল। এ বাদে তাদের নিজস্ব ফৌজ ও বিচার ব্যবস্থাও ছিল। [পরে মোগল মগেদের মতো এরা মারাঠাদের বিরুদ্ধেও লড়েছে। পরে জমিনদার-রাজবংশগুলির কিছু অদল-বদল হয়। পুরানো কয়েকটি বিখ্যাত সামন্ত-রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটে। আলিবর্দী মারাঠাদের ভয়ে তাঁর পরিবারবর্গকে কিছুকাল নাটোরের আশ্রয়ে রাখেন। সিরাজের কু-মতলবী অনুচরদের ওঁরা নাটোর হতে বিতাড়িত কবলেন। এ থেকেই পরবর্তী জমিনদারদেরও শক্তিমত্তা বোঝা যায়।]

এইখানে একশ্রেণীর আদর্শবান ডাকাতের বিষয়ও উল্লেখ্য। সাধারণ ডাকাতদের সঙ্গে এদের প্রভেদ আছে। হিন্দু-রাজাদের পতনের পর তাঁদের কিছু সৈন্যদল বশ্যতা স্বীকার কবে নি। তারা সপরিবারে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। পরে অধঃপতিত হয়ে তারা একশ্রেণীর ডাকাত হয়। তারা জমিনদার-শাসকদের অধীনে গেবিলা-সৈন্যের কাজ কবেছে। বিদেশী শক্তির সঙ্গে এই বংশগত-ডাকাতরা সর্বদাই যুদ্ধ করতো। তারা নিজেদের প্রাচীন বাঙালী নৃপতিদের প্রতিভূ মনে করতো। জমিনদার'রা উৎপীডক হলে তারা তাঁদের সংযত করতো। বিলুপ্ত নৃপতিদের প্রতিভূরূপে তাবা জমিনদাব-শাসক ও ধনী-প্রজাদের নিকট হতে কিছু বাৎসরিক সিধা নিতো। পরিবর্তে ওদের জন্য প্রাণ দিতে তারা সদা-প্রস্তুত থাকতো।

[টিপু স্থলতানের সৈন্যরাও বিদেশীদের বশ্যতা স্বীকার না-করে পরে অধঃপাতিত হয়ে একটি দুর্বৃত্ত জাতির সৃষ্টি করে।]

[বি. দ্র.] ভারতের অন্যত্র যাই হোক না কেন, বাংলাদেশে বলপূর্বক কাউকে মুসলিম করা হয় নি। তাহলে জমিনদার-শাসকরা তাতে বাধা দিতেন। সে যুগে ধর্ম ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। সামন্তরা হিন্দু হতে বৌদ্ধ হওয়া যেমন বাধা দেন নি, তেমনি বৌদ্ধ হতে মুসলিম হওয়াতেও তাঁরা বাধা দেন নি। সেকালে জাতির উপর প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু ধর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। হিন্দু-ধর্ম বহু ধর্মের একটি ফেডারেশন মাত্র। জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত ও মুসলিম-ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম। একজন বৌদ্ধ-জাপানী যেমন খাঁটি জাপানী, তেমনি একজন বাঙালী মুসলমানও খাঁটি বাঙালী। তাদের কারো মধ্যেও এতটুকুও বিদেশী রক্ত নেই।

উপরোক্ত তথ্য সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত কয়েকটি শিলালিপির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। বর্ধমানের মানকরের পাঁচ মাইল পূর্বে 'পারস্য দেশাগত' ধর্মপ্রচারক সৈয়দ শাহ মুহম্মদ বাহমীর দরগায় প্রাপ্ত পঞ্চদশ শতকের তোখরা অর্থাৎ তুর্কি লিপিতে

লেখা শিলালেখ দ্রষ্টব্য।

ওই শিলালেখটিতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে রাজা মহেন্দ্রর বংশধর অমরাগড়ের সামন্ত-নৃপতি কর্তৃক উক্ত বিদেশী ধর্মপ্রচারক ধর্মযুদ্ধে নিহত হন। বোঝা যায় যে ধর্মপ্রচারে বলপ্রকাশ করার জন্য সামন্ত-রাজা সেই বিদেশীকে নিহত করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে সামন্ত-রাজারা সেক্ষেত্রে সার্থকভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তকরণে বাধা দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের আধিক্য তাই প্রমাণ করে। প্রমাণিত হয় যে জাতিভেদের জন্য হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে—জাতিভেদহীন বৌদ্ধপ্রধান পূর্ববঙ্গের মতো বেশি সংখ্যায় মুসলিম হয় নি।

কিন্তু ওই হিন্দু সামন্ত-রাজা মুসলিম-ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। নিহত ধর্মপ্রচারকের সমাধিক্ষেত্রে দরগা-নির্মাণের জন্য তিনিই ভূমি দান করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রথমদিকে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বই ছিল, সম্ভবতঃ ধর্মপ্রচারে রাজার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বলপ্রকাশ করা আরম্ভ হলে তাঁকে নিহত করা হয়।

মুসলিমদের বর্তমান জনসংখ্যা দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্য ঘটে। ঐরূপ কেবলমাত্র ধর্মান্তরের জন্য হয় নি। হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথা ও বিধবা-বিবাহ না-থাকায় জনসংখ্যা সীমিত থাকে। এটি পরিবার-পরিকল্পনার সহায়ক। তাই হিন্দু-জনসংখ্যা একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

উপরোক্ত কারণে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীই জমিনদার শাসকদের বশংবদ ছিল। তারা একত্রে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জমিনদার-শাসকদের পক্ষে লড়তে কুণ্ঠিত হয় নি।

প্রাক-ব্রিটিশকালে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, হুগলী ও ট্যাণ্ডনের শহরাঞ্চলে মাত্র ফৌজদারী পুলিশ ছিল। ওই সব শহরের বাইরে তাদের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশ তখন জমিনদারদের বিচার ও পুলিশের অধীন। এই জমিদারী ও ফৌজদারী পুলিশের সংগঠন সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে বলবো।

বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র দুটি পুলিশ আছে। যথা—(১) বাংলা-পুলিশ এবং (২) কলিকাতা-পুলিশ। শুরু হতে এই দুটি পুলিশ পৃথকভাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু এই উভয় পুলিশই পূর্বতন জমিনদারী পুলিশের উত্তরাধিকারী। উভয় পুলিশের সংগঠনের মধ্যে জমিনদারী পুলিশের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ওদের মধ্যে বাংলার ফৌজদারী পুলিশের প্রভাব যৎসামান্য। বাংলার ফৌজদারী পুলিশ ও মোগলদের দিল্লির নগর-পুলিশ কিছুটা একপ্রকার।

বাংলা-পুলিশ ও কলিকাতা-পুলিশ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলার ফৌজদারী পুলিশ ও জমিনদারী পুলিশ সম্বন্ধে বলবো। তাতে উভয় পুলিশের তুলনামূলক

আলোচনার সুবিধা হবে। প্রাক-ব্রিটিশকালে বাংলাদেশে দু-রকম পুলিশ ছিল। যথা—(১) ফৌজদারী পুলিশ ও (২) জমিনদারী পুলিশ। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, কাটনী ও পাটনাতে ফৌজদারী পুলিশ ছিল। কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট অংশে জমিনদার-শাসকদের অধীনে বিকেন্দ্রিত জমিনদারী পুলিশ।

ফৌজদারী পুলিশ

কেবল ঢাকা, পাটনা, হুগলী ও মুর্শিদাবাদে ফৌজদারের অধীনে ফৌজদারী পুলিশ ছিল। সেটি জনৈক কোতোয়ালেব অধীনে ফৌজদার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। তার সদর-দপ্তরকে কোতোয়ালী বলা হতো। কোতোয়ালীর অধীনে তারা স্বল্পভূমির উপযোগী নগর-পুলিশ। এতে খুব বেশি লোকজন যুক্ত থাকে নি। কারণ, শান্তিরক্ষার জন্য ফৌজদারের অধীনে সেনাবাহিনী ছিল। জমিনদাবী পুলিশের মতো ফৌজদারী পুলিশ অত জটিল নয়। ফৌজদারী-পুলিশকে মিলিটারী পুলিশও বলা যেতে পারে। ওই সকল স্থানে ক্ষুদ্র সেনানিবাস ছিল। ফৌজদাররা একাধারে পুলিশের কর্তা, সেনা-নাযক ও বিচারক। এঁদের অধীনে ছোট-ছোট বিচারকার্য কাজীরা করতেন। ফৌজ-দাবদের আবাসে ও কোতোযালীতে কিছু রক্ষী তথা গার্ড থাকতো। নগরের বাইবে [জমিনদাবী এলাকায] এদের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। কোতোয়ালরা পুলিশের তদারকি ও জেলরক্ষীর কাজ একসঙ্গে করতেন। কাজীর ছোট মামলার এবং ফৌজ-দাবেব বড় মামলার বিচারের পর তাঁদের রায় মতো দণ্ড এরাই কার্যকর করতো। রাজধানী মুর্শিদাবাদের কোতোয়ালী-পুলিশ অন্য স্থানের ফৌজী-পুলিশের মতো অত সরলীকৃত ছিল না। মুর্শিদাবাদের মতো অন্য শহরের ফৌজদাররা একধারে সেনা-ধ্যক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-সুপার ও কালেক্টর। তাঁর অধীনে কাজী বিচার করতেন ও কোতোয়াল পুলিশ এবং কারাগার দেখতেন। সেখানে সৈন্য দ্বারা শান্তিরক্ষার কাজ হতো [য়ুরোপীয় শহরগুলির মতো]। মুর্শিদাবাদ শহরেও মূলত সৈন্য দ্বারা শান্তি-বক্ষা হতো। কিন্তু বাজধানী বৃহৎ হওয়াতে সেখানে প্রশাসন জটিল ছিল। মুর্শিদাবাদে একজন অনুরূপ ফৌজদারের অধীনে কোতোয়াল কারাগার এবং পুলিশের কাজ দেখতো। এখানে সেনাপতির কাজের জন্য সেনাপতিরা ছিলেন। সেনাপতিগণ ও নবাব-পরিবারের দাপটে পুলিশ দুর্বল ছিল। জনৈক কোতোয়াল সিরাজের এক প্রণয়িনীকে রাত্রে রাজপথে গ্রেপ্তার করে বিপদে পড়েন। স্বয়ং আলিবর্দী তাঁকে পরি-ত্রাণ করেন। নিম্নোক্ত আখ্যান থেকে মুর্শিদাবাদের শাসন-বাবস্থা বোঝা যায়। "নাজীম প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের বিচার করতেন। দেওয়ানগণ ভূসম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করতেন। দু'জন দারোগার অধীনে দুটি দারোগাই-আদালত ছিল।

এঁরা উক্ত নাজীম ও দেওয়ানের প্রতিনিধি-রূপে তৎ-সম্পর্কিত বিচার করতেন। ফৌজদার [এখানেও] কোতোয়ালী পুলিশের কর্তা ছিলেন। সেই সঙ্গে উনি প্রাণ-দণ্ড-যোগ্য নয় এমন অপরাধের বিচার করতেন। ক্ষমতা-হারা [পূর্বতন কাজী] এখানে উত্তরাধিকারী মামলার বিচার করতেন। মুক্তাসীব আবগারী বিভাগের কর্তা ছিলেন। ইনি মাতলামী [পেটাকেস] ও কৃত্রিম বাটখারা রাখা-অপরাধের বিচার করতেন। কানুনগো ভূমির রেজিস্ট্রার ছিলেন ও তৎ-সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করতেন। মুফতি কাজীর নিকট আইনের ব্যাখ্যা করতেন। ওঁরা একমত না-হলে তবেই মামলা নাজীমের নিকট প্রেরিত হতো। নাজীম তখন অন্য বিচার-সহ এক সভা করতেন।"

[শেষ দিকে এঁরা ঔরঙ্গজেবের সুন্দর নির্দেশগুলি মানতেন না। এক কাজীরা ছাড়া অন্যেরা ক্ষমতালোভী ও অত্যাচারী হয়। সকলেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত। তাতে আদালতের সংখ্যা বেড়ে যায়। দুঃসাহসিক সমর-প্রিয় লোকেরা সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আত্মসাৎ করে। ক্ষুদ্র ভূস্বামীরাও জমিনদার না-হয়েও নিজেদের আদালত স্থাপন করে।]

কাজীর বিচার সেকালে যথেষ্ট উন্নত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। তাঁরা সাধ্যমতো নিজ-নিজ বুদ্ধিতে সুবিচারই করতেন। আইনের নিগড়ে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি বলে বিচারের কাজে তাঁরা অসহায় ছিলেন না। তাঁদের জনপ্রিয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ সেকালে বহু গণ-গল্প মুখে-মুখে রচিত হয়ে প্রচারিত হয়। সংখ্যাহীন গণ-গল্পের মাত্র দুটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"এক জাহাজী যুবক বাইরে থাকাকালে এক পড়শি রাত্রে তার বিবির কাছে আসতো। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে সেই যুবকটি যে কে—তা হতভাগ্য স্বামী ধরতে পারে না। মনোদুঃখে সে কাজীর কাছে এলো। সব শুনে কাজী বললে, 'নিয়ে এস তোমার বিবিকে এখানে।' বিবিজানকে কাজীর সুমুখে আনা হলে তার দিকে তাকিয়ে কাজী সহানুভূতির স্বরে বললে, 'না না! তুমি এ কাজ করতে পারো না। আমি ছত্রিশ বছর হাকিমি করছি। আমরা লোক ঠিক চিনতে পারি।'—মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য কাজী হতভাগ্য স্বামীকে কয়েদ করে কয়েদখানাতে পাঠালো। তারপর আতরের একটি শিশি বার করে কাজী-সাহেব সেই মহিলার হাতে অর্পণ করে বললে, 'আমি জনসমক্ষে তোমাকে এনে অশালীন কাজ করেছি। তাই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই মূল্যবান বাদশাই আতর তোমাকে উপহার দিলাম। এই আতর ভ্রূযুগলে মাখতে হয়। তুমি নিজে ছাড়া কেউ এই আতর যেন ব্যবহার না করে।' পরদিন কাজীর হুকুমে পল্লীর সব ক'জন যুবককে পাকড়াও করে আনা হলো। কাজী একে একে

সকলের সামনে গিয়ে একজনের ভ্রূতে খোশবাই-এর গন্ধ পেলেন। এই যুবক মহিলার স্বামীর অবর্তমানে ঐ রাত্রের সুযোগ নেবেই। আর মহিলা সর্বপ্রথম তার উপপতির ভ্রূতে আতর মাখাবে। কাজী-সাহেব নির্ভুলরূপে এটা অনুমান করেছিল। কাজী তৎক্ষণাৎ ফরিয়াদীকে কয়েদখানা হতে বার করে আনলেন এবং তার স্ত্রী ও উপ-পতিকে কয়েদখানায় পুরে দিলেন।"

"চুরি সন্দেহে চারজনকে কাজীর কাছে আনা হলো। কিন্তু ওদের মধ্যে কে যে চোর তা জানা দুষ্কর হয়ে পড়ে। চারজনই কুসংস্কারে বিশ্বাসী মূর্খ লোক ছিল। কাজী-সাহেব তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার মতো ব্যবস্থা নিলেন। তিনি প্রত্যেকের হাতে একটি করে একফুট দৈর্ঘ্যের কাঠি দিয়ে বললেন, 'এই কাঠি নিয়ে বাড়ি চলে যাও। যে চোর তার কাঠি রাত্রে একইঞ্চি বেড়ে যাবে।' পরদিন দেখা গেল যে ওদের এক-জনের কাঠি একইঞ্চি দৈর্ঘ্যে কম। কাজী-সাহেব অন্যদের মুক্তি দিয়ে সেই ব্যক্তিকে হাজতে পুরে দিলেন। ভয়ে লোকটা পাছে তার কাঠি একইঞ্চি বাড়ে তাই রাত্রে শোবার আগে একইঞ্চি কেটে বাদ দিযেছিল।

কাজী-বিচারকরা নিজেরাই তদন্ত, বিচার এবং শাস্তিপ্রদানের কাজ করতেন। স্বল্প সময়ে বিনাব্যয়ে তাঁদের বিচাবকার্য হতো। তাঁরা সরেজমিন তদন্ত করতেন। জমিনদারী এলাকার মতো ফৌজদারী এলাকায় তদন্তকারী পুলিশ ছিল না। তাঁদের ভুলগুলিও শোধরাতে তাঁরা বারে বারে রায় বদলাতেন। এজন্য পঞ্চায়েত এবং ব্রাহ্মণ-বিচারক অপেক্ষা এঁদের বিচার লোকে পছন্দ করতো। ব্রাহ্মণ-বিচারকরা লিপিবদ্ধ আইনের বাইরে যেতে চাইতেন না।

এক ফরিয়াদীকে বিচারক কাজী বললেন, 'তোমার কোনও সাক্ষী নেই। বিনা সাক্ষীতে তোমার অভিযোগ কি করে বিশ্বাস করবো?' অসহায় ফরিয়াদী কাজীর কানে কানে কিছু বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অনুমতি পাওয়ার পর তাঁর কানের কাছে মুখ এনে সেই ব্যক্তি অন্যের অগোচরে তাঁকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করলো। কাজীসাহেব তখন ক্ষেপে উঠে বললো, 'এই কোহি হ্যায়? ইস্‌কো কোতল।' ফরিয়াদী তা শুনে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর! তা কি করে হয়? আপনার সাক্ষী কই? কাজী-সাহেব নিজের ভুল বুঝে মামলা ছানি করেছিল।

[এ যুগেও করোবোরেটিভ্ অর্থাৎ সমর্থক এভিডেন্স তথা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হেডমাস্টার প্রভৃতির একক সাক্ষ্য বিশ্বাস্য। এক্ষেত্রে পরিবেশ-সম্ভূত সাক্ষ্য তথা সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স প্রমাণরূপে বিবেচিত।]

ফৌজদারী শহরগুলির বিচার ও পুলিশের তুলনায় জমিনদার-শাসকদের এলাকায় পুলিশ ও বিচার আধুনিক কালের মতো উন্নত ছিল। এই জমিনদারী পুলিশের রীতি-

নীতি অদল-বদল করে ব্রিটিশরা পুলিশ তৈরি করে। এইরূপ রীতিনীতি প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও পরে ওদের মাধ্যমে সমগ্র য়ুরোপে প্রচলিত হয়। কালের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়-পুলিশের তুলনামূলক বিচার দ্বারা তা প্রমাণ করা সম্ভব।
বাংলার জমিনদারী প্রশাসন প্রাচীন সামন্ত-রাজাদের বিচার ও পুলিশের উত্তরাধিকারী। তার সংগঠন থেকেই পূর্বতন সামন্ত-রাজাদের পুলিশী-সংগঠন ও বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

জমিনদারী পুলিশ

জমিনদার শাসকদের সেনাবাহিনী তথা ফৌজ এবং পুলিশ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এইটি তাঁদের বিশেষত্ব বলা যেতে পারে। তাঁদের অধীন দারোগারা [থানা-দারোগার উর্ধ্বতন] একাধারে হাকিম ও পুলিশ-সুপার ছিলেন। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য তাঁদের ব্রাহ্মণ-বিচারালয় ছিল। গ্রাম-পঞ্চায়েত, ব্রাহ্মণদের আদালত, মহকুমার দারোগাদের আদালত এবং জমিদারের 'দেওয়ানদের প্রত্যক্ষাধীন আদালত' সেইকালে যথাক্রমে গ্রামভিত্তিক, থানাভিত্তিক, মহাকুমা-ভিত্তিক [সমাজ] ও রাজ্য [জমিনদারী] ভিত্তিক আদালত ছিল।
জমিনদারী পুলিশ ত্রিস্তরীয় [Three Tyred] ছিল। যথা—(১) গ্রামীণ পুলিশ (২) থানাদারী পুলিশ এবং (৩) কেন্দ্রীয় পুলিশ।—কেন্দ্রীয় পুলিশকে জমিনদারী পুলিশও বলা হতো। তারা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ, স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংভর ছিল। রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে বাংলার এই জাতীয় পুলিশ জনগণকে রক্ষা করেছে।

(১) গ্রামীণ পুলিশ

প্রতিটি গ্রাম কয়েকটি চৌকিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক চৌকি একজন করে চৌকি-দারের অধীন। চৌকিদাররা নিজ-নিজ চৌকির এলাকায় রাত্রে হাঁক-ডাক করে পাহারা দিতো। (f) দিনে তাদের কাজ ছিল গ্রামবাসীদের শস্য রক্ষা করা। অবাঞ্ছিত পশুবধ ও পশুধরার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের অন্যতম কাজ। তারা প্রত্যেক গ্রাম-বাসীর স্বভাব-চরিত্র ও মেজাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকতো বলে তাদের কাজ সহজ হতো।
ছিল গ্রামবাসীদের শস্য রক্ষা করা। অবাঞ্ছিত পশুবধ ও পশুধরার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের অন্যতম কাজ। তারা প্রত্যেক গ্রামবাসীর স্বভাব-চরিত্র ও মেজাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকতো বলে তাদের কাজ সহজ হতো।

(f) এদের হাতে চোর-বাতি ও বর্শাদি থাকতো।

গ্রাম-সমষ্টির জন্য একজন দফাদার থাকতেন। স্থানবিশেষে এঁরা অন্য নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দফায়-দফায় গ্রামগুলি অশ্বারোহণে কিংবা পদব্রজে রাত্রে ও দিনে পরিদর্শন করে চৌকিদারদের কাজের তদারকী তথা খবরদারী করতেন। গ্রামবাসীদের সুবিধা-অসুবিধা ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে এঁরা খবর নিতেন। চৌকিদারদের কাজের গাফিলতি তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানাতেন। সে বিষয়ে তিনি নিজেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতেও চৌকিদারদের গাফিলতি দফাদারদের গোচরে আনতেন।

কয়টি গ্রাম সমষ্টির সংযোগ স্থলে একজন ঘাটিয়ালের অধীনে একটি করে পুলিশ ঘাঁটি থাকতো। এঁদের অধীনে কিছু-সংখ্যক গার্ড [রক্ষী], পেয়াদা ও হরকবাগণ থেকেছে। ডাকাত-দলকে গ্রাম-সমষ্টিগুলির প্রবেশ মুখে এরা আটকাতো। প্রয়োজনে হরকরারা দ্রুত থানাদারদের খবর দিয়েছে। এরা স্ব স্ব জমিদারী এলাকার অন্তঃপ্রদেশীয় দীর্ঘ রাজকীয় পথগুলিও [High Way] রক্ষা করেছে।

গ্রামীণ পুলিশ গ্রাম-পঞ্চায়েৎ বা গ্রাম-প্রধান কিংবা পঞ্চায়েতগোষ্ঠীর সুপারিশে ও অভিযোগে জমিনদার শাসকদের দেওয়ানগণ কর্তৃক যথাক্রমে নিযুক্ত বা বরখাস্ত হতো। তৎকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। বেতন-প্রেরণের অসুবিধা ছিল। এজন্য এদের ভরণপোষণের জন্য কিছু জমিজমা প্রদত্ত হতো। কিছু ক্ষেত্রে এই পদগুলি বংশানুক্রমও হয়েছে।

[পুলিশের জন্য নির্ধারিত জমিজমার স্বত্বগুলিকে যথাক্রমে চৌকিদারী চাকরাণা, চাকরাণী রঙ্গস্তী, ঘাটিয়ালী স্বত্ব বলা হতো। জমিনদারী পুলিশ ভেঙে দেওয়ার পর ঐগুলি ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত করে। জমিদারী সেবেস্তার স্বত্বভোগী পরচা পরীক্ষা করে তৎকালীন কর্মকৃত্যের পদগুলি জ্ঞাত হওয়া যায়।]

প্রতিটি গ্রামে কিছু যুবককে পৃথকীকৃত করে রাখা হতো। প্রয়োজনে গ্রামীণ পুলিশকে এরা সাহায্য করতে বাধ্য। এ জন্য এদের বাৎসরিক খাজনা কম নেওয়া হতো। বিশেষ বীরত্ব প্রকাশে এদের খাজনা এক বা দুই বৎসর মাফ করা হতো।

[প্রাচীন ভারতের স্বেচ্ছাসেবী রক্ষাবাহিনী এবং বর্তমান স্পেশ্যাল-কনস্টেবলদের সহিত এদের তুলনা করা যায়।]

(২) থানাদারী পুলিশ

কয়টি গ্রাম-সমষ্টির জন্য থানাদারদের অধীনে একটি করে থানা ছিল। থানাতে বহু পাইক [বর্তমান কনস্টেবল], নায়ক [বর্তমান হেডকনস্টেবল], নায়েব [বর্তমান তদন্তকারী], থাকতো। থানাদারী স্বত্বভুক্ত জমিজমার আয় থেকে তাদের ভরণ-

পোষণ হতো। জমিদারবাটী থেকে প্রয়োজন মতো তাদের নগদ অর্থও পাঠানো হতো। শস্ত্র হিসাবে তাদের কাছে লাঠি, তরবারি, বর্শা ও গাদা-বন্দুক থাকতো। তারা এক ধরনের পুলিশী উর্দি ও চিহ্ন ব্যবহার করতো।

থানার এলাকা বৃহৎ হলে তার অধীনে কয়েকটি ফাঁড়ি থাকতো। ফাঁড়িগুলিতে নায়ক-দের অধীনে চৌকিদারগণ ও কিছু পাইক থাকতো।

থানাদারী-পুলিশ গ্রামীণ-পুলিশের সাহায্যকারী পুলিশ। গ্রামীণ-পুলিশের স্বাধীনতায় তারা কখনও হস্তক্ষেপ করতো না। তবে, অপরাধ-নির্ণয় ও অপরাধ-নিরোধ [পেশা-দার অপরাধীর ক্ষেত্রে] তারাই করতো। তাদের অধীনে হাজত তথা আটক-ঘর ছিল। মধ্যে মধ্যে টহলদারী পাইকদল গ্রামে-গ্রামে টহল দিতো। থানার এলাকাগুলি [বর্তমানের তুলনায়] বহু গুণে ছোট ছিল।

[মুর্শিদাবাদ দারোগাই-আদালতের সঙ্গে জমিনদারী দারোগাই-আদালতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টি হতে কোন্‌টি উৎপত্তি তা বলা শক্ত। তবে, জমিনদারদের দারোগার নবাবের দারোগা অপেক্ষা ক্ষমতা বেশি ছিল। জমিনদার-ভবন হতে দারোগাদের কাছারির দূরত্বই তার কারণ।]

[বি.দ্র.] পরগণা চাকলার মতো 'সমাজ' একটি সামাজিক বিভাগ। খড়দহ, হালি-শহর, নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি অধুনা-দৃষ্ট সমাজ বিভাগ। শ্রাদ্ধাদিতে আজও দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও ধনীরা যথাক্রমে পাড়া, গ্রাম ও সমাজ নিমন্ত্রণ করে। সমাজগুলির এলা-কাই দারোগার এলাকা। এক মহাপণ্ডিত স্বতস্ফূর্তভাবে সমাজপতি নির্বাচিত হতেন। গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলির উপর এঁদের যথেষ্ট প্রভাব। এঁরা নিজ-এলাকার দারোগাদের পরামর্শ দিতেন। প্রত্যেক সমাজের সমাজপতিরা বছরে একবার বা দু'বার জমিনদার-ভবনে সমবেত হতেন। এঁরা পুরাতন আইনের পরিবর্তনে ও নতুন আইন-প্রণয়নে দেওয়ানদের সাহায্য করতেন [জমিনদার কাউনসিল]। জমিনদার-শাসকরা ও জন-সাধারণ এঁদের শ্রদ্ধা করতেন। ঋষি বঙ্কিমের মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ রঘুদেব কিছুকাল হালিশহর সমাজের সমাজপতি ছিলেন। অবশ্য সব জমিনদারের এ রকম ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল না।

(৩) কেন্দ্রীয় পুলিশ

এই কেন্দ্রীয় পুলিশকে জমিনদার শাসকদের গ্রামীণ রাজধানীতে মোতায়েন রাখা হতো। তাকে জমিনদারী পুলিশও বলা হতো। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হতে এরা জনগণকে রক্ষা করেছে। গ্রামীণ পুলিশকে থানাদারী পুলিশ সাহায্যের ব্যাপারে ব্যর্থ হলে এদের ব্যবহার করা হতো। আহ্বান আসামাত্র দ্রুতগামী বত্রিশদাঁড়ি ছিপ

নৌকা, রণ-পা, হাতি ও ঘোড়ায় এদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হতো। এরা সকলে বেতনভোগী পুলিশ-কর্মী। সর্বক্ষণের জন্য এদের প্রস্তুত রাখা হতো।

জমিনদারী তথা কেন্দ্রীয়-পুলিশ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) পাইকদল তথা সাধারণ পুলিশ, (২) বরকন্দাজ তথা সশস্ত্র পুলিশ। প্রথমোক্তগণ লাঠি তরবারি ও বর্শা ব্যবহার করতেন। কিন্তু দ্বিতীয়োক্তরা সকলেই বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বন্দুক বহন করতেন। এই উভয় বাহিনী যথাক্রমে নায়ক, জমাদার, নায়েব ও দারোগাদের অধীন! একজন দারোগা পাইকদের এবং অন্য-এক দারোগা বরকন্দাজদের অধিকর্তা ছিলেন।

উপরেব বাহিনীগুলি ছাড়া একজন-নৌ-দারোগা এবং কয়জন নৌ-সরকারের অধীনে নদী-রক্ষার জন্য তাঁদের [কারো কারো] নৌ-পুলিশও ছিল। এই দলে বহু মাঝি-মাল্লা, দাঁড়ি ও জলরক্ষী বহাল ছিল।

জমিনদার-শাসকদের গ্রামীণ রাজধানীর চতুর্দিকে চক্রাকারে চৌকিদার-সহ কিছু চৌকি ছিল। ধনাগার, কারাগার , তোপখানা, অস্ত্রাগার প্রভৃতি রক্ষার জন্য তার প্রয়োজন হতো। অবশ্য জমিদার-ভবন রক্ষার জন্য তদতিরিক্ত পৃথক রক্ষীদল ছিল।

[জমিনদারদের কামান-বন্দুক সহ সুশিক্ষিত যুদ্ধবিদ ফৌজও ছিল। প্রয়োজনে যুদ্ধে নবাবকে তারা দক্ষ সেনাপতির অধীনে সুগঠিত সেনা-দ্বারা সাহায্য করেছে।]

উপরোক্ত ত্রিস্তরীয় পুলিশ জমিনদার-শাসকদের জনৈক অভিজ্ঞ দেওয়ান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। জমিদারী বড়ো হলে দেওয়ানের অধীনে দু'জন নায়েব-দেওয়ান থাকতো। এই নায়েব-দেওয়ানরা তাদের সাহায্য করতো। বলাবাহুল্য প্রত্যেক জমিনদারের শাসন ও পুলিশ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। এঁদের কারও পুলিশের মধ্যবর্তী দুই-একটি পদ ছিল না। জমিনদারী-পুলিশের এই উচ্চ সংগঠন পরবর্তীকালে সর্বত্র ঠিক থাকে নি। জমিদাররা উচ্ছৃঙ্খল হলে দেওয়ানরা রানী-মা, বৌ-রানী, স্থানীয় মোড়ল ও প্রয়োজনে সমাজপতির [গুরু প্রভৃতি] সাহায্যে ওদের সংযত করেছেন। প্রাচীন জমিনদার-শাসকরা জনমতকে সর্বদাই সমীহ করতেন।

জমিনদারী পুলিশ মিটমাট পন্থী ও সংশোধনমূলক ছিল। অপরাধের জন্য মেয়াদ ও প্রাণদণ্ড কম ক্ষেত্রে হতো। এই ব্যাপারটি একাধারে জনগণ ও শাসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর সংগঠন ব্যয়বহুল নয়। সেকালে পুলিশকে 'সুধারা'-ও বলা হতো। নবাবের সুধারা-আদালত [Police Court] ছিল। [সুধারা অর্থে শুধরানো বোঝায়।] তাই জমিনদারী পুলিশে নিম্নোক্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো।

বিভিন্ন গ্রামেতে এক-রকম পরিপূরক অনিয়মিত [Auxillary] লোকবল থাকতো। এদের কিছু-কিছু নিষ্কর জমিও দেওয়া হতো। এরা রণ-পা-দৌড় অনিয়মিত পাইক।

ছ'খণ্ড বাঁশের মধ্যস্থলে গাঁটের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে এরা পথহীন খাল ও মাঠ ডিঙিয়ে দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাত।

দীঘি বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করলেও জমিদাররা আত্মরক্ষার জন্যে রাজপথ প্রস্তুত করেন নি। বরফের উপর ফিন দেশীয় প্রত্যেকেই 'স্কি' ব্যবহারে দক্ষ। তেমনি বাঙালীরা রণ-পা ব্যবহারে রপ্ত ছিল। রণ-পা দৌড়বীরের একটি প্রতিকৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হলো। যুদ্ধের সময় এরা শত্রুর পশ্চাতে গেরিলার কাজ করতো। গুর্খাদের কুকরির মতো বাঙালীদের রামদা ছিল তাদের একটি জাতীয় অস্ত্র।
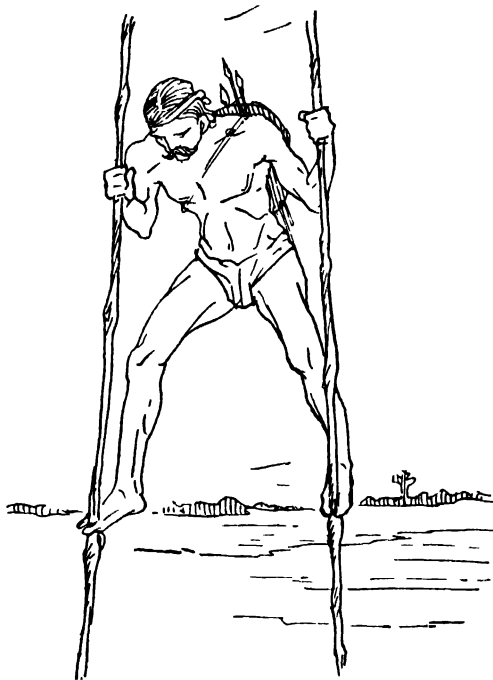
কোনও কোনও স্থানে তদারকী কাজের জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা ছিল। কারও সম্পত্তি অপহৃত হলে জমিস্বত্বভোগী-পুলিশ তা উদ্ধার করতে বাধ্য। সেকাজে অসমর্থ হলে ওই সম্পত্তির আয় থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতো। অপহৃত দ্রব্যের কিছু অংশ উদ্ধার করা হলে বাকী অংশের জন্য তারা ক্ষতিপূরণ করতো। ফলে, বাধ্য হয়েই তাদের দিনরাত পরিশ্রম করতে ও পাহারা দিতে হতো।

[এযুগে হাকিমরা যে কোনও ভুল বা অন্যায় করুন তাতে তাঁদের কোনও শাস্তি পেতে হয় না। ব্রিটিশ আইনে তাঁদের অদ্ভুত রক্ষা কবচ আছে। আপীলে তাঁদের কোনও শাস্তি নেই। সেক্ষেত্রে তাঁদের রায় উলটায় কিংবা কিছু বিরূপ সমালোচনা

হয়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম যুগে এবং সেদিনও নেপালে তাঁদের ভুল ও অন্যায়ের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে।]

উপরোক্ত সাধারণ-পুলিশ ব্যতীত একপ্রকার বংশগত জাতগোয়েন্দা ছিল। চৌকি-দারী-চাকরাণী হতে সাধারণ-পুলিশ এবং রঙ্গস্তা-চাকরাণী [জমির স্বত্ব] হতে গোয়েন্দা-পুলিশদের ভরণপোষণ হতো।

এই বংশগত হিন্দু খোঁজী-শ্রেণী [গোয়েন্দা] একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। এরা মৌর্য-যুগের রাজাদের গুপ্তচরদের বংশধর বলে দাবি করে। উভয়ের কর্মধারার মধ্যেও কিছুটা মিল আছে। এই খোঁজী-সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে সমগ্র ভারতে দেখা যায়। এরা ভ্রাম্য-মাণ এবং স্থিতিবান দলে বিভক্ত। হিন্দু-রাজারা, শ্রেষ্ঠীগণ, নবাব ফৌজদার ও ধনী-গৃহস্থরা এবং প্রথমদিকে ইংরাজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা অপরাধ-নির্ণয়ে এদের সাহায্য নিতেন। গুরুগাঁও ও নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেটরা এদের সাহায্যে কিছু দুরূহ মামলার কিনারা করেছিলেন।[১] ['লাইফ অফ জন লরেন্স', দ্র.]

বর্তমান বিশ্বে গৃহীত পদচিহ্ন-বিদ্যা ও চিহ্নানুসরণ [Tracking] এই খোঁজী-সম্প্র-দায়ের মৌলিক আবিষ্কার। বর্তমান টিপ-চিহ্নবিদ্যার মূল সূত্রগুলিও এরা জানতো। এদের ব্যবহৃত অঙ্গুটি, পেব, তল, সাকো, দুসরি প্রভৃতি পরিভাষা ইংরাজী কৃত হয়ে ইংরাজীতে গৃহীত হয়েছে।

[এদের কাজ বর্তমান ফেডারেল-পুলিশের অনুরূপ ছিল। প্রত্যেক জমিদারী এলাকায় এরা বাস করতো। আত্মীয়তা ও জাত-ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় এরা পরস্পরকে সাহায্য করেছে। তাই এক জমিদারের এলাকায় অপকর্ম করে অন্য জমিদারের এলাকায় পালিয়ে গিয়েও অপরাধীরা রেহাই পায় নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন জমিদারের পুলিশ তাদের সহায়ক। এই খোঁজী-গোয়েন্দার দল [স্ত্রী ও পুরুষ] দ্রব্য-বিক্রেতা, গণৎকার, সন্ন্যাসী, মজদুর প্রভৃতির ছদ্মবেশে সর্বত্র ঘোরাঘুরি করতো। মৌর্যদের গুপ্তচরদের মতো এ দলের নারীরা অন্তঃপুর থেকেও সংগ্রহ করেছে। পুরুষরা এই উদ্দেশ্যে অপ-রাধীদের সঙ্গে মেলামেশায় সুদক্ষ ছিল। এদেরই নির্দেশ মতো সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের গৃহ-তল্লাস করা হতো।]

পথ জলসিক্ত করে এই খোঁজীদল দূরে অপেক্ষা করতো। কারুর পদচিহ্নের সঙ্গে ঘটনা স্থলে পাওয়া পদচিহ্নের মিল হলে তারা তাকে গ্রেপ্তার করে জমিনদারী থানাতে পাঠাতো। বাকী তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ থানাদাররা করতো। সম্ভবত এরা মৌর্যরাজা-দের ভ্রাম্যমাণ গুপ্তচরদের অধঃপতিত বংশধর।

১. ১২ এপ্রিল ১৮০৯ খ্রী. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত পত্রে মিঃ ডাইডাসওয়েল এই খোঁজী গোয়েন্দাদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জমিদারগণ রাষ্ট্র-বিপ্লব-নিরপেক্ষ অর্ধ-স্বাধীন গ্রামীণ প্রশাসক। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় এঁরা কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেন নি। সে-রকম প্রচেষ্টায় তাদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য ছিল। এজন্য নবাবরাও এঁদের ঘাঁটাতেন না। কিন্তু যথাযথ খাজনা এঁরা নিয়মিত পাঠাতেন।

পরবর্তীকালে এদের কেউ-কেউ নিজস্ব লোকবল কিংবা ডাকাতদের সাহায্যে ব্রিটিশ-দের খাজনার গাড়ি ও নৌকা লুঠ করতো। আদর্শবান ডাকাতরা শেষদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। বিদেশী শাসকদের বিরোধিতা করা এদের চিরন্তন অভ্যাস [হেসটিংস-এর প্রতিবেদন দ্র.]

জমিনদারী [ভুঁইয়া] প্রশাসন সম্বন্ধে নিম্নের তালিকাটি প্রণিধানযোগ্য। এ থেকে তাদের শাসন-ব্যবস্থার একটি নমুনা পাওয়া যাবে।

জমিদার

নায়েব-দেওয়ান	দেওয়ান	নায়েব-দেওযান
কর আদায়	বিচার	কৃষি এবং
ভূমি-বণ্টন	পুলিশ	পথঘাট
দান ও শিল্প	কেন্দ্রীয়	বাঁধ নদী
মন্দির-মঠ	সম্পক	জলাশয়
অতিথি-সেবা	ও ফৌজ	বন রসদ
ইত্যাদি	ইত্যাদি	নৌ-পুলিশ

জমিনদারী পুলিশের শক্তি ও সংগঠন সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে বহু ইংরাজ-প্রধান লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের নিকট প্রতিবেদন পাঠাতেন। তাঁদের মতে জমিনদারী পুলিশ বাঙালী-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং জনগণের সন্তানতুল্য। এই সব প্রতিবেদনের কয়েকটি উল্লেখ্য অংশ উদ্ধৃত করা হলো। সেগুলির মূল ইংরাজী-বয়ান তিন নং এপেণ্ডিকস-এ দেখুন।

'ব্রিটিশদের আগমনের প্রাক্কালে প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে পুলিশ-বাহিনী ও প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে জমিনদার-শাসকদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। স্ব-স্ব এলাকায় বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বময় কর্তা।'

'জমিনদার-শাসকগণ তাঁদের এলাকায় প্রধান শাসকরূপে অধিষ্ঠিত। শান্তিরক্ষা, অপ-রাধ-নির্ণয় ও তার নিরোধের জন্য তাঁরাই দায়ী। দস্যুতা, ডাকাতি, ছিঁচকেমি ও শান্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তাঁরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।'

'অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার-ব্যাপারে ব্যর্থ হলে তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ করতেন। এজন্য তাঁরা একটি বিরাট ও শক্তিশালী পুলিশ-বাহিনী পোষণ করতে বাধ্য হন।'

'বর্ধমানের মহারাজার পুলিশ-বাহিনী বিরাট। তাঁর এলাকাটি বহু পুলিশ-থানায় বিভক্ত। থানাদারদের অধীনে শান্তিরক্ষার জন্য দু-হাজার চার'শর বেশি সশস্ত্র পাইক মোতায়েন থাকে। তারা গ্রামবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত টহল দেয়। প্রয়োজনে জমিনদার ভবনে সংবাদ পাঠাবার জন্যে পৃথক পিওন-দল প্রস্তুত থাকে।'

'উপরোক্ত থানাদারী পুলিশ ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজনে থানাদারদের সাহায্যেব জন্যে রাজধানীতে সব সময় তৈরি রয়েছে। বর্ধমান মহারাজার এই কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে উনত্রিশ হাজাবেব বেশি সশস্ত্র পাইক ও বরকন্দাজ আছে। আহ্বান আসামাত্র তাদের দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো হয।'

[বর্ধমান মহারাজার পুলিশ-বাহিনী ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র ও বহু কামান-সজ্জিত সুশিক্ষিত যুদ্ধবিদ্ বিরাট ফৌজ অর্থাৎ সেনাবাহিনী দক্ষ-নায়কদের অধীনে বহুস্থানে মোতায়েন ছিল।]

কলকাতা পত্তনেব পর বাংলার জমিনদারী পুলিশের অনুকরণে 'কলকাতা-পুলিশ' নামে একটি পৃথক পুলিশ সৃষ্টি হয।

এই কলকাতা-পুলিশের ইতিহাসেব সঙ্গে ব্রিটিশ-ইতিহাসেব সম্বন্ধ আছে। কারণ, কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কোনো ভূখণ্ডই সৈন্যদ্বারা রক্ষা কবা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে দক্ষ পুলিশ দ্বারা বিজিত দেশের সুরক্ষণও প্রয়োজন। বোম-সম্রাট ও আলেকজাণ্ডাবেব সুগঠিত পুলিশ ছিল না। এজন্য রোম গ্রীক-সাম্রাজ্য স্থাযী হয় নি। মিশর, মোগল, মৌর্য ও ব্রিটিশদের সুগঠিত পুলিশ ছিল বলে তাদের সাম্রাজ্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পর্তুগীজদের মতো ভারতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১৫৯৯ খ্রী. লণ্ডনে লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে বাণিজ্য-সমিতি গঠিত হয়। তারা মাদ্রাজে ও বোম্বাই-এ প্রথম কুঠি-স্থাপন করে। এ দুটি শহরকে প্রেসিডেন্সি বলা হলেও তখনও পর্যন্ত বাণিজ্য-সংস্থামাত্র। ১৬১৫ খ্রী. মোগল-সম্রাট ইংরাজদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদসমূহের নিষ্পত্তির অধিকার ইংরাজ-বণিকদের হাতে দেওয়ার পর সেই থেকে বহুকাল তারা এই অধিকার এদেশে ভোগ করেছে। পরে তাঁদের রাজত্ব কায়েম হলেও তার মূল নীতি দীর্ঘকাল পরিবর্তিত হয় নি। ইচ্ছা করলে তাঁরা দেশী-হাকিমের বদলে ইংরাজ-হাকিমের বিচার চাইতে পারতেন।

১৬৯০ খ্রী. ২৪শে আগস্ট তারিখে হুগলী থেকে বিতাড়িত হয়ে জব চার্ণক সাহেব ভাগীরথী-তীরে সুতানুটি-গ্রামে ইংলণ্ডের পতাকা প্রোথিত করে কলকাতা মহানগরের

ভিত্তি স্থাপন করলেন। দু-বছর পরে তাঁর মৃত্যু হলে ওলড্‌সবরো নামে এক ইংরাজ কলকাতা-কুঠির এজেন্ট হলেন। ১৬৯৬ খ্রী. বর্ধমানরাজ শোভাসিং বিদ্রোহী হলে কলকাতা বিপন্ন হয়। তখন মোগল-সরকার কুঠি-রক্ষার জন্যে কিছু অর্থের বিনিময়ে ইংরাজদের দুর্গ-নির্মাণের অধিকার দিলেন।

[মারাঠা, জাঠ ও শিখ প্রভৃতির আক্রমণে বিপর্যস্ত মোগল-সরকারের তখন অর্থের প্রয়োজন। বেনিয়া-ইংরাজরা মোগল-সরকারকেও বেনিয়া করে তুললো। শুধু নাম, মান ও আইনী অধিকার ছাড়া মোগলদের তখন পূর্বের মতো সেই ক্ষমতা নেই। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজরা অর্থ-উৎকোচ দিয়ে ভারতে সাম্রাজ্যের সূচনা করে। বাকীটুকু তারা স্থানীয় নৃপতিদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগে ছল ও চাতুরী দ্বারা সমাধা করে। অবশ্য দেশীয় সৈন্য ও আঞ্চলিক প্রধানদের পক্ষে তাদের সাহায্যও ছিল প্রচুর। দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে এজন্যে কৌশলে তাঁরা লড়াইও বাধিয়ে দিতেন।]

[বি. দ্র.] উল্লেখ্য এই যে সমগ্র ভারত কখনও পরাধীনতা স্বীকার করে নি। একদা ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে এক'শ বছর এবং চীন ও জাপানের মধ্যে পঞ্চাশ বছর লড়াই চলেছিল। সেইভাবে ভারতীয়রা সাত'শ বছর লড়াই চালায়। ভারতের বহু স্থানে বারে বারে বিদ্রোহ হয়েছে এবং ভূখণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফলে কোনও বাদশা নবাব শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারেন নি। অবিরত তাঁদের যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। শেষে বাংলা, অযোধ্যা, দিল্লি ও হায়দ্রাবাদ ছাড়া সমগ্র ভারত স্বাধীন হয়ে পড়ে। বাংলা, অযোধ্যা, নিজাম এবং টিপুও নিয়মিত রাজস্বের এক চতুর্থাংশ মারাঠা-দের দিতো। দিল্লির বাদশা প্রকারান্তরে মারাঠাদেরই রক্ষণাধীন। সুতরাং ওইগুলি-কেও স্বাধীন রাষ্ট্র বলা যায় না। ব্রিটিশ আমলে ইংরাজ প্রফেসররা পরীক্ষাতে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন প্রমাণ করো যে ইংরাজরা ভারতবর্ষ মুসলিমদের নিকট হতে না নিয়ে *হিন্দুদের নিকট হতে নিয়েছিলেন।*

[বলা বাহুল্য এই রকম কাজ হিন্দু ও মুসলিম ভূস্বামীরা বারে বারে করেছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর পিতাও একজন শক্তিশালী ভূস্বামী। সম্রাট শেরশাও প্রথম জীবনে বিহারের একজন ভূঁইয়া ছিলেন। রাজা গণেশ ও প্রতাপাদিত্যও বাংলার ভূঁইয়া রাজা ছিলেন।

সেকালে চীনা মুসলিম ও বৌদ্ধদের মতো দেশীয় মুসলিমরা দেশীয় হিন্দুদের সঙ্গে রক্তজ সম্পর্ক স্বীকার করে একাত্ম ভাবতো। দেশীয় মুসলিমরা বিদেশী মুসলিমদের বিদেশীই ভেবেছে। ধর্মে বিভিন্ন হলেও হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ [শিখ] নিজেদের একই জাতি মনে করতো। দেশীয় মুসলিমরা বিদেশী মুসলিমদের সাহায্য করলে ফল অন্য রকম হতো। দেশীয় হিন্দু ও মুসলিম ভূস্বামীদের উভয় ধর্মেরই সৈন্য ছিল। কয়েক

পুরুষ বাদে বিদেশী মুসলিমগণ দেশীয় হলে হিন্দু-মুসলিম সমভাবে তাকে নিজেদের মনে করেছে। ভারতীয়দের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ তার কারণ। অবশ্য এরকম ঘটনা বেশি ক্ষেত্রে ঘটে নি। কিন্তু বাইরে থেকে মারসিনারি অর্থাৎ ভাড়াটিয়া সৈন্যরা এলে উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে তা অপছন্দ করে। মারসিনারিরা ভাড়াটে গুণ্ডাদের মতো। তারা হায়েস্ট বিডারদের পক্ষ নেয়। ভারতকে স্বদেশ ভাবা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। পলাশীর যুদ্ধে বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাবের পরাজয়ের এটি অন্যতম কারণ।

প্রদেশগুলির মুসলিম গভর্নরগণ কর বন্ধ করে বাদশাদের রাজকোষ শূন্য করে তাদের দুর্বল করে। বরং হিন্দু রাজপুত ও অন্যেরা শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ছিল। বারংবার প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র পরবর্তী মোগলদের সর্বনাশের কারণ হয়। বাইরে থেকে মারসিনারি সৈন্য ও সেনাপতিনিয়োগও তার অন্যতম কারণ। এই বিদেশী ভাগ্যান্বেষীরা স্বভাবতই ভাড়াটে ইনফরমারদের মতো হায়েস্ট বিডারদের পক্ষ নিয়েছে। ফলে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবশিষ্ট মুসলিম-শক্তি দুর্বল হয়। ভারতের দিকে দিকে স্বাধীনতাকামীদের রণভেরী উত্তাল হয়ে ওঠে। তারা বহুস্থানে স্বাধীন-রাজ্য স্থাপন করে। তবে বিদেশীদের বিতাডনের জন্য তাঁরা একবারও একত্রিত হতে পারেন নি।

সকল ভূস্বামীদের সুগঠিত সৈন্য ছিল না। কিন্তু তাঁদের অধীনে স্বনির্ভর স্বয়ংক্রিয় জাতীয় পুলিশ ছিল। বিদেশীরা এই জাতীয় পুলিশ ভেঙে দিতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় পুলিশের সশস্ত্র বিভাগই বারে বারে সৈন্যদলের কাজ করেছে। এই সুশিক্ষিত বংশানুক্রম পাইক বা পুলিশ-দলে সমরপ্রিয় অন্যেরাও যোগ দিতো। সম্ভবত এই স্বনির্ভর জাতীয় পুলিশই স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের প্রাথমিক শক্তির উৎসস্বরূপ ছিল। এরাই জাতির যুদ্ধপ্রবণতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে এরা পরিচিত।

এই রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধে ভারত যখন ক্ষতবিক্ষত ও যুদ্ধক্লান্ত তখন ইংরাজরা তাঁদের একতা, দূরদর্শিতা, সমর ও সংগঠন-শক্তি, সাহসিকতা, স্বদেশপ্রীতি ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন। এই অভাবনীয় অনুকূল পরিবেশের সুযোগ নিলেন তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের কলকাতা-আসার পরই তার সূত্রপাত।

তখন পর্যন্ত কলকাতার অধিকৃত জমিটুকু জবরদখলী ও পরে ইজারাকৃত। তার পরিমাণ মাত্র দেড় মাইল। ১৬৯৮ খ্রী. ইংরাজরা মাত্র ষোল হাজার টাকা মূল্যে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম তিনটি এবং তার সংলগ্ন জমি স্থানীয় জমিদারের নিকট হতে ক্রয় করেন। তার দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং প্রস্থ এক মাইল। কলকাতা—১৭০৪।৩ কাঠা, গোবিন্দপুর—১০৪১।৩॥ কাঠা ও সুতানুটি—১৮৬১।০২।১ কাঠা।

১৬৯৯ খ্রী. ইংলণ্ডের অধীশ্বরের নাম অনুসারে ইংরাজরা কলকাতায় বাদশাহের অনুমাত নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ করেন। ওই বৎসরেই কলকাতাকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মতো প্রেসিডেন্সী পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। তার নাম হয় 'ফোর্ট উইলিয়ম ইন্ বেঙ্গল'। বণিক-সভার জন্য এজেন্টের বদলে প্রেসিডেন্টের পদ হয়। পরবর্তীকালে তাঁরাই গভর্নর। তাঁদের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন বিয়ার্ড সাহেব। এই সময় ইংরাজরা মাত্র গড়বন্দীর মধ্যকার জমিতেই বসবাস করতো।

প্রেসিডেন্ট বিয়ার্ড সাহেব তাঁর সাহায্যার্থে চারজন মেম্বার-সহ একটি কাউনসিল সৃষ্টি করেন (১) একাউন্টেট (২) গুদাম-রক্ষক (৩) ম্যারিন পার্সার ও (৪) কলেক্টর। দ্রব্যাদির মূল্য কলেক্টর গ্রহণ ও নির্ধারণ করতেন।

ওই সময় পুলিশ ও আদালত স্থানীয় জমিদার-শাসকের নিয়ন্ত্রণে। ইংরাজ-বণিকগণও তাঁদের রক্ষণাধীনে ছিলেন। তবে ইংরাজদের নিজেদের বিবাদ বিয়ার্ড নিজে মীমাংসা করে দিতেন। ভাষা বোঝার অসুবিধায় জমিনদাররা এতে আপত্তি করেন নি। তাছাড়া, ওই অধিকার বাদশাহ স্বয়ং ইংরাজদের দিয়েছিলেন।

এই কালে স্থানীয় জমিনদারী-পুলিশ ইংরাজদের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। ওরাই শান্তি-রক্ষার জন্য দায়ী থাকতো। গড়বন্দীর বাইরে ইংরাজদের ক্রীত জমিতে বসবাসকারী দেশীয়দের জন্য জমিনদার-শাসকের বিচার-ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু গড়বন্দীর ভিতরের বাসিন্দা ইংরাজদের বিচার-কার্য মার্চেন্ট-কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট করতেন। ইতিমধ্যে কিছু দেশীয় বণিক গড়বন্দীর ভিতরে বাড়ি তৈরি করায় প্রশ্ন উঠলো যে তাদের বিচার করবে কারা? জমিনদার-শাসক কেল্লার ভিতরের বিষয়ে দায়ী হতে চান নি। নবাব-সরকার ওদের বিচারের জন্য কাজী পাঠাতে চাইলে উৎকোচ দিয়ে তাদের নিরস্ত করা হলো।

গড়বন্দীর বাইরে ইংরাজদের ক্রীত গ্রাম কটিতে তখন জমিনদারী পুলিশ ও বিচার-ব্যবস্থা ছিল। কলকাতা তখনও [১৭১৭ খ্রী.] নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্যে বিভক্ত। পুরানো দলিলে জেলা যশোহর ও গ্রাম শিলাইদহ রূপে উল্লেখ আছে। জঙ্গলাকীর্ণ ও জলাভূমি হলেও এই অঞ্চলে বহু ধীবর ও চাষী বাস করতো। বহু বর্ণহিন্দুরও বসবাস ছিল। পঞ্চায়েতের অধীনে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব জাতিমালা কাছারি ছিল। সেকালে প্রত্যেক জাতি ও বর্ণ এক-একটি ক্ষুদ্র রিপাবলিকের মতো। তারা পৃথক পৃথক পল্লীতে একত্রে বসবাস করতো। বৃহৎ পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাও ছিল। প্রয়োজন হলে তার অধিবেশন হতো।

১৭০০ খ্রী. দুর্গের গড়বন্দীর মধ্যে ১২০৩ জন ইংরাজ বাস করতো। বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে তাঁরা এখানে আসেন। কলকাতার দুর্গটিকে তাঁরা গোপনে রক্ষিত করেন।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী হওয়ার [১৭০৪ খ্রী.] কিছু পরে মার্চেণ্ট-কাউনসিলের প্রধানকে প্রেসিডেণ্ট না-বলে গভর্নর বলা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রভাব থেকে কলকাতা তখন মুক্ত।

১৭১৭ খ্রী. হজেস সাহেব কলকাতার বণিক-সভার গভর্নর হলেন। ওই সময় নবাব জাফর খান এবং স্থানীয় জমিনদার-শাসক ঔরঙ্গজেব-প্রদত্ত ইংরাজদের সমস্ত অধিকার হরণ করে তাদের উচ্ছেদ করতে চাইলেন। ইংরাজ নিরুপায় হয়ে মোগল-সম্রাটকে বহু উপঢৌকন পাঠিয়ে রক্ষা পেলেন।

উপঢৌকনে খুশি হয়ে মোগল-সম্রাট ইংরাজদের কলকাতা-সংলগ্ন আরও ৩৮খানি গ্রাম ক্রয় করার অনুমতি দিলেন। এই বলে বলীয়ান হয়ে ইংরাজরা কলকাতার জন্যে নিজস্ব পুলিশ ও আদালত চাইলেন। এই অতিরিক্ত ৩৮খানি গ্রামের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। গ্রামগুলি ১৭১৭ খ্রী. ডিসেম্বরে কেনা হয়।

১৭২০ খ্রী. ইংরাজরা কলকাতা-শাসনের জন্য জমিনদার-শাসকদের অনুকরণে একটি জমিনদার-পদের সৃষ্টি করেন। কারণ, ইংরাজরাই তখন কলকাতা-অঞ্চলের জমিনদার। সেই মতো তাঁরা জমিনদারী-পুলিশ তৈয়ারিরও অধিকারী। তাঁরা রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য এক রাষ্ট্র করবেন এ-রকম চিন্তা তখন অবশ্য কেউ করেন নি। প্রথমে স্বল্পকালের জন্য একজন বাঙালী নন্দরাম সেনকে ও পরে গ্রীক নামে একজন ইংরাজকে জমিন-দার করা হলো। পরে মার্চেণ্ট-কাউনসিলের জনৈক সদস্যই জমিনদার হতেন। ১৭৫২ খ্রী. জনৈক আইরিশম্যান হলওয়েলকে জমিনদার করা হলো।

জমিনদার হলওয়েল এবং বণিক-সভার সদস্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা বিষয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা দেশীয়দের ভাষা ও স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন না। চারিদিকে তখনও শক্তিশালী জমিনদার-শাসক। হল-ওয়েল সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর একটুও সময় নেই।

১৭২০ খ্রী. জমিনদার পদের সৃষ্টিকাল থেকে ১৭৫৬ খ্রী. পলাশীর যুদ্ধকাল পর্যন্ত বাবু গোবিন্দরাম মিত্র ইংরাজ-জমিনদারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর উপরেই কলকাতার শাসন, বিচার ও পুলিশ-গড়ার ভার দেওয়া হয়। কলকাতার প্রশাসক বলতে তাঁকেই বোঝাত। বাবু গোবিন্দরাম সুষ্ঠু শাসনের জন্য তাঁর অধীনে তিনজন নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। নিম্নের তালিকা থেকে তাঁর শাসন-ব্যবস্থা বোঝা যাবে :

দেওয়ান গোবিন্দরাম

[দেশীয়দের বিচার ও বরকন্দাজ]

নায়েব-দেওয়ান :	নায়েব-দেওয়ান :	নায়েব-দেওয়ান:
পথঘাট পরিষ্কার, স্বাস্থ্য, পুষ্করিণী।	[পুলিশ, আবগারী জল-পুলিশ সহ]	খাজনা আদায়, খাদ্য-সরবরাহ।

ইংরাজগণ জমিনদার হওয়ায় কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর সংলগ্ন ৩৬খানি গ্রামের গ্রামীণ পুলিশ ও থানাদারী পুলিশ দেওয়ান গোবিন্দরামের অধীন হলো। ব্রিটিশ-ভারতের পুলিশ যেমন স্বাধীন ভারতীয় পুলিশে রূপান্তরিত হয়, তেমনি জমিনদারী পুলিশের উল্লেখ্য অংশ কলকাতা-পুলিশে পরিণত হয়েছিল। গোবিন্দ-রামের দ্বারাই প্রথম কলকাতা-পুলিশের সৃষ্টি।

মাত্র ১৪৩ জন পাইকসহ মূল কলকাতার শহর অংশে কলকাতা-পুলিশের পত্তন করা হয়। ওদের মধ্য হতে কিছু পাইককে কলকাতার প্রধান বণিকদের বাড়ি রাত্রে পাহারা দিতে হতো। প্রতি পাইকের মাসিক বেতন ছিল মাত্র দু'টাকা। পুলিশের সর্বোচ্চ পদে [হলওয়েল সাহেব] বেতন ছিল দু'হাজার টাকা।

গোবিন্দরাম মূল শহরের [কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটি] উপরোক্ত পুলিশের জন্য দু'জন দারোগা এবং সদ্য ক্রীত শহরতলির বাকি ৩৭টি গ্রামের জন্য দু'জন দারোগা নিযুক্ত করলেন। সমগ্র শহর ও শহরতলি তিনি চারজন দারোগার অধীনে কয়েকটি থানায় বিভক্ত করেন। থানাদারদের অধীনে কয়েকটি চৌকি রইলো। থানায় পাইক [বর্তমান কনস্টেবল], নায়ক [হেড-কনস্টেবল], নায়েবরা [বর্তমান তদন্তকারী] এবং তাদের প্রধানরূপে থানাদাররা ছিলেন। কিন্তু চৌকিগুলিতে নায়কদের অধীনে চৌকিদাররা থাকতো। পদমর্যাদাতে চৌকিদাররা পাইকদের অপেক্ষা নিম্নপদী ছিল।

[বি. দ্র.] প্রতিটি থানা এলাকাতে থানাদারদের এলাকা হতে মনোনীত মান্যগণ্য কয়েকজন ব্যক্তির [অবৈতনিক] পঞ্চায়েত তথা বেঞ্চ কোর্ট ছিল। এনারা স্থানীয় ছোট মামলা বিচার করতেন। কিংবা সরেজমিন তদন্ত বা সালিশী দ্বারা প্রভাব বিস্তার করে ওইগুলির মিটমাট করে দিতেন।

গোবিন্দরাম হুবহু জমিনদারী পুলিশের অনুকরণে প্রথম প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থা সহ কলকাতা-পুলিশ সৃষ্টি করেছিলেন।

[পরবর্তীকালে সমগ্র চব্বিশ পরগণার জমিনদারী ১৭৫৭ খ্রী. ক্রয় করে ওই জেলার স্থানীয় পুলিশ ইংরাজরা প্রথম অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ পুলিশকে তাঁরা কলকাতার

সঙ্গে যুক্ত করেন নি। বরং তাঁরা কলকাতার শহরতলির অংশের পুলিশকে চব্বিশ পরগণা পুলিশের অধীন করে। পরে ১৮৬৬ খ্রী. আবার তাকে মূল কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তখন ২৭ পরগণার পুলিশকে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে সিটি পুলিশ বলা হতো।]

দেওয়ান গোবিন্দরামের প্রত্যক্ষ অধীনে বহু বরকন্দাজ অর্থাৎ সশস্ত্র কেন্দ্রীয় পুলিশ, বহু পেয়াদা অর্থাৎ লেবার ফোর্স, পিওন ও হরকরা ছিল। এদেরও কেন্দ্রীয় পুলিশরূপে ব্যবহার করা হতো। সেই কালে পুলিশকে শান্তিরক্ষা সহ লেবার ফোর্স দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার, হিংস্র পশুনিধন, অগ্নিনির্বাপকের কার্য করতে হতো। হরকরারা সংবাদাদির আদান-প্রদান করতো। এ ছাড়া, দেওয়ান গোবিন্দরামের অধীনে কারাগার আদালত ও ব্যবসাদি রক্ষার জন্য বহু রক্ষী তথা গার্ড ছিল।

বাবু গোবিন্দরাম কলকাতা শহরের পথঘাট ও পুষ্করিণী নির্মাণ ও সংরক্ষার জন্য নিজের অধানে এক ধরনের মিউনিসিপ্যাল তৈরি করেন। সেই মিউনিসিপ্যালিটিই নানা বিবর্তনের মধ্যে বর্তমান কলকাতা কর্পোরেশনে রূপান্তরিত।

গোবিন্দরাম অতঃপর স্থল-পুলিশের মতো একটি জল-পুলিশও তৈরি করলেন। একজন নৌ-দারোগার কর্তৃত্বে কয়জন নৌ-সরকারের অধীনে জলদস্যু-দমনে প্রথম নৌ-পুলিশ ভাগীরথী নদীপথে সৃষ্টি হয়। সেই দলে বহু মাঝিমাল্লা দাঁড়ি ও কিছু বরকন্দাজ ছিল। তারাই পরবর্তীকালের পোর্ট-পুলিশের জনক। তাই পুলিশের নিম্নপদীরা পোর্ট পুলিশকে আজও পানি-পুলিশ বলে থাকে।

তখন মগদস্যুরা নদীবক্ষ হতে মানুষ অপহরণ করতো। বাণিজ্য-পোত ও দেশীয় মালবাহী নৌকা সংরক্ষণেরও প্রয়োজন ছিল। বণিকদের স্বার্থে নদীপথ বিপদমুক্ত রাখতে হতো। অনুন্নত পথঘাটের জন্য ধনী ইংরাজ ও বাঙালীদের জলবিহার বেশি পছন্দ। সেজন্য বহু প্রমোদ-তরণী ভাড়া পাওয়া যেত। কলকাতা হতে বহির্গমনের পথগুলি সুরক্ষার জন্য বাবু গোবিন্দরাম কয়েকটি লক-গেটের সৃষ্টি করেন। রাত্রিকালে সেই গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হতো।

কলকাতার দেওয়ান-সাহেব একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার এবং তাঁর অধীনে নায়েব-দেওয়ানরা একযোগে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি পুলিশ-সুপার ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা কলেক্টর ও ডেপুটি-কলেক্টরও বটে। তাঁরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার বিচার করতেন। প্রাণদণ্ডের অপরাধ হলে দেওয়ান-সাহেব স্বয়ং বিচারের ভার নিতেন। তবে তা কার্যকর করতে ইংরাজ জমিনদারদের হুকুম নেওয়া হতো।

সে সময় শহরে আরও বহু আদালত ছিল। ইংরাজদের বিচার স্বয়ং ইংরাজ জমিনদার

কিংবা কাউনসিলের প্রেসিডেণ্ট করতেন। স্বদেশবাসীদের বিচার করতেন গোবিন্দ-রাম ও তাঁর সহকারীরা। কলকাতায় নবাবেরও একটি 'সুধারা আদালত' স্থাপিত হয়। শহরে ঠিক বিচার হচ্ছে কিনা তা দেখা ছিল তার লক্ষ্য। তাদের কর্মপদ্ধতি কিছু পরিমাণে রেসিডেন্সীর কাজের অনুরূপ। ইংরাজরা পরবর্তীকালে দেশীয় রাজ্যে ওই রকম রেসিডেন্সী স্থাপন করেছিলেন।

জমিনদারী দারোগাদের মতো কলকাতার নতুন দারোগারা অত বেশি পদমর্যাদার অধিকারী হন নি। তবে, তাঁরাও পুলিশের তদারকি-সহ কিছু ছোট মামলার বিচার করতেন। নৌ-দারোগারাও তাঁদের এলাকার কিছু ছোট মামলার বিচার করতে পারতেন।

থানাদাররা ও নায়েবরা তদন্তের কাজ করতেন। পাইক ও চৌকিদাররা নায়কদের অধীনে পাহারা দিতো। থানাগুলিতে মুনসীরা নথিপত্র লিখতেন। উধ্বর্তন কর্মী দারোগারা যথারীতি তাদের কাজের তদারকি করতেন। কাউকে ধরে বা ডেকে আনতে কিংবা কাউকে নজরবন্দী রাখতে পেয়াদা নিযুক্ত হতো।

বিভিন্ন পদের পুলিশকে বিশেষ উর্দি ও চিহ্ন ধারণ করতে হতো। পাইকরা দিবা-ভাগে লাঠি ও রাত্রে বর্শা ব্যবহার করতো। চৌকিদারদের জন্য ছিল লাঠি। উধ্বর্-তন কর্মীদের কোমরে তরবারি থাকতো। সশস্ত্র পাইক-বরকন্দাজরা বন্দুক ব্যবহার করেছে। এদের নিয়মিত ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হতো। আবার, তাদের জন্য দণ্ড ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল।

স্থানীয় চাষী ও শিল্পী, ধীবর, ডোম ও বাগদীদের ভিতর হতে পুলিশের জন্য লোক বাছা হতো। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরাও এই পুলিশের বহু পদে অধিষ্ঠিত হতেন। এই পুলিশ-দলে স্বল্প ভোজপুরীও ছিল।

বাবু গোবিন্দরামের প্রচেষ্টায় কলকাতা তখন ভারতে তথা পৃথিবীতে শেষ দুর্ভেদ্য নগর-রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য শহরের বাইরে এদের কোনও এক্তিয়ার ও ক্ষমতা ছিল না। গঙ্গানদী ছিল এদের একমাত্র আগমন ও বহির্গমনের পথ।

আইন-আরোপণে ও শান্তি-সংস্থাপনে গোবিন্দরাম ছিলেন নির্মম। 'গোবিন্দরামের ছড়ি' আজও উল্লেখ্য প্রবাদ। তিনি অন্য বিষয়ে সুবিচারক ও সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন।

কলকাতা-পুলিশের সুরক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরাজ-বাসিন্দারা গড়বন্দীর ভিতর থেকে বেরিয়ে শহরে বসবাস শুরু করলো। প্রথমে তারা বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড-এ ও ডাল-হাউসিতে এবং পরে চৌরঙ্গী অঞ্চলে গৃহনির্মাণ করে। ক্রমে তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতদিন ইংরাজদের পারস্পরিক বিবাদের নিষ্পত্তি বণিক সভার প্রেসি-ডেণ্ট ও পরে গভর্নররা করতেন। এইবার সেই কাজে পৃথক বিচারালয়ের প্রয়োজন

হলো।

ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জর্জ ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্বকালে ১৭২৬ খ্রী. রাজকীয় হুকুমৎ তথা রয়েল চার্টার মতো কোম্পানির দখলিভুক্ত জমির সীমানার মধ্যে গোবিন্দরাম সৃষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি বহাল রেখে মাত্র গড়বন্দীর ভিতরকার ইংরাজ-বসবাসকারী এলাকাটি একজন ইংরাজ মেয়র এবং নয়জন অলডারম্যানের অধীন করা হলো। কিন্তু গডবন্দীর বাহিরে দেশীয় অধিবাসীদের এলাকাটি বাবু গোবিন্দরামের অধীনেই রইলো। এই মেয়রের অধীনে বিলাতী কায়দায় একটি মেয়র-কোর্টে যুরোপীয়দের বিচারকার্য হতো। দেশীয়গণের উভয়পক্ষ ইচ্ছা করলে ওই কোর্টে বিচার প্রার্থী হতো। কিন্তু দেশীয়গণের দেওয়ান গোবিন্দরামের দেশীয় আদালতই পছন্দ। এটি গোবিন্দরামের সুবিচার প্রমাণ করে।

মূল শহরের আদালত ও পুলিশ-বিভাগ দেওয়ান গোবিন্দরামের অধীনে থাকে। শুধু শহরের গডবন্দীব ভিতরের যুরোপীয় এলাকার প্রশাসন ও পৌরকার্য তাঁর হাত থেকে বার করে নেওয়া হয়। তখনও ইংরাজরা কেল্লার ভিতরকার ভূমিতে বসবাসই নিরাপদ মনে করতো। বাবু গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৫৬ খ্রী. পর্যন্ত মূল কলকাতা ও উহাব শহরগুলির কার্যত প্রশাসক ছিলেন।

[কলকাতা পুলিশ ও তার পৌর প্রতিষ্ঠান ইংরাজদের সৃষ্টি নয়। এ দুটি বাবু গোবিন্দরাম মিত্রের সৃষ্টি। পুলিশী সংস্থা সম্বন্ধে ইংরাজদের ধারণা ছিল না। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দেও লণ্ডনে কোনও পুলিশী সংস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ওই বৎসর লণ্ডনে লর্ড জর্জ গর্ডনের নেতৃত্বে শহরের বৃহত্তম দাঙ্গা ঘটে। তাতে জনগণের সঙ্গে অসংখ্য ক্রিমিন্যালও যোগ দেয়। এরা জেল ভাঙার পর ব্যাংকের দিকে এগোয়। পুলিশ না থাকায় সৈন্যরা ওই দাঙ্গা দমন করে। ষাট হাজার দাঙ্গাকারী তাতে যোগ দিয়েছিল। পুলিশ থাকলে এই দাঙ্গা সম্ভব হতো না। উভয়পক্ষের অসংখ্য ব্যক্তি তাতে নিহত হয়। জেসফ গোলম্বের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। দ্র.]

পৌর প্রতিষ্ঠান

দেওয়ান বাবু গোবিন্দরাম পথঘাট ও পানীয় জলের উন্নয়নে শহরে একটি মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করেন। প্রথমে থানাওয়ারীভাবে প্রতিটি থানা-এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় পৌর-সংস্থা স্থাপিত হয়। ওগুলি থানাওয়ারী ভাবে থানাদারদের অধীন করা হয়েছিল। এই সময় পূর্তকার্য, পৌরকার্য, পশুনিধন, অগ্নিনির্বাপণ ও পুলিশী কার্য একত্রে থানাদাররা সমাধা করতেন। সেজন্য সাহায্য করবার জন্য তাদের অধীনে একাধিক নায়েব নিযুক্ত করা হতো। তখন পুলিশকেই নাগরিকদের উপর করধার্য ও

তা আদায় করতে হতো। পরবর্তীকালে অগ্নিনির্বাপণ ও পুলিশী কার্য বাদে অন্যগুলির দায়িত্ব হতে তাদের মুক্ত করা হয়।

এই সব বিকেন্দ্রিত পৌর সংস্থার উপরে পরে একটি কেন্দ্রীয় পৌরসংস্থা হয়। তার তদারকি অন্যান্য কাজের সঙ্গে গোবিন্দরাম স্বয়ং এবং তার নায়েব-দেওয়ানরা সমাধা করতেন। তবে এই কেন্দ্রীয় পৌরসংস্থা বিভিন্ন থানার এলাকার মধ্যে যোগাযোগ পথগুলি মাত্র সংরক্ষণ করতো। থানার এলাকার ভিতরকার পথঘাটের জন্য থানাদার-রাই দায়ী ছিলেন। বস্তুতপক্ষে ঐ সময় প্রতিটি থানার এলাকা পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শহর-রূপে গণ্য হতো।

[বি দ্র.] পরবর্তীকালে বহুবিধ বিবর্তন সত্ত্বেও আজও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রাচীন প্রথামতো স্থানীয় থানাতে হুকুম পাঠিয়ে থাকেন : 'A' টাউন টু এনকোয়ার। কিংবা 'B' টাউন টু রিপোর্ট। 'A' টাউন অর্থে শ্যামপুকুর থানা। 'B' টাউন অর্থে জোড়াবাগান থানা। এইভাবে বটতলা, বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, আমহার্স্ট স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট, বহুবাজার, মুচিপাড়া, তালতলা প্রভৃতি পর পর অক্ষর-চিহ্নিত টাউন আজও বিভক্ত।

কলকাতা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বুঝে বহু দেশীয় ও মানী গুণী ব্যক্তি ওই সময় এই শহরে বসবাস শুরু করেন। অন্যেরা কলকাতায় তাঁদের দ্বিতীয় বাসস্থান করেন। নিরাপত্তার জন্য বহু ধনসম্পত্তি ও মেধা কলকাতায় পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এইরূপ শান্তি ও সুরক্ষণের সুযোগে ইংরাজরা অন্যকর্ম অর্থাৎ রাজ্যজয় ইত্যাদি ব্যাপারে মনো-নিবেশ করে। বিপরীত অবস্থার জন্য মুর্শিদাবাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। ওই সময়ের আগে ও পরে নিরাপত্তার কারণে নিম্নোক্ত ধনাঢ্য ও মানী গুণী ব্যক্তি কলকাতায বস-বাস শুরু করেন।

রায়-রায়ান মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর। ইনি ঢাকার শাসক ছিলেন। মহারাজ নন্দ-কুমার ইনি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। তাঁর পুত্র রায়-রায়ান মহারাজ গুরুদাস। গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের মুৎসুদ্দি ও আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচরণ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। পরে হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবু, হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ, রিচার্ড বাদওয়েলের পারসী-শিক্ষক মুন্সী সদরুদ্দীন, রাজেন্দ্র-লালের পূর্বপুরুষ রাজা পীতাম্বর মিত্র, রামকৃষ্ণ দত্তের পুত্র মদনমোহন দত্ত, পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান বনমালী সরকার ও তাঁর নায়েব-দেওয়ান, দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র স্বয়ং মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব যিনি পরে মহারাজা, জয়নারায়ণ ঘোষাল, [আমাদের আত্মীয়] কুঠিয়াল উমিচাঁদ যাঁর মৃত্যু কলকাতায় ১৭৬০ খ্রী. বাবু গৌরী সেন ও আরও অনেকে।

[বি. দ্র.] এই সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। এঁদের প্রদত্ত অর্থেই মুখ্যত কলকাতা শহর গড়ে ওঠে। তাঁদের বংশধরগণও পিতৃপুরুষের অর্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করেন। কলকাতার পরবর্তী বহু প্রতিষ্ঠানও তাঁদের উত্তরপুরুষের অর্থে তৈরি। আমাদের বংশের কালীশংকর ঘোষাল হিন্দুকলেজ স্থাপনে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। এই সময় বাঙালীরা গভর্নমেণ্টেব মুখাপেক্ষী না হযে নিজেরাই পার্ক ব্যাঙ্ক কলেজ পথঘাট পাঠাগার প্রভৃতি তৈরি করতো। টাউন হল, বেঙ্গল লাইব্রেরী [ইম-পিরিয়াল] বেঙ্গল ব্যাঙ্ক [ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক] হিন্দু কলেজ [প্রেসিডেন্সী কলেজ] আদি তারা নিজেরা চাঁদা তুলে তৈরি করে গভর্নমেণ্টকে তুলে দিয়েছে।

উপরোক্ত দেওয়ান এবং প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজদের সাহস ও বুদ্ধি তো দিয়েছিলেনই ! উপরন্তু তাঁরা বিদ্রোহোন্মুখ দেশীয়দের ইংরাজ-পক্ষভুক্ত করেন। এঁদের নেতা রাজা নবকৃষ্ণ দেবেব এবং ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও বুদ্ধির দ্বারা বাংলার বহু শক্তিশালী জমিনদার শাসকেরা এবং মুসলিম ওমরাহ ও সর্দারগণ ইংরাজদের পক্ষভুক্ত হন। কলকাতার প্রকৃত শাসক বাবু গোবিন্দরাম কিন্তু ওই-সব বিষয়ে যুক্ত থাকেন নি।

[বাবু গোবিন্দরাম স্বয়ং দিনমানে ও মাঝে মাঝে রাত্রিকালে পুলিশেব থানাগুলি পরিদর্শন করতেন। এই কাজে পালকি ছিল তাঁর বাহন। পালকির আগে চারজন বন্দুকধারী বরকন্দাজ ছুটতো।]

১৭৪২ খ্রী. কলকাতা পুলিশ প্রথমবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলো। মারাঠারা কলকাতা আক্রমণে উদ্যত। কলকাতা পুলিশের পাইকগণ ও তার অধীন ছয় শত পেয়াদা [পুলিশের লেবার-ফোর্স] এবং তৎসহ তিন শত যুরোপীয়ান কলকাতাব প্রকৃত শাসক গোবিন্দরামের তত্ত্বাবধানে ছয়মাস প্ররিশ্রমে কলকাতাকে অর্ধবেষ্টিত করে মারাঠা খাদ খনন করেন। উহার দুইটি মুখ পশ্চিমদিকের গঙ্গা নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ওই খাদের মাটি হতে একটি অর্ধবৃত্তাকার রাস্তাও তৈরি হলো। মারাঠা অশ্বারোহীদের পক্ষে কলকাতায় প্রবেশ দুর্গম হয়ে ওঠে। খাল বা গড খনন করে আত্মরক্ষা করা বাঙালীদের চিরন্তন স্বভাব। এই খালের দক্ষিণ দিকের অংশ—লোয়ার সারকুলার রোড চওড়া করার জন্য পরে বুজিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৫০ খ্রী. জনৈক ড্রেক সাহেব কলকাতা নগর রাষ্ট্রের গভর্নর হয়ে এলেন। সপারিষদ গভর্নর বাহাদুর কিছু বিরক্তিকর ট্যাক্স ধার্য করেন। এই কর আদায়ে কলকাতা পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়। কিন্তু, গোবিন্দরাম এবং তাঁর পুলিশের এতে অসুবিধা হয়। ওদের কেউ কেউ এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। গোবিন্দরামের সহিত গভর্নরের মনোমালিন্য ঘটে।

'প্রথম শতকরা পাঁচ টাকা হারে বিক্রয়-কর ধার্য হলো। পরে ভিখারী ভোজন, শ্রাদ্ধের ষাঁড়-দাগা, নৌকা ও ক্রীতদাস বিক্রয়, বিবাহের উপর, দানধ্যান, দ্রব্য-প্রবেশ-কর (Entry Tax) ধার্য হয়। শস্য ছাড়া কোনও পণ্যদ্রব্য কলকাতায় এলে তাতে ট্যাক্স। য়ুরোপীয়দের ক্ষেত্রে তা হতে অব্যাহতি দান। দেশীয়দের ও আর্মেনিয়নদের উপর তার প্রয়োগ। অন্যায় কর-প্রদানে বাঙালী অভ্যস্ত নয়। বাংলার কোথাও ক্রীতদাস-প্রথা নেই। কিন্তু, ব্যবসায়িক স্বার্থে কলকাতায় সে-প্রথা চালু।'

শহরের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। এতে নবাবকে কলকাতা আক্রমণে উৎসাহিত করে। কিছু ধনী ব্যক্তিরা নবাব-বিরোধী হয়ে যান। সাধারণ মানুষ তখন ইংরেজ বিতাড়ন চায়। এ সংবাদ সম্ভবত নবাবের নিকট পৌঁছেছিল। অন্যদিকে একটি বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ ও তাঁর পরবর্তীদের কুশাসন ও উৎপীড়ন ধনী বাঙালীদের বিরূপ করে। নচেৎ অতগুলি প্রভাবশালী জ্ঞানী ব্যক্তি অত অল্প সময়ে নবাব-বিরোধী হতেন না।

এই সময়ে দেওয়ান গোবিন্দরামের মতো রাজা নবকৃষ্ণও কলকাতার আসরে অবতীর্ণ। দেওয়ান গোবিন্দরাম ব্রিটিশদের বর্তমান কালীন হোম্ মিনিস্টার এবং রাজা নবকৃষ্ণ তাদের বর্তমান কালীন ফরেন মিনিস্টারের মতো কার্য করেছিলেন। এই দু'জনার বিরাট প্রতিভা ও কর্ম তৎপরতার দ্বারা সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হয়।

[রাজা নবকৃষ্ণের সাহায্যে কলকাতায় ইংরাজরা সর্বপ্রথম দেশীয় সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করেন। এরা সকলেই বাংলাদেশের বাঙালী ছিল। পরে ওরা মাদ্রাজে তেলেগু সেনাদের একটি বাহিনী সৃষ্টি করেন।]

১৭৫৬ খ্রী. নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলেন। কলকাতা পুলিশ দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলো। তারা কোন্ পক্ষে যাবে তা ঠিক করতে হবে। কলকাতা পুলিশ নিয়োগকর্তাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। গভর্নর ড্রেক সাহেব ও কিছু ইংরাজ নৌপুলিশের সাহায্যে একটি যুদ্ধ-জাহাজ এবং নৌপুলিশের জলযানে কলকাতা থেকে পালালেন। কিন্তু কলকাতা পুলিশ পলায়ন করে নি। তারা নিজেদের একটি ঘাঁটিও ত্যাগ করলো না। নবাব-সৈন্যদের লুঠতরাজে তারা সাধ্যমতো বাধা দিয়েছে এবং নাগরিকদের রক্ষা করেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবকালে নিরপেক্ষ থাকা ভারতের স্বয়ংক্রিয় স্বনির্ভর স্বাধীন জাতীয় পুলিশের চিরাচরিত ঐতিহ্য। এজন্য বিজয়ী নবাবের আক্রমণের লক্ষ্য পুলিশ হয় নি। তিনি তা ভেঙে দেওয়ারও হুকুম দেন নি। কলকাতায় তিনি ইংরাজদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

কলকাতা-পুলিশ তখন শহর রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ফোর্ট-এলাকা তাদের এক্তিয়ারের বাইবে। ফোর্ট রক্ষার ভার গোরা ও তেলেগু সৈন্যের উপর। সেইখানে কিছু সংখ্যক ইংরাজ বন্দী অবস্থায় নিহত হয়। 'অন্ধকূপে-হত্যা' নামে উহা প্রচারিত। এই অন্ধ-কূপ-হত্যার জন্য নবাব দায়ী ছিলেন না। তাঁর অজ্ঞাতে অন্যদের দ্বারা এটি সংঘটিত হয়। শহবের ইংরাজদের কলকাতা-পুলিশ আশ্রয় দেয় এবং পরে নিরাপদ দূরত্বে তাদের সরিযে দেয। জমিনদার হলওয়েল ফোর্ট-এলাকায় বন্দী হন। তাঁব কাছারি ফোর্টের মধ্যে ছিল। কিন্তু বাবু গোবিন্দরাম বন্দী হন নি। গোবিন্দরাম ও তাঁর পুলিশ শহরে যথারীতি কর্তব্য পালন করেন। বর্তমান মিশন রো এলাকায় ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। সেই সময কলকাতা-পুলিশ নাগরিকদেব অপসারণে ব্যস্ত থাকায় পুলিশের কিছু পাইক নিহত হয়। কলকাতা-পুলিশ উভযপক্ষের বহু মৃতদেহ অপসারণ করে শহরকে মহামারী হতে রক্ষা করে।

নবাবেব নিষেধ সত্ত্বেও রাজা নবকৃষ্ণ ফলতাতে ইংরাজদের অর্থ, ফৌজ ও রসদ পাঠান। তিনি স্থলপথে গভর্নব ড্রেকের সঙ্গে দেখা করে স্থান পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেন। তাঁকে তিনি বোঝান যে নবাবের যাবতীয় অমাত্য ও সর্দারগণ তাঁদেব সাহায্য করবে। মুর্শিদাবাদের জাফর আলী খাঁকে তিনি ইংরাজ পক্ষে এনে-ছেন। জমিনদার শাসকদেরও তিনি ইংরাজদের পক্ষে নেবেন। ঐ সংবাদ সহ তিনি মাদ্রাজে সংবাদ পাঠাতে তাঁকে উপদেশ দেন। মাদ্রাজ হতে ফৌজ না আসা পর্যন্ত তাঁকে সেখানে অপেক্ষা করতে তিনি রাজী করান।

নবাব সিরাজের ধারণা ইংরাজরা দেশ ত্যাগ করে চলে গেল। এজন্য তিনি অন্য কোনও প্রস্তুতি নেন নি। তাঁর নিজস্ব সংবাদ-সরবরাহকারী পুলিশের অভাব এ জন্য দায়ী। তিনি শহরের নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখলেন। তারপর রাজা মানিকচাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা করে সিরাজ মুর্শিদাবাদ ফিরলেন। রাজা নব-কৃষ্ণ সম্ভবত রাজা মানিকচাঁদকে স্বপক্ষে এনেছিলেন। কিন্তু কলকাতা-পুলিশ নতুন শাসককে স্বীকার করে নি। ইংরাজদের পলায়নের ফলে নগর শাসনের ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হলো। বাধ্য হয়ে কলকাতা-পুলিশ শহরের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করে। ইংরাজরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা ঐ গুরুভার বহন করেছিল।

কলকাতার বর্তমান আলিপুর এলাকা উপরোক্ত আলিনগর হতে সৃষ্ট। পরে আলি-নগরের নাম পুনরায় কলিকাতা রাখা হয়।

[উল্লেখ্য এই যে কলকাতা-পুলিশ গোবিন্দরামের নেতৃত্বে কলকাতার ইংরাজ মেয়র ও তাঁর অল্ডারম্যানদের স্থানান্তরিত করে রক্ষা করেছিলেন। গোবিন্দরামকে বিতা-ড়িত করে পরে ইংরাজরা সমগ্র শহর সমেত কলকাতা-পুলিশকে ঐ মেয়রেরই অধীন

করে দেয়।]

[বি. দ্র.] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কলকাতা-পুলিশকে অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জাপানীরা কোহিমাতে তখন এসে গিয়েছে। যে কোনোও মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করে কলকাতায় আসবে। ব্রিটিশরা রাঁচিতে দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইন তৈরি করবে। প্রত্যেক থানা-অফিসারকে বিনা লাইসেন্সে লরী চালাতে শেখানো হলো। পালাবার রুট সহ গোপন প্ল্যান ও নক্শা প্রতিটি থানাতে পাঠানো হলো। ইংরাজ চায় না যে পুলিশের সাহায্যে জাপানীরা প্রশাসন চালু করুক। কিন্তু গোপনে ঠিক হলো যে কলকাতা-পুলিশ নাগরিকদের অরক্ষিত রেখে পালাবে না। তাদের তৈরি সিভিক-গার্ড ও জনগণের সাহায্যে তারা নাগরিকদের রক্ষা করবে। সেদিন যারা ওই বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

[নবাবের আক্রমণে কলকাতা-যুদ্ধে নিহত এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিগতপ্রাণ মৃত-দেহ গাড়ি গাড়ি কলকাতা-পুলিশ সৎকার করে শহরকে মহামড়ক হতে রক্ষা করে। পরবর্তীকালে কলকাতা-পুলিশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে এবং ১৯৪৬ সনের কলকাতা মহাদাঙ্গায় নিহত অসংখ্য মৃতদেহ অপসারণ করে শহরকে রক্ষা করে।]

[ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় পাদ্রীরা বহু ক্ষুধার্ত বালক ক্রয় করে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নিয়ে যায়। বহু বাঙালী বালক প্যারিসের দোকানে 'পেজ-বয়' হয়। ইতিহাসে সাক্ষ্য, এই ভাবপ্রবণ বাঙালী বালকেরা প্রথম ফরাসী-বিদ্রোহ সূচনা করে। এ সম্পর্কে ফেমিন রিপোর্ট দ্র.]

মাদ্রাজ হতে কর্নেল ক্লাইভকে কিছু গোরা ও তেলেগু সৈন্যসহ কলকাতা পুনরাধি-কারে পাঠানো হলো। রাজা নবকৃষ্ণের সহায়তায় তিনি কলকাতা পুনর্দখল করলেন। কিছু পরে কর্নেল ক্লাইভ কলকাতার গভর্নর হলেন। গোবিন্দরামের নির্দেশে কল-কাতা-পুলিশ নিরপেক্ষ ছিলেন, তা না হলে নগরবাসীদের রক্ষা করা কঠিন হতো। এটা ইংরাজদের সকল ব্যক্তি সুনজরে দেখেন নি।

নবাব দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগান-বাড়িতে ঘাঁটি করেন। এবারও সন্ধি করার ছলে রাজা নবকৃষ্ণ বহু উপঢৌকন-সহ এক ছদ্মবেশী ইংরাজ সামরিক ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে নবাব-ছাউনিতে নিতে এলেন। সেই সুযোগে তাঁরা নবাবের সৈন্য-অবস্থানের খুঁটিনাটি বুঝে নিলেন। সেই গোপন নক্সামতো গভীর রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরাজগণ বহু দেশীয় সৈন্যসহ নবাবকে আক্রমণ করে তাঁর শিবির লণ্ডভণ্ড করে ফেললো। ক্লাইভের অতর্কিত আক্রমণে পর্যুদস্ত নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এই বিশ্বাসঘাতী অভিযানে রাজা

নবকৃষ্ণের সংগৃহীত কিছু বাঙালী সৈন্যও ছিল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা অযোগ্য ও উৎপীড়ক হলেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁর সময়ে ঢাকা ও পাটনায় হিন্দু শাসক এবং হুগলীতে হিন্দু ফৌজদার নিয়োজিত ছিল। রাজা মানিকচাঁদকে তিনি কলকাতার শাসক করেন। হিন্দু জগৎ শেঠ তাঁর ব্যাঙ্কার। তাঁর বহু সেনাপতি, দেওয়ান ও উচ্চপদস্থ কর্মী হিন্দু। মীরজাফরের পরেই সেনাপতি রায়দুর্লভ রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বরং, হিন্দুগণই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি। তবে যোগ্য উপদেষ্টা না থাকায় চপলতা ও 'তারুণ্য'ই তাঁর ক্ষতি করে। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদের যে জয়লাভ তা রাজা নবকৃষ্ণের সাহায্যে ও বুদ্ধিবলে সম্ভব হয়। ষড়যন্ত্রের যা-কিছু দৌত সব তিনি করেন এবং বুদ্ধিও তিনিই যোগান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ, মীরজাফর, সেনাপতি রায়দুর্লভ প্রমুখকে তিনিই স্বমতে আনেন। তাঁকে ইংরাজ সাম্রাজ্যের স্থাপক বলা যেতে পারে।

পলাশীর যুদ্ধে এক গুপ্তশত্রু-আত্মীয় নবাবের মস্তকে একটি রাজচ্ছত্র ধরে থাকেন। উদ্দেশ্য—ইংরাজদের বন্দুকের গুলির জন্য তাঁকে চিহ্নিত করা। দূর হতে মোহনলাল তা দেখতে পান ও রাজচ্ছত্রধারীর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তিনি যথাসাধ্য দ্রুত-গতিতে এসে নবাবের মস্তক হতে ওই রাজচ্ছত্রটি সরিয়ে দেন। এজন্য প্রায় অর্ধ-ঘণ্টার উপর সময় নষ্ট হয়। এতে ফরাসী গোলন্দাজ ও মোহনলালের বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ওই অর্ধঘণ্টা সময় অপচয় না হলে নবাবের মূলবাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ইংরাজরা বিজয়ী হতে পারতো না। মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারে এই কাহি-নীটি আজও শোনা যায়।

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রটি শক্তিশালী স্থানীয় জমিদারের এলাকা। তাঁর নিজস্ব ফৌজ ও সশস্ত্র পাইকরা [পুলিশ], তাঁবেদার ডাকাত দল ও লড়াকু প্রজাবৃন্দ ওই সময় কোথায় ছিলেন? তাঁরা অনায়াসে সৈন্য-চলাচল ও রসদ-বহনের পথ বন্ধ করে দিতে পার-তেন। নিজেদের মধ্যে বিবাদে তাঁরা তো বিপুল বাহিনী জড়ো করতে সক্ষম হতেন। তবে মীরজাফর ও উমিচাঁদরা কি তাঁদের বিভ্রান্ত করেছিল? নাকি, নবাবই জমিদারদের ও তাঁদের ফৌজকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে নি? বিনা আহ্বানে স্বভাবতই তাঁরা ওতে হস্তক্ষেপ করতে চাইবেন না। শক্তি-সমৃদ্ধ বর্ধমান-রাজার কিংবা রামগড়ের রাজার ফৌজ ও সংগৃহীত কামানের কুড়ি ভাগের এক ভাগও ইংরাজরা পলাশীতে আনে নি। বিদেশী জাহাজ রুখতে গঙ্গার দুই তীরের দুইটি নৌ-থানার মধ্যে গঙ্গাবক্ষে প্রলম্বিত একটি লৌহশিকল ছিল। সেটি জমিন-দারী থানাদাররা কোনও বারই কার্যকর করলেন না কেন? সংশ্লিষ্ট আম্রকাননটির

মালিক সম্বন্ধেও অবগত হওয়া উচিত ছিল। মীরজাফরের অভিষেকে মুর্শিদাবাদে যে বিপুল জনসমাবেশ হয় তাদের মুখামৃত উদ্গারে পলাশীর ইংরাজ-বাহিনী ধূলিবৎ উড়ে যেতে পারতো।

জমিনদারদের সাহায্যে লর্ড ক্লাইভ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি জমিনদারদের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ-ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেন। ক্লাইভ দেশীয়দের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা-হরণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

[বি. দ্র.] কলকাতাতেই ইংরাজ সর্বপ্রথম জমিনদারী কায়দায় দুর্লভ [দুলিয়া] বাগদী, ডোম ও ভোজপুরী দ্বারা দেশীয় সেনাবাহিনী তৈরি করে। কিন্তু পরে তাদের কলকাতায় না-রেখে অন্যত্র [মাদ্রাজে ?] নিযুক্ত করা হয়। বাঙালী সেনার পরিবর্তে কলকাতায় তেলেগু সেনা রাখা ঠিক হয়। কিন্তু পরে ওই বাঙালী সেনাদের ভাগ্য অজ্ঞাত থাকে। সম্ভবত মাদ্রাজী ও অন্যদের বিরুদ্ধে না-যাওয়ায় তা ভেঙে ফেলা হয়।

দেশীয় সৈন্য দ্বারা দেশীয়দের স্বাধীনতা হরণ এক ভারতেই সম্ভব হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদের বীরত্ব নগণ্য। শোনা যায় ক্লাইভ তখন নিদ্রামগ্ন। জনৈক ইংরাজ মদ্যপ ব্যক্তির ভুলে হঠাৎ যুদ্ধ বাধে। কিন্তু বাঙালী ও তেলেগু সৈন্য দ্বারা অন্য পক্ষের সামান্য বাধাদানে যুদ্ধজয় সম্ভব হয়। ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতা তার মূল কারণ। ওই যুদ্ধ একটি প্রমোদ-ক্রীড়া বা প্রহসনমাত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। পলাশীর যুদ্ধ দু-ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় নি। বিশাল বাংলার বিরাট জমিনদারী ফৌজ ও পুলিশ তখনও অক্ষুণ্ণ। বিদেশী শাসক ও স্বৈরতন্ত্রীদের বিশেষ অসুবিধা এই যে বাহির হতে সামান্য আঘাতে তারা ভেঙে পড়ে।

পলাশীর যুদ্ধ

মুন্সী নবকৃষ্ণ এই যুদ্ধের স্থান নির্বাচন করেছিলেন। আমবাগানের গাছের আড়ালই ছিল আত্মরক্ষা করার সহজ উপায়। অধিকন্তু, মুন্সী নবকৃষ্ণ ইংরাজ পক্ষে কর্দমাক্ত জমিতে লড়তে এবং উচ্চবৃক্ষে উঠে ইংরাজদের নিশানা জানাতে একদল বাঙালী সৈন্যও সংগ্রহ করে ক্লাইভের অধীনে রেখেছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীঃ ১২ই জুন ক্লাইভের বাহিনী ভাগীরথী পার হয়ে নবাবের ছাউনির দু'-মাইল উত্তরে এক লক্ষ আম্রবৃক্ষ সম্বলিত বিরাট লক্ষবাগ নামক স্থানে প্রবেশ করলো। পূর্বোক্ত নবকৃষ্ণ সংগৃহীত বাঙালী সৈন্য ব্যতীত ক্লাইভের বাহিনীতে ছিল : ৯৫০ জন গোরাসৈন্য [লাল পল্টন] ও তেলেগু বাহিনী-সহ ২১০০ দেশীয় সেপাই এবং আটটি ছোট ও বড় কামান। অন্যপক্ষে, নবাব-বাহিনীর ছিল: ৫০ হাজার পদাতিক,

১৮০০০ অশ্বারোহী ও পঞ্চাশটি বড় কামান। আর ছিল, ফরাসী সেনাপতি সফ্রের অধীনে চারটি ছোট কামান। সফ্রের বাহিনীর পিছনে মীরমদন ও মোহনলালের বাহিনী এবং সমগ্র যুদ্ধস্থানটিকে ঘিরে ছিল রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ ও মীরজাফরের বাহিনী। যুদ্ধকালে এরা সক্রিয় থাকলে ক্লাইভের বাহিনীর অস্তিত্ব মাত্র থাকতো না। ক্লাইভ স্বয়ং প্রথম সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় একথা স্বীকার করেছেন।

বেলা এগারোটার সময় ভীষণ বৃষ্টি এলো। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা বারুদ ঢাকার আচ্ছাদন আনেন নি। তবে সেখানে বিলাস-সামগ্রীর অভাব ছিল না। বারুদ ভিজে গিয়ে নবাব-পক্ষের কামান নিস্তব্ধ। ফরাসীরা তবু কিছু আচ্ছাদন সঙ্গে এনেছিল। ইংরাজদের সঙ্গে বহু ত্রিপল থাকায় এবং তারা আম্রবৃক্ষের আড়ালে থাকায় তাদের বারুদের ক্ষতি হয় নি। এই পরিস্থিতির অনুকূলে এবং জনৈক মদ্যপ ইংবাজের ভুলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

[বি. দ্র.] একজন ইংরাজ সৈন্য নিহত হলে তার স্থলে দেশ হতে নতুন ইংরাজ আনা সম্ভব নয়। তাই তাদের চিরাচরিত প্রথা এই যে শত্রুর কামানে গোলা ফুরা-নোর জন্য ভারতীয় সৈন্যদের সুমুখে এগিয়ে দেওয়া। মাদ্রাজ হতে নতুন মাদ্রাজী সৈন্যও তখনি আনা সম্ভব ছিল না। তাই নবকৃষ্ণ দেব প্রেরিত বাঙালী সেনাদের তখন ফরাসিদের গোলার মুখে ওরা এগিয়ে দিলো। মরতে মরতে তারা শত্রুর কামান দাগার স্থানে পৌছুল এবং হাতাহাতি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলো। তখনও মুষলধারে বৃষ্টিপাত চলেছে। সফ্রের কামানের আচ্ছাদন পর্যাপ্ত না-থাকায় তার বারুদ এখন পুরোপুরি ভিজে। ইংরাজপক্ষের দেশীয় তেলেগু সৈন্যরা সফ্রের কামানদাগার স্থানটি রাজা নবকৃষ্ণের বাঙালী সৈন্যদের সাহায্যে দখল করে নিল। রাজা নবকৃষ্ণের বাঙালী সৈন্যবধে ফরাসীদের গোলার সংখ্যাও তখন যথেষ্ট কমে গিয়েছে।

সফ্রেকে সাহায্য করতে গিয়ে মীরমদন আহত ও তার কয়জন আত্মীয় সেনানী নিহত হলেন। অবস্থা প্রতিকূল বুঝে মোহনলাল তাঁর বাঙালী সৈন্যদলসহ ইংরাজদের আক্র-মণ করলেন। ইংরাজ-বাহিনী ওই আক্রমণের দাপটে বিধ্বস্ত হয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করেছে। সেই সুযোগে ফরাসী গোলন্দাজ সফ্রে পুনরায় কামান দাগতে থাকে। কিন্তু, মীরজাফর ও ইয়ার লতিফ খানের বিদেশী সৈন্য ও সেনাপতি রায় দুর্লভের বাঙালী সৈন্যসহ বিরাট মূলবাহিনী তখনও নিষ্ক্রিয়। নবাব এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ বুঝে ষড়-যন্ত্রের নেতা মীরজাফরের পদতলে উষ্ণীষ রেখে যুদ্ধ করতে কাতর অনুরোধ জানালেন। চতুর মীরজাফর সেইদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ রেখে পরদিন সকালে যুদ্ধ করতে দৃষ্টতঃ রাজী হলেন।

সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ এরূপ নির্দেশ পেয়ে মোহনলাল নবাবকে বলে পাঠালেন যে, এখন আর পিছু হটা যায় না। প্রত্যুত্তরে নবাব কড়াভাবে তাঁকে পূর্বের নির্দেশ পুর্নবার পাঠালেন। এইটাই নবাবের শেষ আদেশ বা নির্দেশ। এতে বাধ্য হয়ে মোহনলাল তাঁর বাঙালী-বাহিনীকে পিছু হটতে আদেশ দিলেন। ইংরাজ বাহিনী তাদের রুদ্ররোষ হতে রক্ষা পেল।

ততক্ষণে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে নবাবের 'মারসিনারি' বিদেশী সৈন্যরা শিবির পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে। রায়দুর্লভ ও মোহনলালের বাঙালী সৈন্য ব্যতীত নবাব-শিবির তখন প্রায় ফাঁকা। [সেই সুযোগে বাঙালীরা ইচ্ছা করলে নবাবের মসনদ দখল করতেও পারতো।]

মোহনলাল ও রায়দুর্লভের অধীন বাঙালী সৈন্যরা ওই সময় নবাব আনুগত্যে দ্বিধা-বিভক্ত। তবে সেইদিন বাঙালীরা স্ব-স্ব নেতার আদেশ পালনে ইতস্তত করে নি। এটা তাদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পরিচায়ক। ফলতঃ এরূপ একটি বড় সুযোগের সদ্ব্যবহার ইংরাজরা করেছিল। এই একই নিয়মানুবর্তিতা নবকৃষ্ণ সংগৃহীত বাঙালী বাহিনীকে নবাবের বিরুদ্ধে লডতে বাধ্য করেছিল।

[ইতিমধ্যে নবাবের এক বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় নবাবের মস্তকে রাজছত্র মেলে ধরেছে। মোহনলাল দূর হতে তা দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। তার ফলে আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। নতুবা একা মোহনলাল ও তাঁর বাঙালী বাহিনী ক্লাইভকে হটাতে পারতেন।]

এই যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন! এটাই প্রমাণ করে যে উভয়পক্ষেই বাঙালী-সৈন্য সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাবরের আত্মজীবনীতে তাঁর বাঙালী ভূঁইঞা-দের অধীন বাঙালীসৈন্য-সম্পর্কিত উক্তি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সেকালে দিগ্বিজয়ী-গণের বাঙালী নৌ-সৈন্যভীতি রঘুবংশ কাব্যেও উল্লিখিত। বাঙালীদের এই বীরত্ব দেখে ক্লাইভ একটি স্থায়ী বাঙালী-বাহিনী গঠন করলেও পরে সম্ভবত তা ভেঙে দেওয়া হয়। দৃষ্টতঃ স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের সৈন্যদলে রাখার বিপদ তারা বুঝেছিলেন।

[পরবর্তীকালে ইংরাজরা সেনা ও পুলিশ-বাহিনীর নিম্নপদে বাঙালীদের ভর্তি করতে দ্বিধা করতেন। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ, পাইক-বিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহ দ্বারা বাঙালীরা পলাশীযুদ্ধের ভুল কিছুটা শুধরে নিয়েছিল।]

রাজা নবকৃষ্ণ চাতুর্যের সঙ্গে মোগল-সম্রাটের দস্তখতের জন্য সুবা বাংলার দেওয়ানীর দলিলপত্র ইংরাজপক্ষে সুবিধাজনক শর্তে মুসাবিদা করেন। ভারতের অন্য রাজশক্তির সঙ্গে সন্ধিপত্রেরও তিনি সুবিধাজনক মুসাবিদা করে দেন। পরবর্তী নবাবের সঙ্গে

চুক্তিপত্রেও ইংরাজদের সুবিধামতো মুসাবিদা করেন তিনি। ক্লাইভ এজন্য তাঁকে তাঁর প্রধান দেওয়ান করে নেন।

রাজা নবকৃষ্ণের সঙ্গে ক্লাইভের সম্পর্ক কিছুটা চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চাণক্যের মতো। কিন্তু পরবর্তী ইংরাজরা তাঁর প্রতি আশানুরূপ সুবিচার করেন নি। ১৭৬৭ খ্রী. গভর্নর হ্যারি ভেরলেস্ট-এর নিকট ১৭৭৭ খ্রী. বাংলার রেভেনিউ কাউন্সিলে প্রেরিত নবকৃষ্ণের নিম্নোক্ত দরখাস্ত তা প্রমাণ করে।

"কলিকাতা অধিকার ও তৎপর সিরাজদ্দৌলার যে পরাজয়-ব্যাপার সংগঠিত হয় তাহাতে এই আবেদনকারী মাননীয় লর্ড ক্লাইভের [তৎকালে কর্নেল] অধীনে অনেক কার্য করিয়াছিল। সেই সময় আবেদনকারী [নবকৃষ্ণ] খাস-মুন্সীও অনুবাদকরূপে কার্য এবং যাবতীয় গোপনীয় কার্য করিয়াছিল।"

লর্ড ক্লাইভ পূর্বের মতো বিচার ও পুলিশ শহরে নবাবের এবং গ্রামে জমিদার-শাসকদের অধীনে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। স্থানীয় জমিনদার-শাসকদের এবং নবাবের শাসনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা তাঁর নিষেধ ছিল। কলিকাতাতে বহু অন্যায় কর-গ্রহণ তিনি বন্ধ কবে দেন। ইংরাজ বাদে, কলিকাতাতে কিছু কর মাত্র দেশীয়দের ও আর্মেনীয়দের দিতে হতো। জিজিয়ার অনুরূপ সাম্প্রদায়িক কর তাঁর দ্বারা রহিত হয়। অন্য বিষযে ক্লাইভ একজন জনদবদী সুশাসক ছিলেন।

[বি. দ্র.] বণিক-সভার প্রেসিডেণ্ট ভেরলেস্ট কলকাতার বেশ্যানারীদের উপর মৌর্যদের মতো কর ধার্য করেছিলেন। কিন্তু মৌর্যদের মতো তাদের সুখ-দুঃখ আদৌ দেখা হয় নি! ক্লাইভ অন্যায় বুঝে এই কর রহিত করেন।

মুন্সী নবকৃষ্ণ [পরে মহারাজা] কলকাতার প্রজা। তিনি বিশ্বাসঘাতক বা রাজদ্রোহী নন। রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং মীরজাফরও তা নন। শস্ত্রদ্বারা শাসক বদল পুরানো প্রথা। কিন্তু—[চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, নেহেরু, প্যাটেলের মতো] রাজনীতি দ্বারা ওরূপ প্রচেষ্টা তাঁরাই প্রবর্তন করেন। ছত্রপতি শিবাজী আধুনিক গেরিলা-যুদ্ধের এবং তাঁরা আধুনিক রাজনীতির প্রবর্তক। এই কাজ করতে নেতাজীর মতো তাঁরাও বিদেশীদের সাহায্য নেন। জাপানীরা ভারতে এলে না-ও ফিরে যেতে পারতো। ক্লাইভকে তাঁরা কেউ গদীতে বসাতে চান নি। নিজেদেরও মসনদ লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। নবাববংশের কাউকে তাদের নবাব করার ইচ্ছা ছিল। মীরজাফর ভাগ্যান্বেষী বিদেশী সৈনিক। তাঁর দেশপ্রেমের প্রশ্ন ওঠে না। আলিবর্দী নিজেও তাই ছিলেন। তিনি পুরনো নবাব-বংশের উচ্ছেদক। রাজদ্রোহী কাউকে এখানে বলা যায় না। সেকালে রানী ভবানীর কন্যা ও জগৎশেঠের পুত্রবধূও নিরাপদ ছিলেন না। সাধারণ হিন্দু এবং দেশীয় মুসলিমের অবস্থা অনুমেয়। ব্রিটিশ হতে কিছু পরে

স্বাধীন হলেও চলতো। তখন স্বাধীনতার জন্য একটি দিনও অপেক্ষা করা যায় নি। তাঁদের দায়ী না করে বরং বাদশাহের উপঢৌকন গ্রহণ ও ফরমান দানগুলিকে এবং পরবর্তী নবাবদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতাকেই এ-বিষয়ে দায়ী করা উচিত।

[রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রানী ভবানী না থাকলেও তাঁদের জীবনের আদর্শ অম্লান ছিল। সেদিনের স্বাধীনতা-লাভের ব্যর্থ-প্রয়াস বাঙালীদের রক্তের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। তাই ইংরাজ সরকার-বিরোধী কোনও বিক্ষোভে বাঙালী তরুণদের অভাব হতো না। কিন্তু, ইংরাজদের সাহায্য করে তাদের নবাবের বিরুদ্ধে এগিয়ে না দিয়ে, ইংরাজদের সাহায্যে নিজেদের নবাব-বদলের জন্য এগোনো উচিত ছিল।

প্রশ্ন উঠবে, ইংরাজদের বদলে এঁরা মারাঠা এবং মগদের সাহায্য নেন নি কেন? শিবাজীর আদর্শভ্রষ্ট বর্গীর দল এবং লুঠেরা মগ ও পর্তুগীজরা তখন বাংলার একাংশ শ্মশানে পরিণত করেছে। এদের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধরত থেকে বাঙালী জমিনদার-শাসকরা তখন ক্লান্ত। তাদের উপর আস্থা রাখা সম্ভব হলে বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস অন্যরূপে লেখা হতো।]

[বি. দ্র.] ভারতের দেশীয় রাজাদের বাহিনীতে বিদেশী সেনানায়ক গ্রহণ বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়েছিল। উহা কিছু বিষয়ে সুবিধাজনক হলেও মন্ত্রগুপ্তির উহা পরিপন্থী হতো।

আকবরের সময় বাংলার কয়জন সামন্ত রাজা যথা: যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাখলার রামচন্দ্র ও শ্রীপুরের কেদার রায় মোগলদের বিরুদ্ধে লড়তে আরাকান রাজাদের মতো জলপথে পর্তুগীজদের সঙ্গে নিয়েছিল। বাঙালীরা পর্তুগীজ দস্যুদের দ্রুতগামী হাল্কা ছিপ-নৌকা চালাতে শেখায়। ওতে তারা মোগলদের ফৌজী ভারী বড় নৌকাগুলি সামান্য ক্ষণেই বিনষ্ট করতো। কিন্তু ঐ সময়কার বাঙালী সামন্তদের মৃত্যুর পর ওই পর্তুগীজ হার্মাদদের পরবর্তী বাঙালী সামন্তরা স্ববশে রাখতে পারে নি। তাতে পর্তুগীজ হার্মাদরা বাঙলার সমুদ্রকূলবর্তীর কিছু স্থান শ্মশানে পরিণত করে।]

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহা দানশীল ও বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁকে বর্তমান বাঙালী সংস্কৃতির স্রষ্টা বলা চলে। তাঁর জয়ন্তী উদযাপন করা উচিত হবে। ফল উল্টো হবে তা তিনি ভাবেন নি। নবকৃষ্ণ পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সরকারী বৃত্তিদান রীতি তাঁর প্রচেষ্টায় হয়। তিনি ও রামবাগানের দত্তবংশের পূর্ব-পুরুষ রামকৃষ্ণ প্রথম ইংরাজী লিখতে ও বলতে শেখেন। নবকৃষ্ণ মন্দিরের মতো গীর্জা ও মসজিদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর সিরাজ-বিরোধিতার অন্য কারণ থাকতে পারে। তবে, সিরাজ সম্বন্ধে রটানো অপবাদ সবগুলি সত্য নয়।

ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য বিষয়ে বাদশাহদের অপেক্ষা তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল।

মীরমদন বীর যোদ্ধা। মোহনলাল তাঁর চাইতে আরও বড় যোদ্ধা ও বীর। একথা ঠিক। কিন্তু, মোহনলালের লড়াই করার অন্য কারণও হয়তো ছিল। নবাবের হত্যার পর রচিত ও গীত নিম্নোক্ত গানটি এই সম্পর্কে বিবেচ্য।

'নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে
আর কাঁদে হাতী,
কলকাতাতে বসে কাঁদে
মোহনলালের বেটী।—'

উপরোক্ত রাজনৈতিক পটভূমিকা কলকাতা-পুলিশকে প্রভাবিত করেছিল। কলকাতা থেকে ইংরাজদের পলায়নের পর প্রশাসনিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কলকাতা-পুলিশ নিজেরাই শাসনভার গ্রহণ করে সেই শূন্যতা পূরণ করে। সেই অগ্নিপরীক্ষায় কলকাতা-পুলিশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়।

হলওয়েল চলে যাবার পর গোবিন্দরামও বিদায় নিয়েছিলেন। বণিক-কাউন্সিলের অন্যায় ট্যাক্স ধার্য তাঁর পছন্দ হয় নি। এঁদের পর মাত্র একজন দেওয়ানবিহীন ইংরাজ জমিনদার ছিলেন। ভদ্রলোক মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল ইংরাজ জমিনদার। কলকাতা-পুলিশ পূর্বব্যবস্থা মতো তখনও পর্যন্ত এঁরই অধীন। দেওয়ান গোবিন্দরাম-সহ তাঁর নায়েব-দেওয়ানদের বিদায় দেওয়া হয়েছিল। দেশীয়দের বিচার তখনও জমিনদারের আদালতেই হতো। তিনি দেশীয় দেওয়ানের পরিবর্তে নিজেই জমিনদারী আদালতের বিচারক। এই ভদ্রলোক একদা বাদী-প্রতিবাদী উভয়কেই পাদুকা প্রহার করে বসলেন।

কলকাতায় বাঙালী তখন সদ্য পরাধীন হলেও প্রতিবাদে সক্ষম। বাঙালী লাঠি গুলি সহ্য করতে পারে, কিন্তু পাদুকা-প্রহার তাদের জাতীয় অপমান। অতএব নগরবাসী ও কলকাতা-পুলিশ একযোগে অভিযোগে মুখর হলো। সর্বত্র ঘোরতর প্রতিবাদ সৃষ্টি হলো। এই অবস্থায় লর্ড ক্লাইভের নবনিযুক্ত প্রধান দেওয়ান মহারাজা নবকৃষ্ণের উপদেশে ক্লাইভ তাঁকে অপসৃত করলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ

পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর দেওয়ান বাবু গোবিন্দরাম বিদায় নিলে ক্লাইভ রাজা নবকৃষ্ণকে তাঁর প্রধান দেওয়ান করে তাঁকেই কার্যত বাংলা-সহ ব্রিটিশ-ভারতের প্রশাসকরূপে ক্ষমতাদান করলেন।

পলাশীর যুদ্ধের অবসানে পলাতক ইংরাজ মেয়র ও অলডারম্যানরা ফিরে এলে কল-

কাতার পুলিশের থানাগুলির অধীন বিকেন্দ্রিত পৌরসংস্থাগুলি একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান করা হয়েছিল। সেটাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান কলকাতা-কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়। এই ইংরাজ মেয়র ও অলডারম্যানগণ প্রধান দেওয়ান নবকৃষ্ণের অধীনে কলকাতা-পৌরপ্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন।

এই পৌরপ্রতিষ্ঠানের তিনটি শাখা তথা অঙ্গস্বরূপ (১) মিউনিসিপ্যালিটি (২) কলকাতা পুলিশ এবং (৩) [বিচার কার্যের] আদালতকে কলকাতার ঐ ইংরাজ মেয়রের অধীন করা হলো। সর্বোপরি সমগ্র প্রদেশের মূল-প্রশাসকরূপে থাকলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। ক্লাইভ উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিদের ক্ষমতা দিতে যেমন কার্পণ্য করেন নি, তেমনি ইংরাজগণও দেশীয় প্রধানের অধীনে বহাল হতে হীনতাবোধ করতেন না।

রাজা নবকৃষ্ণ 'কলকাতা-জমিনদার' পদটির বিলোপ-সাধন করে রাজস্ব আদায় ও তা নির্ধারণের জন্য কলকাতার কলেক্টর পদ এবং বিচার ও পুলিশের [একত্রে] তদারকীর জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টি করলেন। এঁরা সকলেই ঐ সময় কলকাতার নবকৃষ্ণের নিম্ন পদকর্মী মেয়রের অধীন হলেন।

রাজা নবকৃষ্ণকে কলকাতা শহর-সহ ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানগুলিরও তদারকি করতে হতো। বস্তুত পক্ষে, তাঁর বুদ্ধি প্রাজ্ঞতা বিটিশ-শক্তিকে এদেশে কায়েমী হতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তবুও আশ্চর্য এই যে পরবর্তী গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে তাঁর তেজস্বিতার জন্য অপসারিত করেছিলেন।

ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর, ১৭৭১ খ্রী. হেস্টিংস মাদ্রাজ হতে কলকাতায় এসে গভর্নর হলেন। লণ্ডনের ডিরেক্টরগণ সুবা-বাংলার শাসনভার তাঁকে স্বহস্তে গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। ক্লাইভ সুবা-বাংলার [১] দেওয়ানী পেলেও পুলিশ ও বিচারের ভার গ্রামাঞ্চলে জমিনদার-শাসক এবং শহরাঞ্চলে নবাব ও ফৌজদারদের অধীন রাখেন।

হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ হতে যাবতীয় অফিস ও বিচারালয় কলকাতায় আনেন। তিনি মফস্বলে জেলা-সদরগুলিতে জেলা-অফিসরদের অধীনে একটি করে জেলা-আদালত স্থাপন করলেন। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র শহরগুলি বাদে প্রদেশের অভ্যন্তরে জমিনদারদের বিচার, পুলিশ ও শাসন থেকে যায়। কতিপয় সুবিধাবাদীদের বাদ দিলে জনগণ ইংরাজদের জেলা-আদালতে সাধারণত বিচারপ্রার্থী হতেন না।

১ সুবা বাংলা অর্থে বাংলা, বিহার, ওাড়শা ও ছোটনাগপুর এই চারটিকে নিয়ে তখন সুবা-বাংলা নামে একটিমাত্র প্রদেশ। অবশ্য ওড়িশা বলতে তখন মেদনীপুর ও ওড়িশার সামান্য অংশ বোঝাতো। আসল ওড়িশা বহুকাল মারাঠা শাসকদের অধীন ছিল।

১৭৭২ খ্রী. ওয়ারেন হেস্টিংস ও কলকাতার সদর-দেয়ানী আদালত নামে একটি চরম বিচারালয় স্থাপন করে মফস্বলের জেলা-আদালতগুলিকে তার অধীন করেন। তিনি কার্যত মুর্শিদাবাদের বদলে কলকাতাকে বঙ্গের রাজধানী করলেন।

কলকাতা বাংলার ষষ্ঠ রাজধানী। প্রথম, গৌড় [খ্রী. পূ ৮০০-১৫৩৯ খ্রী.]; দ্বিতীয় [বিকল্প রাজধানী নবদ্বীপ] তৃতীয়, রাজমহল [১৫৩৯-১৬০৮ খ্রী.]; চতুর্থ, ঢাকা [১৬০৮-১৭০৮ খ্রী.]; পঞ্চম, মুর্শিদাবাদ [১৭০৮-১৭৭২ খ্রী.] ও ষষ্ঠ, কলকাতা [১৭৭২ খ্রী. হতে]।

১৭৭৩ খ্রী. ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে 'ইণ্ডিয়ান রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান-কর্তাকে গভর্নর-পদ হতে উন্নীত করে ভারতের ব্রিটিশ-অধিকারের গভর্নর-জেনারেল করা হয়। কলকাতা ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী হলো। উহাতে কলকাতা-পুলিশ তখন রাজধানীর পুলিশ হয়।

ওই একই আইনে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন সহকারী জজসহ সুপ্রীম কোর্ট কলকাতায় স্থাপিত হলো। কলকাতার আদালতগুলিকে সুপ্রীম কোর্টের অধীন করা হয়। মফস্বলের ইংরাজ আদালতগুলি পূর্বের মতো হেস্টিংস স্থাপিত সদর দেওয়ানী আদালতের অধীনেই রইল।

পরে সদর দেওয়ানী আদালতের ও সুপ্রীম কোর্টের অধিকার সম্পর্কে বিবাদ শুরু হয়। পরে কলকাতার উপর এবং প্রদেশের উপর যথাক্রমে সুপ্রীম কোর্টের ও সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকার বর্তায়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে-কে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি করা হলো। উভয় আদালতই ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার করতেন এবং তৎঅধীন নিম্ন-আদালতগুলির আপিলও শুনতেন।

[পরবর্তীকালে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত একসঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮৬২ খ্রী. কলকাতা হাইকোর্টের সৃষ্টি করে। সুপ্রীম কোর্টেরও সদর দেওয়ানী কোর্টের তৎকালীন এলাকা যথাক্রমে তার অরিজিন্যাল ও এ্যাপিলেট এলাকা।]

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল এবং ভেরলেস্ট সুবা-বাংলার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হলেন। এঁরা উভয়ে একত্রে বহু বিষয়ে বাংলার জনগণের বহু অধিকার হরণ করেন। এই দুইজন আরও বহুবিধ জঘন্য উৎপীড়নের কারণ হয়েছিলেন।

কোম্পানীর এজেণ্টদ্বয় জব চার্নক ও গুলড্‌সবরো, বণিক-সভার প্রেসিডেণ্ট বনবওয়ার্ড এবং গভর্নরগণ, যথা, হজেস, ক্রেগ, ভ্যানসিটার্ট ড্রেক, ক্লাইভ, হেস্টিংস ও ভেরলেস্ট পর-পর কলকাতায় লীলা করেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত গভর্নর ভেরলেস্ট প্রকৃত পক্ষে বাঙলার প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ শুরু

করেন। এঁরা প্রথমে বাঙালীর জাতীয় বিচার-সংস্থাগুলির বিলোপ চাইলেন।
১৭৭৫ খ্রী. ডিসেম্বর মাস বাংলার পুলিশী ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কাল। এই সময় হেস্টিংস গভর্নর জেনালের রূপে এবং তাঁর অধীনে ভেরলেস্ট বাঙলার গভর্নর রূপে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখ্য ব্যবস্থা নিলেন। ঐ সকল কু-কার্যের মধ্যে (১) বিচার বিলোপ (২) বেগম নির্যাতন (৩) নন্দকুমার বধ এবং (৪) ডাকাত বিক্রয় অন্যতম।

বিচার-বিলোপ

এঁরা উভয়ে বাংলার নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা প্রথমে ভাঙতে চাইলেন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পর ইংরাজরা কলকাতার জমিনদার এবং তাঁর দেওয়ানের পদও তাঁদের আদালত রহিত করেন। কলকাতাতে জমিনদারের স্থলে কর আদায়ের জন্য ইংরাজ-কলেক্টর নিযুক্ত হলো। শহরের দারোগার পদ কয়টি [একাধারে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার] বাতিল হলো।
থানাদার, চৌকিদারগণ, পাইকবরকন্দাজ তখনও পূর্বানুরূপ ছিল। তবে—কলকাতা-পুলিশকে কলকাতার আদালতকে দেওয়ানের পরিবর্তে মেয়রের অধীন করা হয়। এই কলকাতা পুলিশ এবং আদালত ও কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি একই প্রধানের অধীন হলো।
কলকাতার দেওয়ানের আদালত বিলুপ্ত হওয়ায় দেশীয় ব্যক্তিদের বিচার মেয়র-কোর্টে হতে থাকে। পরে—মফস্বলের দেশীয়দের বিচারালয়গুলিও শনৈঃ শনৈঃ অধিগৃহীত হয়।
এ সম্বন্ধে বাংলার গভর্নর ভেরলেস্ট সাহেবের [১৭৬৭—১৭৬৯ খ্রী.] আদেশটি উল্লেখ্য। এই আদেশ দ্বারা তাঁর দেশীয়দের নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা রহিতের প্রচেষ্টা। আদেশের ইংরাজী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ঐ আদেশের বাঙলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।
"শহরের হিন্দু ও মুস্লিম বিচারকগণ ও শহর কাজীদের এবং গ্রামাঞ্চলের বিচারক ব্রাহ্মণরা যারা প্রতিটি গ্রামে শহরে গঞ্জে ও বন্দরে হিন্দু ও অন্যদের বিচার করে, তাদের সকলকে মৎসকাশে উপস্থিত হতে শমন পাঠানো হলো। তারা যেন অনতিবিলম্বে তাদের বিচার ক্ষমতার প্রামাণ্য সকল সনদ ও অধিকার-পত্র এবং তৎসহ তাঁরা প্রতিটি মামলা যাহার শুনানী সমাপ্ত বা অর্ধ সমাপ্ত কিংবা নিষ্পত্তি হয়েছে, তাহার যাবতীয় নথিপত্রের অনুলিপি প্রদেশের সদর কাছারিতে পাঠায় ও তা সেখানে জমা দেয়। তৎসহ তারা যেন তৎসম্পর্কিত মাসিক বিবরণ ও প্রতিবেদন মুর্শিদাবাদের সদর দপ্তরে নিয়মিত পাঠাতে থাকে।"

হেস্টিংস ব্রাহ্মণ বিচারক ও কাজীদের জেলা-কোর্টের অধীন করতে চাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্য ম্লেচ্ছদের নিকট জবাবদিহি করতে রাজী নন। তাঁরা একমাত্র নবাব কিংবা জমিদার-শাসকদের নিকট দায়ী থাকবেন। (ফরাসী চন্দন নগরে জজ-পণ্ডিত-রাও ব্রাহ্মণ হতেন।) ব্রাহ্মণদের মতো কাজীরাও একই রকম ফতোয়া দিলেন। এই-জন্য বাঙালীদের নিজস্ব আদালতগুলির ধীরে ধীরে বিলোপ ঘটানো হলো। ওঁদের মধ্যে যাঁরা হেস্টিংসের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন তাঁরাও বিচারকের পদে থাকতে পান নি।

হেস্টিংস বাঙালীদের বিচার-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটালেও বাংলার জমিনদারী পুলিশ অধিগ্রহণে তখনও সাহসী হন নি। ১৭৬৩ খ্রী. লণ্ডনের কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের ডেসপ্যাচে বিপুল জমিনদারী পুলিশের দায়িত্ব নিতে নিষেধ ছিল। কিন্তু শক্তিহীন নবাবদের ও তাঁর ফৌজদারদের অধীনে স্বল্পসংখ্যক ফৌজদারী পুলিশ [নগর-পুলিশ] তিনি অধিগ্রহণ করলেন। ৬ ডিসেম্বর, ১৭৭৫ খ্রী. প্রেসিডিঙে তিনি নিম্নোক্ত আদেশ দিলেন :

"হুগলী, কাটোয়া, মির্জানগর ও বমুনার ফৌজদারী পুলিশকে মহম্মদ রেজা খাঁব অধীন করা হলো। সরকার অধিগৃহীত ২৪ পরগণার স্থানীয় জমিনদার পুলিশ যেন তাঁর অনুগত থাকে। প্রাদশের অন্যান্য স্থানের জমিনদারী পুলিশ পূর্বের মতো সেই-সেই জমিনদারদের অধীন থাকবে।"

[রেজা খাঁকে স্থানীয় জমিনদাররা স্বীকার করেন নি। কোম্পানীকে সেজন্য তিনি অর্থ দিয়েছিলেন। রেজা খাঁকে শীঘ্রই পদত্যাগ করতে হয়। ডিরেক্টরস বোর্ডের অনু-রূপ নির্দেশ থাকাতে জমিনদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এ বিষয়ে রামগড়ের রাজা ও বর্ধমানের রাজা নেতৃত্ব দেন। ধীরে ধীরে ফৌজদারী পুলিশ চতুষ্পার্শ্বের জমিনদারী পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হয়।]

জমিনদারগণ পূর্বে সরাসরি কোম্পানিকে কর প্রদান করতো। অন্য বিষয়ে আইনত তারা নবাব সরকারের অধীন। সমগ্র শাসন কোম্পানির স্বহস্তে গ্রহণ বহু জমিনদার স্বীকার করেন নি। তাঁরা একে ক্লাইভ-কৃত চুক্তির খেলাপ মনে করেন।

মুণ্ডা অধ্যুষিত ছোটনাগপুরে রামগড়ের রাজা এবং বর্ধমানের মহারাজ প্রতিবাদকারী-দের অন্যতম ছিলেন। আলীবর্দীকেও এঁদের নিকট হতে কর আদায়ে বেগ পেতে হতো। এঁদের শক্তিশালী নিজস্ব ফৌজ ও থানাদারী পুলিশ ছিল। তাঁদের পুলিশে তখন সুশিক্ষিত বহু পাইক ও বরকন্দাজ।

প্রথমে মুণ্ডা-রাজাকে [মতান্তরে রাজপুত] দমন করবার জন্যে কলকাতা হতে ব্রিটীশ সৈন্য পাঠানো হয়। সৈন্য দ্বারা দেশ জয় করা গেলেও সেই দেশ শাসন করা যায় না।

সেইজন্য দক্ষ পুলিশদলের প্রয়োজন। সৈন্যদের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের পাইকদের একটি দলকেও সেখানে পাঠানো হয়। এরা মুণ্ডাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ওদের জন্য মুণ্ডাদের উপর সৈন্যদের উৎপাত হয় নি। মুণ্ডাদের নিম্নোক্ত দুটি পুরানো গান বা গাথা ঐ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

এই গান দুটিতে পাইক [পুলিশ] দল ও সৈন্য দলকে পৃথক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। গান দুটি প্রমাণ করে যে পাইকদের নিয়মিত লাঠি ঘোরানো, লাঠিখেলা ও ব্যায়ামাদি করানো হতো। এই গান দুটি মহারাজার পাইক সম্বন্ধেও হতে পারে। পাইক-পুলিশ জনপ্রিয় না হলে ও-রকম গাথারচিত হতো না। গাথাগুলিতে কোথাও পাইকদের নিন্দা করা হয় নি।

'নাশপাতি গাছের সারি জঙ্গাল ছাড়িয়ে
ওই দেখ টাট্টু ঘোড়া আসে উল্লাসে ছুটে—
ওই দূরে রাজার দীঘির পাড়ের ওপারে
রাজার পাইক কত জোরে লাঠি ঘুরিয়ে আসে

ওই দেখ সুন্দর টাট্টু ঘোড়া নাচে ওখানে
খুরের আঘাতে পায়ের নীচে কতো ধুলো ওড়ে—
কত জোরে ঘোরায় লাঠি ওখানে
ধুলোর কুণ্ডলী সবেগে পাইককে ঘেরে।

কলকাতা থেকে নাকি সৈন্যরা আসছে
বলো ঠাকুমা বলো কোথায় তারা থাকবে—
সারঘাটি সাহেবের খ্যাতি আকাশে ভাসছে
বলো ঠাকমা বলো কোথায় তাঁবু বসবে।'

নন্দকুমারের ফাঁসি

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি লর্ড হেস্টিংসের দেশীয় বিচার-বিলোপের পর দ্বিতীয় অপকার্য। ওই মিথ্যা জালিয়াতী মামলা কলকাতা-পুলিশের দ্বারা তদন্ত করানো হয় নি। কারণ মিথ্যা মামলা না-করা কলকাতা-পুলিশের প্রাচীন ঐতিহ্য। হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধু সুপ্রীম-কোর্টের মুখ্য জজ ইম্পের উহা জানা ছিল। মেয়রস কোর্ট আদি নিম্ন-আদালতে ওই মামলা দায়ের করা হয় নি। মামলাটি সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে বিচারার্থে

গ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ। উপরন্তু ব্রিটিশ-অধিকার ও বিলাতী আইন প্রবর্তনের পূর্বে এই মামলার উৎপত্তি। এ-সম্পর্কে জুরিসডিকসনের প্রশ্ন আদালতে ওঠা উচিত। সেই-কালে কলকাতায় মাত্র এ দেশীয় আইন প্রচলিত ছিল। দেশীয় আইনে দলিল-জাল প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়। মহারাজার আম-মোক্তার ও নায়েব থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বয়ং সামান্য সম্পত্তির জাল-দলিল করা বিশ্বাসযোগ্য নয়। জাল নিরূপণার্থে প্রথা-মতো স্থানীয় খোঁজী-গোয়েন্দাদের ডাকা হয় নি।

মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের অপকার্য-সমূহের প্রতিবাদ করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জেলে ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা তাঁর খাদ্য প্রস্তুত করতে দেওয়া হয় নি। সেজন্য সেখানে তিনি শেষ-কয়দিন অনাহারে ছিলেন। ভারতে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক হাঙ্গার স্ট্রাইক করেন। ফাঁসির পূর্বে তিনি অনুরোধ করেন যে তাঁর গায়ত্রী জপ শেষ হলে হস্ত দ্বারা ইসারা করবেন। তারপর যেন তাঁর পায়ের নীচেব তক্তা সরানো হয়। প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলা হয় যে তাঁর হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধা থাকবে। তখন তিনি বলেন যে তাহলে তিনি প্রার্থনার পর পা দিয়ে ইসারা করবেন। ইংরাজ-জেলার তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করায় তাঁকে কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

* Siri paragana hesa supare,
Sdomdoe susuntanae ;
Pakar Pind Raja pondare,
paiki doe khelouditanae.

Sodomdoe susuntanae
Litigae loponge
Paike doe khelouditanae
Notange kuare.

Kalikata telengako rakaplena
Nokare naginako derakeda
Sargbrti sahebko uparlena
Chimaere najiuako basakeda

—The Munda and their Country, 1912 by S. C. Roy.

[বি. দ্র.] মহারাজ নন্দকুমার আমাদের এক পূর্বপুরুষ দেওয়ান নবকৃষ্ণ ঘোষালের বন্ধু ছিলেন। পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল [১৮২০-১৯০৯ খ্রী.] আমা-

দের পরিবারবর্গকে বলেন যে হরিণবাড়ি জেলের সম্মুখে প্রকাশ্যে তাঁর ফাঁসি হয়। ব্রাহ্মণ-রক্তপাতের প্রতিবাদে বহু নাগরিক কলকাতার পাপপুরী ত্যাগ করে। পুরাতন হরিণবাড়ি জেলের ভূমিতেই বর্তমান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধ তৈরি হয়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি চেতলা ব্রিজের নিকট হয় নি। চেতলা ব্রিজ স্থানটি তখন কলকাতার বাইরে অবস্থিত। তাঁর ফাঁসি তৎকালীন কলকাতা শহরের ওই শেষ-সীমানাতে হয়েছিল।

বেগম নির্যাতন

হেস্টিংসের সাহায্যে অযোধ্যার বেগমদের উপর দারুণ অত্যাচার করা হয়। এইরূপ জঘন্য নারী-নির্যাতনের প্রশ্রয় অন্য কোনও গভর্নর-জেনারেল দেন নি। অন্যান্য বহু অভিযানে সৈন্যদের সঙ্গে কলকাতা-পুলিশের কিছু পাইক পাঠানো হতো। কিন্তু সেই কালে কলকাতা-পুলিশের পাইকদের ব্যবহার করা হয় নি। তিনি জানতেন যে কলকাতা-পুলিশ-পাইকরা তা প্রতিরোধ করবে। ওই-সব কুকাজ গোরাসৈন্য ও বেগমদের আত্মীয় দ্বারা করানো হয়। বেগমদের বহু ধনসম্পত্তি ও দৌলত তাঁরা অধিকার করেন।

হেস্টিংস, অধিকন্তু, নাটোরের রানী ভবানী এবং বর্ধমানের মহা-রাজার প্রাসাদ লুঠ করেও সেই-সব সম্পদ ব্যক্তিগত ব্যবহারে লাগিয়েছিলেন।

[কলকাতায় হেস্টিংস থানা নামে একটি থানা আছে। হিন্দিভাষী সিপাহীরা তাকে 'লালকিন থানা' বলে। আমার মতে, এই থানার নাম পরিবর্তন করে 'লালকিন থানা' রাখাই উচিত। হেস্টিংস কলকাতা ও বাংলা-পুলিশের প্রতি খুশী ছিলেন না।]

করদানে অপারগ বাঙালী পরিবারের নারীদের উপরও হেস্টিংস অত্যাচার করতেন। হেস্টিংসের ইমপিচমেণ্ট-কালে নারীদের বক্ষ নিপীড়নের জন্য উদ্ভাবিত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় প্রদর্শিত হয়েছিল। হেস্টিংস ক্লাইবের মতো সুবিবেচক ও দেশীয়দের প্রতি মমতাপূর্ণ শাসক নন। অথচ ক্লাইভকেই এদেশে হেস্টিংস-এর বদলে দুর্বৃত্তরূপে চিহ্নিত করা হয়।

যুদ্ধে জয়লাভও স্বদেশের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনে ক্লাইভ নীতিবোধহীন। কিন্তু অন্য বিষয়ে ক্লাইভ একজন সৎ ও দরদী শাসক।

১৭৫৭ খ্রী. ডিসেম্বর হেস্টিংস চব্বিশ পরগণা জেলার জমিনদারী স্বত্ব গ্রহণ করে কোম্পানিকে তার জমিনদার করলেন। ফলে—চব্বিশ পরগণার স্থানীয় জমিনদারী পুলিশগুলি তাঁদের অধীন হলো। সমগ্র জেলার শাসন ভার জমিনদারদের বদলে একজন ইংরাজ-ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পিত হলো। উনি একাধারে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের ও

জিলা-পুলিশের কর্তা হলেন। (পরে—কলকাতার জন্তও একজন পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়)

[জঙ্গলাকীর্ণ চব্বিশ পরগণাতে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিনদার। বড় বড জমিনদারদের মতো তাদের পুলিশ-ব্যবস্থা বৃহৎ ও জটিল নয়। প্রচুর অর্থ দ্বারা তাদের বশীভূত করা হলো। আমাদের পূর্বপুরুষরা তখন জমিনদার ছিলেন। বাংলা দেশের কলকাতার পরেই চব্বিশ পরগণা স্বাধিকার হারায়।]

[বি. দ্র.] চব্বিশ পরগণার শাসন ভার গ্রহণ করে ইংরাজ-ম্যাজিস্ট্রেট দারোগার পদগুলি (যা একত্রে হাকিম ও পুলিশকর্তা) বিলুপ্ত করলেন। (এই সময়ে কলকাতাতেও তাই করা হলো।) থানাদারী ও গ্রামীণ পুলিশের ভার ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং নিলেন। কিন্তু থানার থানাদার ও পাইক আদির সংগঠনের অদল-বদল করা হয় নি। গ্রামীণ পুলিশের চৌকিদার ও দফাদাররা, ঘাটিয়ালরা বাদে, যথাযথ থাকে। কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য হরণ করে থানাদারদের অধীন করা হয়। কলকাতার শহরতলি অংশকে কলকাতা হতে বিচ্ছিন্ন করে চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

ফলে, সমগ্র বাংলায় তখন তিনটি পুলিশী সংস্থা হয়, ১৭৫৭ খ্রী.। যথা (১) কলকাতা পুলিশ (২) চব্বিশ পরগণা পুলিশ (৩) জমিনদারী পুলিশ [বাংলার বাকী অংশে]। প্রথমটি হতে বর্তমান কলকাতা-পুলিশের সৃষ্টি। সমগ্র জমিনদার-পুলিশ অধিগৃহীত হলে চব্বিশ পরগণা-পুলিশ বাংলা-পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাংলাদেশে তখন কলকাতা-পুলিশ ও বাংলা-পুলিশ নামে দুটি মাত্র পুলিশ হলো।

ব্রিটিশদের চব্বিশ পরগণা অধিগ্রহণ ব্যাপারটি বংশানুক্রম আদর্শবান ডাকাতদের পছন্দ হয় নি। জঙ্গলে জলাতে অরণ্যে এরা গরিলা যুদ্ধে পটু। বিদেশী শাসকদের চিরবৈরী এই শ্রেণীর ডাকাতরা কলকাতার উপকণ্ঠে হানা দিতে থাকে। ব্রিটিশদের খাজনার গাড়িও এরা লুঠ করে। বহু সাধারণ অপরাধী ডাকাতরাও এদের সঙ্গে যোগ দেয়।

জমিদারদের একদা গরিলা-সৈন্য এই ডাকাতদের এবং নিজস্ব পূর্বতন পাইকদের সাহায্যে কিছু জমিনদার জেলার অভ্যন্তরভাগে নিজেদের বিচার ও পুলিশ কিছুকাল অক্ষুণ্ণ রাখেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে বহু চেষ্টায় এঁদের অধীন করা হয়।

ডাকাত বিক্রয়

পাইকদল, নিজস্ব ফৌজ ও ডাকাতদল দ্বারা জমিনদারগণ বাংলার বাকি অংশে তখনও শক্তিশালী। পর্তুগীজ, ফরাসী ও অন্যান্য শক্তি তাঁদের সাহায্য করতে উন্মুখ। তাই হেস্টিংস সর্বপ্রথম এই ডাকাতদের নির্মূল করতে আগ্রহী হলেন।

ডাকাতদের দমন করবার জন্য কলকাতা-পুলিশকে কলকাতা শহরের সীমানার চতু-র্দিকে কুড়ি মাইল পর্যন্ত ভূখণ্ডের উপর অধিকার দেওয়া হয়। তারা ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার ও গৃহতল্লাসীর জন্য চব্বিশ পরগণার অভ্যন্তরে কুড়ি মাইল পর্যন্ত যেতে পারতো। সদ্যগৃহীত চব্বিশ পরগণার পুলিশের থানাগুলির পাইকদের উপর কর্তৃপক্ষ নির্ভরশীল ছিলেন না।

গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিবেদনগুলি থেকে অবস্থার গুরুত্ব বোঝা যায়। এই প্রতিবেদনের মূল ইংরাজি অনুলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।

ইহার বাংলা তর্জমাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"ঐ শ্রেণীর ডাকাতরা একটি বংশানুক্রম দস্যু সম্প্রদায়। (Out law) এদের চিরা-চরিত স্বভাব মতো এরা গর্ভমেণ্ট সহ প্রত্যেকের সহিত সদাসর্বদা যুদ্ধরত। ডাকাতি হত্যাকাণ্ড সহ সমাধা না হলে এদেশের মুস্লিম ও অন্য হাকিমরা এদের প্রাণদণ্ড দেন না। জমিনদারদের প্রশ্রয় পুষ্ট এই ডাকাতদের নবাবরাও ভয় করেছে। যেরূপেই হোক ওদের আমাদের দমন করতে হবে।"

ফাঁসি দেওয়া ইংরাজদের মজ্জাগত স্বভাব। আইনের মর্যাদা ও আদর্শের বদলে উহার ওয়াডিঙ তথা ভাষা নিয়ে ওদের মাতামাতি। জাল করার অপরাধেও ওরা ফাঁসি দেয়। এদেশে লঘুপাপে গুরু দণ্ডের রীতি নেই। সম্প্রতি সভ্য হওয়া ইংরাজদের উহা বোধগম্য নয়।

"আমার (লর্ড হেস্টিংসের) নিশ্চিত সংবাদ এই যে বহু গ্রামবাসী এই শ্রেণীর ডাকাত-দের নেতাদের নিয়মিত মাল গুজরানী দেয়। উহা হতে মুক্ত হলে রায়তরা ঐ অর্থ কোম্পানীকে দিত। ফলে ওতে আমাদের যথেষ্ট আয় ও মুনাফা হতো! গ্রামবাসীও জমিনদারদের সঙ্গে এদের যোগ-সাজস আছে এরা নিজেরা কর্মকারদের দ্বারা বন্দুক ও অন্য অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম। জমিনদারদের অজুহাত এই যে এই শ্রেণীর ডাকাত-দের হুকুম দেবার কোনও এক্তিয়ার তাদের নেই। উস্কানিদাতা জমিনদাররা ওই অজুহাতে দায়িত্ব এড়ায়।"

এই ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে দাস (Slave) রূপে বিক্রয় করলে কোম্পানীর আয় বাড়বে ফোর্ট মাবলাবরীতে কোম্পানীর উপনিবেশে এদের পাঠানো হোক। গর্ভমেণ্ট তরফে ঐ সম্পর্কে আশু নির্দেশ পাঠানো হলো। কারাগার ও উহা রক্ষার্থে রক্ষী নিয়োগে বহু খরচ। ডাকাতদের দাস রূপে বিক্রয় করলে কোম্পানীর বহু অর্থলাভ। ডাকাতদের দৌরাত্ম্য ও অশান্তি চললে উহা হতে মুনাফা তোলা যাবে।"

এই আদর্শবান ডাকাতদের উৎপাত বহুদিন চলে। সমগ্র বাঙালী জনগণ এদের পিছনে ছিল। তার ফলে ভারতের অন্যত্র অভিযানে ইংরাজদের বিলম্ব হয়। এদের সঙ্গে

ক্রিমিন্যাল ডাকাতরা ও চব্বিশ পরগণার বরখাস্ত জমিনদারী-পাইকরাও যোগ দেন। *
ডাকাত-বিক্রয় ব্যবসায়ে কলকাতা-পুলিশের একজন সদস্যও কোম্পানীকে সাহায্য করে নি। হেস্টিংস সে জন্য চটে যান এবং তাঁদের অপদার্থ বলেন। কলকাতা-পুলিশকে নতুন করে গড়তে তিনি সাহসী হন নি। কিন্তু এ-সম্পর্কে পরবর্তীদের জন্য কিছু নোট রাখেন। মানুষ বিক্রয় দেশীয়দের ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিরোধী ছিল।

সুবা-বাংলার দেশীয় বিচার-ব্যবস্থার বিলোপ, চব্বিশ পরগণার জমিনদারী পুলিশ অধিগ্রহণ এবং জনদরদী আদর্শবান ডাকাত বিক্রয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা দেশে ঘৃণিত হয়ে ওঠেন। তৎকালে রচিত নিম্নোক্ত গানটি তার সাক্ষ্য দেয়।

'হাতীমে হাওদা ঘোড়ীমে জিন—
জলদি ভাগো ওয়ারিন হেস্টিন।'

ওয়ারেন হেস্টিংস অন্য একটি অপকার্যও করেছিলেন। পূর্বে কলকাতায় য়ুরোপীয় ও দেশীয়রা কম বেশি একত্রে বাস করতো। সেজন্য তাদের মধ্যে কিছুটা প্রতিবেশী-সুলভ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিভেদপন্থী হেস্টিংস য়ুরোপীয় এবং দেশীয়দের পল্লী পৃথক করলেন। এই কাজে দেশীয়দের শহরের অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে উনি রাজী করান। কলকাতাকে হোয়াইট ক্যালকাটা ও ব্ল্যাক ক্যালকাটাতে বিভক্ত করা হলো। হেস্টিংস শহরের ভারতীয় ও য়ুরোপীয় অংশকে সর্বপ্রথম একত্রিশটি ওয়ার্ডে ভাগ করলেন। সেই থেকে কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ডের সৃষ্টি। (পরে, প্রতিটি ওয়ার্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শহরে থানার সংখ্যা বর্ধিত করে একত্রিশটি থানা স্থাপিত হলো।) গোবিন্দরাম পুলিশকে বেশি ক্ষমতা প্রদান করেন নি। কিন্তু হেস্টিংস কলকাতা-পুলিশের ক্ষমতা বাড়ান। দেশীয়দের মনে পুলিশ-ভীতি আনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পূর্বে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নিতে হতো।

১৭৮৭ খ্রী. হেস্টিংসের স্থলে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতের গভর্নর-জেনারেল হয়ে

এই তথ্যগুলি য়ুরোপীয় সিভিলিয়ানদের দ্বারা লিখিত তথ্য হতে সংকলিত। তৎকালীন ইংরাজ-সরকার ওই পুস্তকগুলির মুদ্রক ও প্রকাশক। একটি পুস্তকের নাম : মেটিরিয়ালস্ ফব্ দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল পুলিশ। বর্তমানে তার একখানি মাত্র কপি রাইটার্স বিল্ডিঙ-এর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। কর্মরত থাকাকালীন আমি ওটি যেজখানা হতে উদ্ধার করে ওখানে রাখি। এ সম্পর্কে সিভিলিয়ান ডেল সাহেবের পুরানো সরকারী ফাইল হতে সংগৃহীত তথ্যসমূহও দ্র.। উক্ত পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রিত না হলে ইতিহাসের অমূল্য সম্পত্তি হারিয়ে যাবে।

১৮৪৬ খ্রীঃ কলকাতা-পুলিশের যুনিফর্ম-পরিহিত একটি পাইকের ফটোচিত্র আমি কমিশনারের পুরানো বাসভবন থেকে উদ্ধার করি। অন্যত্র শাজাহানের একটি পাঞ্জাও আমি পাই। ১৯৩৮ খ্রীঃ মৎ সম্পাদিত ও স্থাপিত প্রথম কলকাতা-পুলিশ জার্নালে ওই ফটোচিত্র মুদ্রিত হয়।

কলকাতায় এলেন। তিনি কর্মভার গ্রহণের পর দেখলেন যে হেস্টিংস নিযুক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টররা স্থানীয় জমিনদার-শাসকদের কাছে নতিস্বীকার করে আছেন। (ইংলণ্ডে প্রেরিত ডেসপ্যাচ দ্র.।) ক্লাইভ যা চান নি, হেস্টিংস যা পারেন নি, কর্ন-ওয়ালিস তাই করলেন।

১৭৯৩ খ্রী. কর্নওয়ালিশ-কোড দ্বারা তিনি গ্রামীণ চৌকিদার বাদে জমিনদারী পুলিশ-ব্যবস্থা জমিনদারদের ভেঙে দিতে বললেন। বাংলার জাতীয় পুলিশকে তিনি শনৈঃ শনৈঃ আয়ত্তে এনেছিলেন।

[বি. দ্র.] আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীন জমিনদার-বংশোদ্ভব ছিলেন। রাজা রাম-শংকর ঘোষাল বরিশাল ও চব্বিশ পরগণার কিছু অংশে জমিদারী বৃদ্ধি করেন। ওই সময় পুলিশ ও বিচার ক্ষুদ্র জমিদাররাও রক্ষা করতেন। ব্রিটিশ-আমলের মতো নবাবী-আমলেও আমরা রাজভক্ত। জনৈক পূর্বপুরুষ নবাবের স্থানীয় দেওয়ান ছিলেন। ব্রিটিশ-অধিকারের কালে ট্রেজারির চাবি না বুঝিয়ে তিনি চলে আসেন। ব্রিটিশ-ফৌজ আমাদের সাতমহলা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে, না পায় তাঁকে, না পায় ট্রেজারির চাবি। পরে আমাদের পরিবার ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে নেয়। এইজন্য চব্বিশ পরগণার জমিদারীগুলি ও তাঁদের পুলিশ অধিগ্রহণকালে অন্য জমিদারদের মতে সেই কাজে বাধা না দিয়ে তাঁরা তাতে ইংরাজদের সাহায্যই করেন। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। লোকে ভুল করে আমাদের সুবিধাবাদী বলেছিল। সেদিন আমাদের পূর্বপুরুষগণ কল্পনাও করেন নি যে একদিন আমাদের মতো রাজভক্ত পরিবারগুলিকে ডুবিয়ে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে চলে যাবে। প্রতিদানে ব্রিটিশরা পুরুষানুক্রমে আমাদের খেতাব দিয়েছেন ও উচ্চপদে নিয়োগ করেছেন।

শৈশবে পূর্বতন পাইকদের ব্যবহৃত কিছু গাদাবন্দুক ও চকমকি-বন্দুক (পাথর সোলা ট্রিগার) এবং বৃহদাকার ভারী ঢাল, তরবারি ও বর্শা বাড়িতে দেখেছি। তরবারিগুলি এত ভারী যে দু'হাতে তোলাই দুষ্কর ছিল। আমি বুঝতে পারি, প্রাচীন বাঙালী পাইকরা রীতিমতো শক্তিমান ছিল। তাছাড়া, পাইক-সম্পর্কিত বহু নথিপত্রও সেখানে ছিল।

তৎকালীন ইংরাজ-শাসকরা লণ্ডনে প্রেরিত ডেসপ্যাচে জমিনদারী পুলিশের সুখ্যাতি করতেন। তাঁদের মতে এরা দেশীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওগুলি বাতিল না করে তাঁরা গভর্নমেণ্টের নিজস্ব কেন্দ্রীয় ফেডারেল পুলিশ-সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংলণ্ডের প্রথম সংবাদপত্র, 'টাইম'-এর আট বৎসর পূর্বে ১৭৮০ খ্রী. ১৯শে জানুয়ারি বাঙালীদের সাহায্যে কলকাতায় 'হিকির বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। এই

সংবাদপত্রে বহু ব্যক্তির নিন্দা করা হলেও জমিনদারী-পুলিশ ও কলকাতা-পুলিশের নিন্দা ধ্বনিত হয় নি। পরবর্তীকালে এই শহরে আরও বহু ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। সেগুলিতেও জমিনদারী-পুলিশ ও কলকাতা-পুলিশের নিন্দা নেই। কলকাতার সংবাদপত্র-সমূহের স্বাধীনতা ছিল। টিপুর সহিত যুদ্ধ-কালে ও মিউটিনির সময় শুধু তা হরণ করা হয়। পরে লর্ড মেটকাফ সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।* সুতরাং পুলিশের নিন্দায় তাঁদের কোনও বাধা ছিল না।

কর্নওয়ালিশ প্রত্যেক চারশত স্কোয়ার মাইলের জন্য একটি থানা স্থাপন করেন। থানা-গুলির এলাকা বহুগুণ বর্ধিত করা হয়। পূর্বতন দারোগাদের এলাকা এই থানার এলাকায় পরিণত হলো। 'থানাদার, পদ উঠিয়ে তাদের 'দারোগা' করা হলো। পূর্বে দারোগারা থানাদারদের উর্ধ্বতন ছিলেন। গ্রামীণ চৌকিদারদের নতুন দারোগাদের অধীন করা হলো। থানাদার ও ঘটিয়াল-পদ রহিত হয়। কিন্তু পাইক প্রভৃতি অন্য পদগুলি কিছুকাল পূর্বের অনুরূপ থাকে। এদের সকলকে প্রতিটি জেলাতে চব্বিশ পর-গণার মতো জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন করা হয়।

(পূর্বতন দারোগারা একাবারে ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টার ও পুলিশ-সুপার ছিল। পূর্ত-বিভাগ প্রভৃতিও এদের অধীন। বহু স্থানে 'দারোগা-দীঘি' তার প্রমাণ। নায়েব ও গোমস্তার সাহায্যে এরা কর-আদায়কারী। নবনিযুক্ত বেতনভুক দারোগারা মাত্র পূর্বতন থানাদার।)

বংশানুক্রমে স্বত্বভোগী জমিনদার পুলিশের বদলে বেতনভোগী ব্রিটিশ-পুলিশ তৈরি সহজ হয় নি। জমিনদার-পুলিশের অধিগ্রহণে প্রজারা রুষ্ট হয়। কিছু পুলিশ-পদ বংশগত ছিল। এতে অর্থনৈতিক অসুবিধা ঘটে। ওদের ভরণপোষণের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা নেই।

জাতীয় পুলিশকে ভেঙে দেওয়া ব্যাপারটি বাঙালী তাদের স্বাধীনতা হরণের সমতুল মনে করলো। এ জন্যে স্থানে স্থানে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়। বাংলার ছাউর-বিদ্রোহ তার অন্যতম। কলেক্টরী সমূহের পুরানো নথিপত্রে তার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। সেই থেকে স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী ব্রিটিশ-বিদ্বেষী। এতে বহু জমিনদার অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়। তাদের স্থলে নতুন জমিনদার নিযুক্ত হলো।

একতার অভাবে এই (বিচ্ছিন্ন) সমগ্র অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলো বটে। কিন্তু বাংলার জন-সাধারণ ব্রিটিশ অধিকৃত পুলিশ বয়কট করলো। এই নীরব বয়কটের শক্তি ছিল অসীম। শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তি নতুন দারোগা-পদ নেয় না। তারা সমাজের

---

*মেট কাফ এক বক্তৃতায় বলেন যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিলে যদি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বিলোপ হয় তাহলে তা হওয়াই উচিত। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী কার্যে পরিণত হবে তিনি সেদিন তা ভাবেন নি।

অতি ঘৃণ্য হয়ে ওঠে। নিম্নপদগুলিতেও বাঙালী পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই নীরব বয়কট অব্যাহতভাবে চলে। এর পশ্চাতে থাকে সামাজিক শাসন। বাংলাদেশে সমাজ তখনও শক্তিশালী। এই পুলিশ-বয়কট ভারতের প্রথম বয়কট।

বাঙালীদের পুলিশ-বয়কটের শক্তি কর্নেল ক্রশের ইংলণ্ডে প্রেরিত নিম্নোক্ত প্রতিবেদন থেকে বোঝা যাবে :

'পুরানো (ডিসব্যাণ্ডেড) পাইকদল ও বরকন্দাজরা নতুন পুলিশে ভর্তি হতে রাজী নয়। জনগণের কেউই গভর্নমেন্টের নতুন পুলিশে ভর্তি হতে চায় না। বর্ধিত বেতনও বাঙালীরা উচ্চ বা নিম্নপদে ভর্তি হয় না। তাই বাধ্য হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাব প্রদেশ হতে বিদেশীদের বাংলা-পুলিশের জন্য আমদানি করা হচ্ছে। এরা বিদেশী হওয়ায় পুলিশের দক্ষতার মান নিম্নমুখী। এদের সঙ্গে বাঙালীর সহযোগিতা নেই। পূর্বের মতো পুলিশ আর এত দক্ষ নয়।' (মূল ইংরাজী ভাষা পরিশিষ্ট দ্র.)

[বি. দ্র.] এই কালে পাঞ্জাব বিজিত না-হওয়ায় ওই স্থানের লোকদের বিদেশী বলা হয়েছে। বাঙালী বলতে বোঝাতো বাংলা বিহার উড়িশা ও ছোটনাগপুরের অধি-বাসীদের। ওই তিনটি প্রদেশেই পাইক-বরকন্দাজ ভিত্তির একই প্রকার জমিনদারী-পুলিশ। নীরব বয়কটে ভীত হয়ে ব্রিটিশরা বাঙালী ও উড়িয়াদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করতো না। অথচ ব্রিটিশরা এই বাংলা দেশেই, কলকাতায় প্রথম ডোম বাগদি ও ভোজপুরীদের দিয়ে দেশীয় সৈন্যবাহিনী তৈরি করে।

পরে কিছু শিক্ষাহীন ব্যক্তিরা বাঙালী সমাজের ঘৃণা উপেক্ষা করে দারোগার পদ গ্রহণ করে। কিন্তু বাঙালী চাষী ও শিল্পসমাজ হতে নিম্নপদের জন্য পূর্বের মতো লোক পাওয়া দুর্লভ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে অসহযোগিতার এটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

'হাইরা গেল মোগল-পাঠান-
তুই হালা বল্ আইলি কেড্ডা ?
পাইক্যার হৈ নিশান বাজান—
ভাঙ্গাই দিবা তোদের মাজান।
হারামজাদা সামনে বাদা—
মুর্দা তোমার করবো গাদা।'

উপরোক্ত গাথাটি বাল্যকালে আমি শাস্ত ডোম নামে আমাদের এক বয়স্ক প্রজার মুখে শুনেছিলাম। পাইকদের বাদ্য ও নিশানসহ কুচকাওয়াজের ইঙ্গিত এতে আছে। তার কাছে শুনেছি যে তার প্র-পিতামহ অন্য এক জমিদারের অধীনে পাইকের কার্য করতো। এরা বংশানুক্রমে সুদক্ষ লাঠিয়াল ও লড়াকু। কোম্পানীর রাজত্বকালে তাদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত হলে ওরা আমাদের আশ্রয়ে আসে।

"থানাগুলি দূরে দূরে স্থাপিত হওয়ায় জনগণের অসুবিধা হলো। পারতপক্ষে ব্রিটিশ স্থাপিত থানা তারা এড়িয়ে চলে। বরং থানার দারোগারা অকারণে এদের উপর উৎপাত করবে। পুলিশ জনগণের সেবক না হয়ে প্রভু। শাসক নিযুক্ত পুলিশ জনগণের নিয়ন্ত্রণে নেই। পূর্বের মতো এরা জনগণকে সমীহ করে না।"

জনগণ পূর্বে গৃহের নিকটে জমিনদার-আবাসে কিংবা নায়েবদের নিকট আবেদন জানাতো। এখন বহু দূরে ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট তাদের যেতে হয়। তাঁদের ভাষা জনগণ বোঝে না এবং তাদের সাক্ষাৎ পাওয়াও কঠিন। আইনজীবী কিংবা দালালদের সাহায্য অনিবার্য। বিনা-ব্যয়ে আর বিচার পাওয়া যায় না। মামলাগুলি মিটমাটের ব্যবস্থা নেই। তাদের অযথা অর্থ নষ্ট ও মনোকষ্ট।

থানার এলাকা পূর্বে ছোট থাকায় লোকে সত্বর থানদারদের সাহায্য পেত। দূরে অবস্থিত লোভী দাবোগাবা তাদের পাত্তা দেয় না। এরা কেউই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। সহস্র বৎসর পরে বাঙালী সত্যই স্বাধীনতা হারালো।

কর্নওয়ালিস ১৭৮৮ খ্রী. ১৫ই নভেম্বর চব্বিশ পরগণার পুলিশকে এবং ১৭৯৩ খ্রী. অন্য জেলা-পুলিশকে একটি হুকুম পাঠালেন। এই হুকুম দ্বারা তিনি নবনিযুক্ত দেশীয় দারোগাদের এক জঘন্য অপকার্যে নিয়োগ করলেন। তার জন্যই জমিনদারী-পুলিশ অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়। গভর্নর-জেনারেলের আদেশের মূল ইংরাজি অনুলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।

'গ্রামে গঞ্জে শহরে ও বন্দরে সমস্ত জাহাজ ও বড নৌকা নির্মাণ বন্ধ কর। কোনও গ্রামে বডনৌকা (একটি বিশেষ মাপের ঊর্ধ্বে) তৈরি হলে সমগ্র গ্রামটি বাজেয়াপ্ত কর। কোনও কামার ছুতোর বা নকশাকারী (ডিজাইনার) বড়নৌকা তৈরি করতে উদ্যত হলে তাদের বেত্রাঘাত ও কারাগারে নিক্ষেপ কর।'

এইভাবে নতুন দারোগাদের দ্বারা বাঙালীদের জাহাজ শিল্প বিনষ্ট করা হলো। দারোগারা সুদূর গ্রাম হতে জাহাজ-শিল্পীদের খুঁজে বার করতো। পরিবর্তে কলকাতায় গিলবার্ট-সাহেবের এবং টিটাগড়ে অন্য-এক ইংরাজের জাহাজ-শিল্প গড়ে ওঠে। বাঙালীকে এঁদের অধীন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দারোগারা দক্ষ শিল্পীদের বাছাই করে এঁদের নিকট আনেন। এই জাহাজগুলি নেলসন ব্যবহার করেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। পরে ইংলণ্ডের জাহাজ-শিল্পীদের স্বার্থে ভারতে ইংরাজদের-নির্মাণও বন্ধ হয়। বাঙালী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাতা একথা আজ কেউ বিশ্বাস করবে না।

এজন্য দারোগা-ভিত্তিক পুলিশকে জনগণ ঘৃণার চক্ষে দেখতো। জনৈক ব্রিটিশ-শাসক তাঁর ডেসপ্যাচে খেদ করে লেখেন যে কোনও বাঙালী অধিক বেতনে ইনস্পেক্টর-পদেও সরাসরি ভর্তি হতে চায় না। এ বিষয়ে বাঙালীদের পুলিশ-বয়কট এখনও

অব্যাহত আছে। (মূল ইংরাজি অনুলিপি পরিশিষ্টে দ্র.।)

কলকাতা-পুলিশেও এই সব ব্যাপারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এদের পূর্বের মতো ইংরাজ অতো বিশ্বাস করে না। থানার পাইকদের সংখ্যা কমানো হয়। কিন্তু চৌকিদারদের সংখ্যা বাড়ানো হয়। ইংরাজ-নাবিকরা য়ুরোপীয় কনেস্টবল পদে ভর্তি হয়। পুলিশের সর্বোচ্চ পদগুলিতে য়ুরোপীয় নিযুক্ত হয়।

বাংলা-পুলিশের দারোগার মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা ছিল। দারোগারা তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন। বিকেন্দ্রীত স্থানীয় পুলিশ তখন জেলা-ভিত্তিক পুলিশ। কিন্তু বহু কর্মে ব্যস্ত কলেক্টরদের এদের খবরদারী করার সময় কোথায় ? ফলে স্বল্প বেতনভোগী দারোগারা উৎপীড়ক ও উৎকোচ গ্রাহক হলো। লর্ড ময়রা এই দারো-গাদের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু জাহাজ-শিল্প ধ্বংসে ও দাস-ব্যবসায়ে এদের কতো আস্কারা দেওয়া হয়। সেই সম্বন্ধে লর্ড ময়রা তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন নি। ওই আস্কারা ও তদারকির অভাব দারোগাদের অধঃপতিত করে।

[মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে এইরূপ আস্কারা দেশীয় পুলিশকে দেওয়া হয়। তাতে তারা প্রহারকারী উৎপীড়ক হয়ে ওঠে। এই অভ্যাস ত্যাগ করতে তাদের বেশ কিছু সময় লেগেছিল।]

অবস্থা অসহনীয় হলে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন মহকুমাগুলিতে, পূর্বতন জমিন-দারদের দারোগাদের মতো, দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ করে পুলিশকে কিছুটা বিকেন্দ্রীত করে এঁদের অধীন করা হলো। জিলা-ভিত্তিক পুলিশ মহকুমা-ভিত্তিক পুলিশ হয়। পূর্বতন দারোগাদের মতো এই দেশীয় ডেপুটিরা একাধারে ম্যাজি-স্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার হন।

কার্যতঃ পুরানো জমিনদারী শাসন-ব্যবস্থা ইংরাজী ঢঙে কায়েম হলো। জেলা-হাকিম-বা জমিনদারদের দেওয়ানদের মতো এবং তাঁর ডেপুটিরা পূর্বতন দারোগার মতো হন। প্রশাসন-ব্যবস্থা ইংরাজরা আমাদের শেখায় নি।

মহকুমা-ভিত্তিক পুলিশ অচিরে জমিনদারী-পুলিশের মতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেশীয় ডেপুটি-হাকিমরা জনগণের মেজাজ ও প্রয়োজন বুঝতে পারতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা বিচারকের আসন হতে নেমে সরেজমিন তদন্ত করে সত্য-মিথ্যা স্থির করতেন। তাঁদের গৃহের দ্বার জনগণের নিকট সর্বদা মুক্ত। বাংলোতে বসে তাঁরা বাইরের বহু সংবাদ পেয়ে যেতেন। তাঁদের বিচার পূর্বের মতো মিটমাটপন্থী হতো।

তাঁদের শাসনের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু গণ-গল্প মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়। যেমন : অমুক হাকিম গাঙ্গুলীবাবু সোনার কলসী খেজুর গাছে বেঁধে রাখতেন। তত্ত্বার্থ, তাঁর দাপটে সোনা-হেন কলসীও চুরি হতো না। এই সম্পর্কে নিম্নে অন্য আর একটি তৎ-

কালীন গণগল্প উদ্ধৃত করা হলো।

এক চৌকিদার গৃহস্থের বাড়িতে রাত্রে চুরি করে পেঁটরা মাথায় বেরিয়ে আসছিল। গৃহস্থের এক ব্রাহ্মণ-অতিথি আটচালার নিচে তাকে ধরে ফেলে আর চেঁচাতে থাকে; 'চোর—চোর—'

ধরা পড়ে চৌকিদার বলে, 'ঠাকুর, চেঁচিও না। এসো, দু'জনে বরং জিনিসপত্র ভাগ করে সরে পড়ি।' ব্রাহ্মণ তাতে রাজী নন। অগত্যা চৌকিদার নিজেই ব্রাহ্মণকে জিনিসপত্র-সমেত জাপটে ধরে 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। প্রতিবেশীরা ও দারোগা-বাবু এসে বুঝলেন যে চৌকিদার এতদিনে প্রকৃতই চোর ধরেছে। ব্রাহ্মণ-অতিথি ওই গ্রামে নবাগত এবং চৌকিদারের পক্ষে সাক্ষীর অভাব হয় না। গ্রামে তখন প্রতি রাত্রেই চুরি হচ্ছিল। দারোগাবাবু সাক্ষী-সাবুদ সহ ব্রাহ্মণকে বিচারের জন্য চালান দিলেন।

ডেপুটি-হাকিম উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সহসা কোনো রায় না-দিয়ে বললেন, 'বিচার কাল হবে। শোনো, আমার ভৃত্য নন্দ ঝুলে আত্মহত্যা করেছে। তোমরা দু'জনে তাকে খাটিয়া-সুদ্ধ তুলে মাঠের ওপারে চেরাই ঘরে রেখে এসো। ব্রাহ্মণ আপাতত জামিনে মুক্ত রইলো।' খাটিয়ার দুই মুখ দু'জনে কাঁধে নিয়ে মাঠের পথে এলো। ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'হায়রে, বিনা-দোষে শেষে অজাতের মড়া বইতে হলো।' চোর-চৌকিদার ভেংচে বললে, 'ঠিক হয়েছে। তখন তো বলেছিলাম, ঠাকুর, এসো, মাল ভাগ করে নি; যেমন শুনলে না!'

হাকিমের নির্দেশে এক তরুণ চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার অভিনয় করেছিল। ব্রাহ্মণ ও তরুণের সাক্ষ্য গ্রহণ করে তিনি চৌকিদারকেই শ্রীঘরে পাঠালেন।

কিন্তু এই উত্তম বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থা ইংরাজদের বেশিদিন পছন্দ হয় নি। ডেপুটিদের এরূপ সুনাম ইংরাজ জেলা-হাকিমদের মনঃপূত নয়। তাছাড়া ইংরাজ-তরুণদের ভালো চাকরির প্রয়োজন ছিল। তাঁরা পুলিশকে পুনরায় জেলা-ভিত্তিক করে এক-জন ইংরাজ সুপারিনটেনডেণ্টের অধীনে করলেন। ইংরাজ পুলিশ-সুপাররা ইংরাজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন রইলেন। সে-সময় পুলিশ-সুপার বাদে জেলাভিত্তিক পুলিশে ম্যাজিস্ট্রেটরাই সদস্যদের বরখাস্ত ও নিয়োগ করতেন।

'প্রহরী টহল দেয় নগরে ও গ্রামে।
আজ্ঞাবহ ছিল যারা তারা চলে গেছে,
বন্দী মোরা দেশব্যাপী মহাকারাগারে
'চিনি না ওদেরে' ওরা আমাদের কেউ নয়।'

উল্লেখ্য এই-যে সমগ্র বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপে জমিনদারী-পুলিশ অধিগ্রহণ বহুকাল

সম্ভব হয় নি। এই কাজ ধীরে ধীরে এবং শনৈঃশনৈঃ সমাধা করা হয়। বহু জমিনদার সিপাহী মিউটিনির পরও পুলিশকে রাখে। কিছুকাল গভর্নমেণ্ট-থানা ও জমিনদারী-থানা পাশাপাশি থেকেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে ও সীমান্ত স্থানে জমিনদারী শাসন বহুকাল ছিল। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি এ-সম্পর্কে বিবেচ্য।

[১৮০৯ খ্রী. ছোটনাগপুরে ছয়টি নতুন জমিনদারী-থানা স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খ্রী. লোহারডাঙ্গাতে সাতটি গভর্নমেণ্ট ও দশটি জমিনদারী-থানা ছিল। ১৮৫৭ খ্রী সিপাহী-মিউটিনিকালে ইংরাজরা ক্ষান্ত দেয়। ১৮৬৮ খ্রী. ইংরাজ-কমিশনার জমিনদারী-পুলিশের পালনার্থে কিছু কানুন তৈরি করেন। ১৮৬৩ খ্রী. বাংলাদেশের সর্বত্র জমিন-দারী-পুলিশ অধিগৃহীত হয়।]

পরবর্তীকালে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত-আইনের বলে নদীয়া, রাজশাহী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশের কোষাগার শূন্য হলো। কলকাতার ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় সেই-সব জমিনদারী ও তার অংশগুলি কিনে নতুন জমিনদার হলেন। জমিনদারী-প্রথা ধীরে ধীরে ব্যবসায়-ভিত্তিক হয়ে উঠল। ১৯৭১ খ্রী. বাংলার জমিদারীর সংখ্যা দুইশত একষট্টি এবং তার নয় বৎসর পরে বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় সাতশত সাঁই-ত্রিশ।

সেই কালে সমাজের ঘৃণার জন্য অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই দারোগা হতেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেক্ষেত্রে জমিনদারের নায়েবের চাকরি নেওয়াই পছন্দ করতেন। ব্রিটিশদের আস্কারায় এই দারোগারা কিছুটা অত্যাচারী ও উৎকোচগ্রাহী হয়ে ওঠে। অবশ্য গ্রামে অত্যাচার করলে জনগণ প্রতিরোধ করতো। এ ক্ষমতা জনগণ তখনও হারায় নি।

প্রতিবাদ-মুখর জনগণ মুখে-মুখে দারোগাদের মূর্খতাকে উপহাস করে সেকালে বহু গণ-গল্প তৈরি করেন। যথা, জনৈক দারোগা হাকিমের হুকুমে এক দাগী ব্যক্তি পাঁচ-কড়িকে গ্রেপ্তার করতে যান। তিনি পাঁচকড়িকে না পেয়ে তিনকড়িবাবু ও দু'কড়ি-বাবুকে [৩+২ = ৫] ধরে আনেন।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের প্রতিকারহীন ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হলে জনগণ এইরূপ গণ-গল্প দ্বারা প্রতিবাদ জানায়। তাদের উৎকোচ-গ্রহণ সম্পর্কে বহু পুরানো গণ-গল্প আজও প্রচলিত আছে। এক হাকিমের সুবিচারে খুশি হয়ে জনৈক বৃদ্ধা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলে, বাবা, তুমি 'দারোগা' হও!

১. জনৈক জোতদার ক্রোধে প্রহার করার ফলে তার প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটে। হাকিম-এর বিচারে তার আট বৎসর মেয়াদ হয়। কিন্তু দুই বৎসর মেয়াদ খাটার পর জেলে সে মারা যায়। এই ব্যক্তির পুত্রদের কাছে তার মৃত্যুসংবাদ দেবার জন্য জেলার-সাহেব

স্থানীয় থানায় পত্র পাঠালেন, যাতে যথাসময়ে তারা ধর্মীয় মতে পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে পারে।

পত্রটি পাওয়ামাত্র কুড়ি মাইল হেঁটে সুন্দরবনের এক গ্রামে ওই খবর পৌঁছে দেবার জন্য সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। পরিশেষে ছোট-দারোগা স্বয়ং এই কর্তব্য-সম্পাদনের ভার নিলেন। অথচ একজন চৌকিদার-মারফৎ এ সংবাদ পাঠানোর নিয়ম।

ছোট-দারোগাবাবু গ্রাম থেকে গ্রামে যান এবং হাঁকডাক করে বহু চৌকিদার সঙ্গে নেন। তারপর সেই বিরাট চৌকিদার-বাহিনী সঙ্গে করে তিনি নির্দিষ্ট গ্রামে উপস্থিত হন।

'এই গ্রামে অমুক মণ্ডলের কে কে বেড্ডা আছে রে?' গ্রামের মোড়লদের এক জায়গায় জড়ো করে খেঁকিয়ে উঠে দারোগাবাবু বললেন, 'শিগগির ধরে নিয়ে এসো তার সাত জোয়ান-বেটাকে।'

মৃত ব্যক্তির সাতটি জোয়ান পুত্র সেখানে আসার পর দারোগাবাবু চেঁচিয়ে বলেন, 'জানোস, তোর বাপজান জেলের মধ্যে মরসে?' পিতার মৃত্যুসংবাদে সাতপুত্র তারস্বরে কেঁদে উঠলে দারোগা ধমক দিয়ে বললেন, 'কাঁদবে পরে। এখন ঠেলা তো সামলাও। তোদের বাপজান মাত্তর দু'বছর জেল খেটে মরসে। আট বছরের বাকি ছয় বছর মেয়াদ খাটবে কে রে? তো বেটারা চল্ বাকি ছ'বছর খেটে আসবি।'

ছেলেরা চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'বাবার জেল আমরা খাটব কেন, কর্তা? আমরা তো কাউকে খুন করি নি!'

দারোগাবাবু তখন উপস্থিত মোড়লদের এবং তাদের বুঝিয়ে বললেন, 'হুম। বাপের সম্পত্তির ভাগ নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার জেল-খাটার ভাগ নিতে তোমাগো আপত্তি! অত সোজা নয়। হয় জেলের ভাগ নাও, নয় তার সম্পত্তি ত্যাগ করো। সম্পত্তি তাহলে সরকারের বাজেয়াপ্ত হোক। এটাই হচ্ছে কোম্পানির বর্তমান আইন। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হুকুমটি চেপে ফেলা। কিন্তু সেজন্য দক্ষিণা তো তোমরা কিছু আমাকে দেবে!'

২. এক দারোগাবাবুর ঘুষ হাতেনাতে ধরতে না পেরে হাকিম তাঁকে নদীতে ঢেউ গোনার কাজ দিলেন। কিন্তু ঢেউ ভেঙে দেওয়ার জন্য নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে দারোগাবাবু দক্ষিণা আদায় করতে থাকেন।

৩. এক দারোগাবাবু হাটের মাঝে টুল পেতে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে বসে সর্বসমক্ষে ঘুষ গ্রহণ করতে থাকেন। পরনে গরম কোটপ্যান্ট ও মোটা অলেস্টার। মাথা ও গলদেশে গরমের শাল জড়ানো। দারোগাবাবুর বিরুদ্ধে ঘুষের মামলা উঠলে সরল

গ্রামবাসী জেরার সময় তাঁর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সত্যকথাই বলল। প্রখর গ্রীষ্মে গরম-পোশাক পরে হাটের মাঝে ঘুষ নেওয়া ইংরাজ-হাকিম বিশ্বাস না করে আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন।

তৎকালীন দারোগাদের বিরুদ্ধে এই-সব গণ-গল্প জনগণের বিতৃষ্ণার পরিচায়ক। এইরূপে সৃষ্ট গণ-গল্পগুলি উপেক্ষা না করে সাবধানে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা উচিত। ওগুলি থেকে সতর্ক হয়ে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নচেৎ পুঞ্জীভূত জনবিক্ষোভ জাগ্রত হয়ে একদিন-না-একদিন প্রকাশ্যে ফেটে পড়বে। এই গণ-গল্পগুলির স্বরূপ বিচার করে তার সৃষ্টিকাল সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়।

গণ-গল্প ছাড়া, কিছু প্রবাদ-বাক্যও মুখে-মুখে এক সময় রচিত হয়। যথা—'পুলিশ বাপের কাছ থেকে ঘুষ নেয়: আর স্যাকরা মায়ের কানের সোনা চুরি করে।' 'ছাগল ঘাস খায় না আর পুলিশ ঘুষ খায় না। একথা কে বিশ্বাস করবে।' অবশ্য এ-সব গণ-গল্পও প্রবাদ-বাক্যের সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন। আরও কিছু পূর্বে কিংবা পরে ওগুলি সৃষ্ট হতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

কলিকাতা-পুলিশ

বাবু গোবিন্দরাম-সৃষ্ট সুসংহত ও সমুন্নত কলকাতা-পুলিশ ক্লাইভ এবং হেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কর্নওয়ালিশের সময় তার সামান্য অদল-বদল হয়েছিল। পূর্বতন কলকাতা-পুলিশের মূল কাঠামো বর্তমান কলকাতা-পুলিশেও অপরিবর্তিত রয়েছে। লণ্ডন-পুলিশের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য শহরের 'পুলিশে' তার প্রভাব সুস্পষ্ট। কর্নওয়ালিশ জমিনদারী-পুলিশ অধিগ্রহণ করে তা রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পদগুলির বাংলা-নামের বদলে ইংরাজী নামকরণ ব্যতীত তার মূল কাঠামো তিনি প্রায় অপরিবর্তিত রাখতে বাধ্য হন। কারণ, ওই পুলিশ অতি উন্নত থাকায় ওতে বদলাবার কিছুই ছিল না।

এবার গোবিন্দরাম-উত্তর কলকাতা-পুলিশ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

১৭৭৮ খ্রী. সকাউনসিল গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিশ একটি আইন বিধিবদ্ধ করলেন। তিনি সুবা-বাংলা প্রদেশের থানার সংখ্যা কমালেও শহর-কলকাতার থানার সংখ্যা বাড়ালেন। হেস্টিংস-সৃষ্ট পৌরসভার একত্রিশটি ওয়ার্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে তার প্রয়োজন হয়। এতে কলকাতা-শহরকে একত্রিশ জন থানাদারের অধীনে একত্রিশটি থানায় বিভক্ত করা হয়। থানাগুলিতে থানাদারের অধীনে সাত শত পাইক

ও কিছু নায়ক রইল। তদন্ত ও অন্যান্য কাজের জন্য চৌত্রিশ জন নায়েব থানাগুলিতে ছিল। থানার নথিপত্র লেখার জন্য কয়েকজন মুন্সীও [ক্লার্ক] সেখানে বহাল হয়। একটি সুপারিনটেনডেণ্ট-এর পদ সৃষ্টি করে সমগ্র কলকাতা-পুলিশকে তাঁর অধীন করা হলো। কিন্তু পুলিশের ঐ ইংরাজ কর্তা কলকাতার মেয়রের অধীনে থাকলেন। এই মেয়র তাঁর পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ পুনরায় অনুপযুক্ত বিবেচিত হলেন। তিনি প্রশাসনে অধিকর্তার অযোগ্য প্রমাণিত হন। তাঁর বিচারকার্যও অত্যন্ত কদর্য হতে থাকে। ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দের মধ্যে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেওয়ান গোবিন্দরামের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত তখন নেই। একমাত্র মেয়রের আদালতেই দেশীয়দের বিচার হতো। মেয়র য়ুরোপীয়দের স্বার্থ সর্বাগ্রে দেখতেন। জোর করে দেশীয় ভৃত্যদের তিনি মনিব-য়ুরোপীয়দের কাছে ফেরত পাঠাতেন। তাঁর কয়েকটি রায়ের নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

'অমুক য়ুরোপীয়ের দেশীয় ভৃত্যকে ছয়বার বেত্রাঘাত। কারণ, মনিবের গৃহ হতে সে পলাতক ছিল। সার্ভেণ্ট মেড ওভার টু হিজ মাস্টার।' 'অমুক আসামীকে গাধার পিঠে উলটো করে বসিয়ে ফিনিক-বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে আনো এবং ওই দেশীয় অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে সর্বসমক্ষে ঘোল ঢালো।' 'অমুক দেশীয় আসামীকে বিশবার কানধরে ওঠ-বোস এবং দৌড় করিয়ে তার দাঁতে কুটো দিয়ে আধ-মাইল ঘুরিয়ে আনো' ইত্যাদি।

কলকাতার এ'দেশীয় সভ্য নাগরিকগণ এইরূপ দণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এগুলি আপীল-অগ্রাহ্য সামান্য-দণ্ড হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারের বাইরের বিষয়। কিংবা, দরিদ্র ব্যক্তিরা অত দূরে ইচ্ছা করেই যেতেন না। কিছু দুষ্ট দেশীয় পেশ-কারের পরামর্শ ও বুদ্ধি এতে ছিল।

এই শহরের প্রশাসন তখনও মেয়র ও তার অলডারম্যানের অধীন। পৌরসভা, কল-কাতা-পুলিশ ও বিচার-বিভাগ তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। তখন পৌরসভায় কমিশনারের পদ ছিল না। শীঘ্রই মেয়র ও তাঁর অলডারম্যানরা অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে বিদায় নিলেন। তৎস্থলে নিম্নোক্তরূপ এক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলো।

কলকাতায় ১৭৮০ খ্রী. একটি কনসারভেন্সি সৃষ্টি করা হয়। এই সংস্থার জন্য কয়েক-জন কমিশনার নাগরিকদের মধ্য হতে মনোনীত করা হলো। কমিশনারগণ অধি-কাংশই য়ুরোপীয়রা ছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে একজন ইংরাজকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো। কলকাতার স্থল ও নৌ-পুলিশ এবং তাঁদের সুপারিনটেনডেণ্টকে এই কনসারভেন্সির চেয়ারম্যানের অধীন করা হলো। কলকাতা শহরের বিচার ব্যবস্থা পূর্বতন মেয়রদের মতো এঁদেরই অধীন থাকে।

এই কনসারভেন্সি কলকাতায় ১৭৮০ খ্রী. স্থাপিত হয়। কর ধার্য ও কর আদায় কলকাতা-পুলিশের সাহায্যে করা হতো। কর-ধার্যের উপযুক্ত নাগরিকদের পুলিশই খুঁজে বার করতো। পুলিশী কাজের সঙ্গে পৌরকাজও পুলিশকে সমাধা করতে হতো। এজন্য কনসারভেন্সি বলতে লোকে পুলিশকেও বুঝতো। এ সময় পৌরসভা ও পুলিশের মধ্যে কোনও পৃথক সত্তা ছিল না। তবে ওই সংস্থার প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর সঙ্গে তাঁর সহকারীরা শহরের বিচারকার্যও করতেন।

দোকান-ভাড়ার উপর তাঁরা টাকা-প্রতি দু'আনা এবং বাড়ি ভাড়ার উপর টাকা-প্রতি এক আনা কর ধার্য করেন। এই অর্থ থেকে পথ-ঘাট পরিষ্কার রাখা হতো। এ-কাজে তদারকির ভার পুলিশের উপর ছিল। কলকাতা-পুলিশ তৎকালে এক-যোগে সমাজসেবী ও শান্তিরক্ষক।

১৭৯৩ খ্রী. বাংলা প্রদেশের আংশিক জমিনদারী-পুলিশ গ্রহণের বৎসরে কলকাতা-শহরের প্রশাসনে পুনরায় অদল-বদল হয়। কনসারভেন্সির কমিশনারগণ ও চেয়ার-ম্যান বিদায় নিলেন। স-কাউনসিল গভর্নর জেনারেল তাঁদের স্থলে ইংরাজ-নাগরিকদের মধ্য হতে কয়েকজন জাস্টিস অফ-পিস্ নিযুক্ত করলেন। এঁদের প্রধানকে ম্যাজিস্ট্রেট (বড় হাকিম) এবং মূল সংস্থাটি ম্যাজিস্ট্রেসি আখ্যা পায়।

[বি. দ্র.] তৎকালে রিটায়ার করার প্রথা ছিল না। (য়ুরোপের কোনো কোনো রাষ্ট্রে আজও তাই।) যতদিন সমর্থ তথা ফিট্ ততদিন তারা কাজে বহাল থাকতো। জমিনদার হলওয়েলের মতো জাস্টিস অফ পিস্রাও যাবজ্জীবনের জন্য নিযুক্ত হন।

কলকাতার আভ্যন্তরীণ শাসন-ক্ষমতা ধীরে ধীরে জমিনদারদের অর্থাৎ দেওয়ানের হাত হতে মেয়র এবং মেয়র হতে কনসারভেন্সির চেয়ারম্যানে বর্তায়। এবার ঐ ক্ষমতা কনসারভেন্সি হতে ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন জাস্টিস অব-পিস্দের দ্বারা অধিকৃত হলো।

পুলিশের তদারকি, বিচারকার্য ও পৌরকার্য, আবগারী এঁদের অধীন হলো। এঁরা মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রক হন। এজন্য জাস্টিস অফ-পিস্রা নিজেদের বড় হাকিমের অধীন কয়েকটি পৃথক সংস্থায় বিভক্ত করেন।

চব্বিশ পরগণা জেলায় জাতীয় পুলিশ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তখনও অক্ষুণ্ণ। আদর্শবাদী ডাকাতদের স্থলে বহু সাধারণ ডাকাত অপদলের সৃষ্টি হয়েছে। চব্বিশ পরগণা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন গভর্নমেণ্ট পুলিশ বিশ্বাস্য নয়। ডাকাত অপদল কলকাতার উপকণ্ঠেও হানা দেয়।

কলকাতা-পুলিশের এজন্য চব্বিশ পরগণার অভ্যন্তরে কুড়ি মাইল পর্যন্ত গ্রেপ্তার ও গৃহ-তল্লাসীর অধিকার হেস্টিংসের সময় হতে ছিল। তা না হলে কলকাতার অপরাধ

নিরোধ ও নির্ণয়ে অসুবিধা। পুলিশের কর্তা বিধায় জাস্টিস অফ পিস্‌দেরও ঐ অধিকারের প্রয়োজন হয়। ওয়েলেসলি [১৮০০-১৮০৬ খ্রী.] সাহেবের হুকুমে জাস্টিস অফ-পিসদের কলকাতার সঙ্গে তার চতুষ্পার্শে কুড়ি মাইলের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট করা হলো।

উক্ত ম্যাজিস্ট্রেসির জাস্টিসগণ প্রধান হাকিমের অধীনে কাজের সুবিধার জন্য চারটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত হয়: ১. কনসারভেন্সি ২. ফেলনী ৩. মিসডিমোনার ৪. রিপোর্ট।

১. কনসারভেন্সি

এই বিভাগটি দু'জন জাস্টিস অফ-পিসের অধীন হয়। এঁরা প্রতি কোয়ার্টার-সেসনে ও অন্য সময়েও একত্রিত হয়ে মিউনিসিপ্যাল তদারকি করতেন। পথঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য মেথর, ঝাড়ুদার ও অন্যান্যদের নিযুক্ত করা এবং রাজপথ পাহারা ও তার মেরামতির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই জাস্টিস অফ-পিস্‌রা গৃহ, অট্টালিকা ও উন্মুক্ত জমির মালিক, ভাড়াটিয়া ও অন্যদের উপর বাৎসরিক মূল্যের কুড়ি ভাগের একভাগ পর্যন্ত কর ধার্য করার অধিকারী হন। এইভাবে কলকাতা-শহরে পৌর-কর ব্যবস্থা কায়েম হয়।

এই কনসারভেন্সি হতেই বর্তমান করপোরেশনের সৃষ্টি। প্রথমে শুধু য়ুরোপীয়, পরে কিছু দেশীয় কমিশনার মনোনীত হয়। সেজন্য পরবর্তীকালে সীমিত নির্বাচনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। দেশীয়দের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়ার সময় স্বীকার করা হয় যে জনগণ-শাসিত পৌরসভা খ্রী. পূ. ভারতীয় প্রথা। [স্যার জর্জ ক্যাম্বেল দ্র.।]

কনসারভেন্সি-বিভাগের জাস্টিস অফ-পিসদ্বয়ের স্বতন্ত্র এজলাস ছিল। সেখানে কর বৃদ্ধি ও অন্য অবিচারে করদাতারা দরবার করতে পারতেন। এঁরা মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মামলাগুলির বিচার করতেন এবং করদাতাদের আবেদন-মতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতেন।

২. ফেলনী বিভাগ

ফেলনী বিভাগ দু'জন জাস্টিস অফ-পিসের অধীন ছিল। ফেলনী অর্থে মিসডিমোনার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। পুলিশের প্রেরিত ওইরূপ মামলা তাঁরা বিচার করতেন। প্রাইভেট-মামলা গ্রহণেও তাঁরা অধিকারী ছিলেন। উপযুক্ত মামলাগুলি তাঁরা নিজেরা বিচার করতেন। কিন্তু অতি-গুরুতর মামলা বিচারের জন্য তাঁরা কলকাতার সুপ্রীম

কোর্টে পাঠাতেন।

প্রতি বিভাগে দু'জন জাস্টিস অফ-পিস থাকায় অবিচার হতো না। দু'জনকে একসঙ্গে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। এজন্য এ সময় হতে ব্রিটিশ-বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ে। উপরন্তু এই তিন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল চলতো। তা বাদে, লণ্ডনে প্রিভিকাউন্সিল ছিল। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল হতো। কলকাতায় মেয়র-কোর্ট স্থাপনের সময় হতে (১৭২৬ খ্রী.) ব্রিটিশ-ভারতের উপর প্রিভিকাউন্সিলের এক্তিয়ার হয়। কিন্তু মহারাজ নন্দ-কুমারের পক্ষে সেখানে আপিল করা হয় নি।

৩. মিসডিমোনার বিভাগ

মিসডিমোনার অর্থে কম গুরুত্বের অপরাধ। এই বিভাগ দু'জন জাস্টিস অফ-পিসের অধীন। এঁরা কম গুরুত্বের অপরাধের বিচার করতেন। যথা, প্রহারাদি, চুক্তি খেলাপ, ভৃত্য-সংক্রান্ত মামলা, ছোটখাটো চুরি-মামলা, ভীতি প্রদর্শন ও শান্তিভঙ্গ ইত্যাদি।
টাউন-গার্ড পুলিশ তথা সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী এঁদের অধীন। এঁরা নিজস্ব এজলাসে টাউন-গার্ড সংক্রান্ত রিপোর্ট শুনতেন। ওই বিষয়সম্পর্কিত মামলাসমূহের বিচারও তাঁরা করতেন।
টাউন-গার্ড তথা সশস্ত্র-পুলিশে প্রথমে সিপাইদের [দেশীয় সৈন্য] নেওয়া হতো। কিন্তু প্রতিবাদ আসায় শুধু বাঙালী বরকন্দাজেদের [সশস্ত্র পাইক] নেওয়া হয়। প্রথমে এরা কয়জন বাঙালী নায়ক ও একজন বাঙালী দারোগার অধীন ছিল, পরে উহাকে চারজন সার্জেণ্টে ও একজন টাউন-মেজরের অধীন করা হয়। এরাই কল-কাতার তৎকালীন সশস্ত্র পুলিশ। এদের সকলকে বন্দুক বহন করতে হতো। প্রয়ো-জন হলে থানাদার-পুলিশদের সাহায্যের জন্য এদের পাঠানো হতো।

৪. রিপোর্ট বিভাগ

রিপোর্ট বিভাগ দুইজন জাস্টিস অফ-পিসের অধীন করা হয়। এঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল পুলিশ-বিভাগ। এই কলকাতা-পুলিশ তখন চারটি বিভাগে বিভক্ত। যথা : ১. থানাদারী পুলিশ ২. বাউণ্ডারী পুলিশ ৩. রিভার পুলিশ ও ৪. টাউন-গার্ড পুলিশ।
পুলিশের কর্তা এই জাস্টিস অফ-পিসদ্বয় নিজেদের এজলাসে বসে প্রত্যহ প্রতিটি থানাদারের নিকট থেকে তাদের এলাকার যাবতীয় ঘটনার রিপোর্ট শুনতেন। এখানে বাদী ও সাক্ষীরা উপস্থিত থেকে নিজের নিজের বক্তব্য রাখতো। জাস্টিস অফ-

পিসদ্বয় উচিত বুঝলে আসামীদের মুক্তি দিতেন। সন্দেহ হলে, তাঁরা অন্য অফিসারদের দ্বারা মামলা আবার তদন্ত করাতেন। প্রয়োজনে তাঁরা নিজেরাইতদন্ত করে সত্যাসত্য বুঝতেন। তাতে কোনো পক্ষেরই অবিচারের মনোভাব থাকতো না।

এঁরা নিজেরা ছোটখাটো কিছু-কিছু মামলার বিচার করতেন। এ যুগে ওই ধরনের মামলাগুলিকে 'পুলিশ-অগ্রাহ্য' তথা 'নন-কগ' অপরাধ বলা হয়। অন্যগুলি গুরুত্ব অনুযায়ী মিসডিমোনার বিভাগে কিংবা ফেলনী বিভাগে বিচারের জন্য পাঠাতেন। মামলাসমূহের মিটমাট করার ক্ষমতা এঁদের ছিল।

[বি দ্র. উপরোক্ত রিপোর্ট-গ্রহণ পদ্ধতি একটি সুন্দর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তৎকালের মতো বর্তমানকালের ডেপুটি পুলিশ-কমিশনারদের নিজস্ব এজলাসগৃহ ছিল। এজন্য পদাধিকার-বলে এঁদের প্রত্যেক-কে জাস্টিস অফ-পিসও করা হতো। তাঁরা আসামীদের আইনত মুক্তি দিতে পারতেন। বিচার করা ও দণ্ডদান ছাড়া, হাকিমদের অন্য ক্ষমতা তাঁদের ছিল।]

প্রত্যহ সকালে প্রত্যেক থানা-ইনচার্জ এঁদের এজলাসে আসামী ও নথিপত্র সহ উপস্থিত হতেন। এ্যাসিসটেণ্ট-কমিশনারগণ তাঁকে প্রয়োজন মতো সাহায্য করতেন। ডেপুটি-কমিশনার স্বয়ং এ্যাসিসটেণ্ট-কমিশনারের সাহায্যে প্রতিটি মামলা পরীক্ষা করতেন। আসামীরা স্বয়ং বক্তব্য রাখতো। তাদের উকিলরাও উপস্থিত থেকে মামলা বোঝাতেন। উচিত বুঝলে তৎক্ষণাৎ তাঁরা আসামীদের মুক্তি দিতেন। এজন্য তাঁদের আদালতে হয়রানি-ভোগ ও অর্থনষ্ট হয় নি। নথিপত্র পূর্বদিন এ্যাসিসটেণ্ট-কমিশনার খুঁটিয়ে দেখতেন ও বুঝতেন। পরদিন ঐগুলি পুনর্বার ডেপুটি-কমিশনার দ্বারা পরী-ক্ষীত হতো। এই ডবল চেকিঙের পর আদালতের বিচার। তখন অবিচার হওয়ার সুযোগ কম ছিল।

তদন্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে তৎক্ষণাৎ পুনঃ তদন্তের ব্যবস্থা হতো। তদন্ত-কারীর দোষ প্রমাণিত হলে তাদের জরিমানা ও অন্য কঠোর শাস্তি হতো। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা মামলা অন্য অফিসার দ্বারা তদন্ত করাতেন। থানার ইনচার্জ-অফিসার বা তদন্তকারী এঁদের বিনা অনুমতিতে মামলা কোর্টে পাঠাতে পারেন না।

পূর্বে পুলিশের ডেপুটি-কমিশনাররা পনের দিন পর্যন্ত আসামীদের পুলিশ-হেপাজতে নিজেরাই রাখতেন। পরে কলকাতা-হাইকোর্ট তাঁদের ঐ অধিকার কেড়ে নেন। সেখানে বিনা ব্যয়ে সুবিচার পাওয়ার কিছুটা ব্যবস্থা ছিল। এঁরা মামলা-সমূহ মিট-মাট করার ও পুয়োর-ফাণ্ডে সামান্য চাঁদা নিয়ে দোষীকে মুক্তি দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। এতে দৈব অপরাধীদের দাগী হয়ে জীবন নষ্ট হতো না। এই রিপোর্ট সিস্টেমের পুনঃ প্রবর্তন জনগণের উপকারে আসবে।]

কিছু পরে পুনরায় কলকাতা-পুলিশের কিছু অদল-বদল করা হয়। কলকাতা-পুলিশের তৎকালীন সংগঠন সম্বন্ধে বিবৃত করবো। ঐ কালে উহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং উল্লেখ্য পুলিশ-সংগঠন ছিল।

এই পুলিশ সুগঠিত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা ১. সশস্ত্র বাহিনী ২. কেন্দ্রীয় বাহিনী ৩. থানাদারী পুলিশ ৪. বাউণ্ডারী পুলিশ ৫. বিশেষ পুলিশ ৬. রিভার পুলিশ।

১. সশস্ত্র পুলিশ

সশস্ত্র পুলিশকে টাউন-গার্ড পুলিশ বলা হতো। এরা কলকাতার তৎকালীন আর্মড্ পুলিশ। প্রথমে এতে দেশীয় সিপাহী তথা সৈন্য নেওয়া হতো। কিন্তু সৈন্য দ্বারা পুলিশের কাজ সম্ভব নয়। প্রয়োজন মতো বল-প্রয়োগে তারা অনভ্যস্ত। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ-পাইক ও জনগণ হতে প্রতিবাদ আসে।

পরে এই বাহিনী শুধু বাঙালী বরকন্দাজ [বন্দুকধারী পাইক] দ্বারা গঠিত হয়। এরা প্রথমে কজন নায়ক ও একজন দারোগার অধীন ছিল। পরবর্তীকালে এদের একজন টাউন-মেজর ও চারজন সার্জেণ্টের অধীন করা হলো।

২ কেন্দ্রীয় পুলিশ

এরা বর্তমান কালের হেডকোয়ার্টার-ফোর্সের অনুরূপ। এতে বারোজন য়ুরোপীয় নাবিককে য়ুরোপীয়-কনস্টেবলরূপে নিযুক্ত করা হয়। এরা কেন্দ্রীয় পুলিশ-অফিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এদের মধ্যে ছ'জন য়ুরোপীয়-অধ্যুষিত এলাকায় য়ুরোপীয় মামলাতে বা বিবাদে প্রয়োজন মতো দেশীয় থানাদারদের সাহায্য করতো। প্রয়োজন হলে দেশীয় থানাদাররা এদের তলব করতেন।

এই য়ুরোপীয় কনস্টেবলদের দেশীয় ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় ভাষা বলতে ও বুঝতে পারলে এরা বেতনের অতিরিক্ত কিছু ভাতা পেত। দেশীয়দের সঙ্গে এদের ব্যবহার খুবই-ভালো ছিল। এইরূপ সৎ-শিক্ষা তাদের সকলকে দেওয়া হতো।

৩. থানাদারী পুলিশ

শহরের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় এদের সংখ্যা বাড়ানো হয়। থানাগুলির এলাকা ছোট ছোট করা হতো। ওই কালের বহু থানা এখন নেই। যথা, ঝিনিক বাজার, বামুন-পাড়া, শাস্তি ভাঙা, ডুলাণ্ডা, হাটখোলা, ইত্যাদি।

এ সময় সমগ্র শহরকে চল্লিশটি থানায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক থানায় একজন থানাদার এবং তাকে সাহায্য করার জন্যে কয়েকজন নায়েব নিযুক্ত করা হয়। কয়েকজন মুন্সী থানার নথিপত্র লিখতো ও রক্ষা করতো। প্রত্যেক থানায় কুড়ি থেকে ত্রিশজন নায়ক, পাইক ও চৌকিদার ছিল।

এছাড়া প্রত্যেক থানায় তিনটি রাত্রিকালীন টহলদার পুলিশ দল ছিল। এদের প্রত্যেক দলে দুইজন নায়েব ও বারোজন চৌকিদার ছিল। এদের মূলতঃ রাত্রিকালীন রোঁদের জন্য ব্যবহার করা হতো। প্রত্যূষে ফিরে এরা থানাদারকে এলাকার খবরা-খবর রিপোর্ট করতো।

থানাদারদের ষোল টাকা, নায়েবদের দশ টাকা এবং চৌকিদারদের চার টাকা মাসিক বেতন ছিল।

একালে বাজারে কড়ির [১৭৭০ খ্রী. পরেও] ব্যবহার ছিল। তবে বেতন মুদ্রা দ্বারা দেওয়া হতো। দ্রব্যাদি ও শস্যও শহরে সুলভ ও সহজ লব্ধ ছিল। এদের সরকার থেকে য়ুনিফর্ম সরবরাহ করা হতো। এদের ব্যায়াম ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় বাঙালী হতে মূলতঃ এদের ভর্তি করা হতো।

৪. বাউণ্ডারী পুলিশ

বাউণ্ডারী পুলিশকে সীমানা-পুলিশ [সীমান্ত] বলা হতো। এদেব চৌহদ্দী-পুলিশও বলা হয়েছে। সমগ্র শহর ঘিবে বাইশটি সিদবালি [Sidwali] থানার বেষ্টনী ছিল। সমগ্র শহব ঘিরে চক্রাকাবে ওগুলিব অবস্থান। প্রত্যেকটি সিদবালি-থানায় নায়েবের অধীনে আট হতে ষোলজন বরকন্দাজ থাকতো। রাত্রে শহরের সীমান্ত-অতিক্রমকারী যে-কোনো ব্যক্তির দেহ-তল্লাসীর অধিকার এদের ছিল। চক্রাকারে অবস্থিত একটি থানা হতে অন্য থানার মধ্যবর্তী-রেখা দ্বিমুখী পদচারণ দ্বারা রক্ষা হতো।

চব্বিশ পরগণা জেলায় জমিনদারী-পুলিশ অধিগ্রহণের ফলে বহু বিক্ষোভ দেখা দেয়। জাতীয় পুলিশ বিলোপ-সাধনে জনসাধারণের মতো পুলিশ-পাইকরাও ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট। তৎসম্পর্কিত সমস্যায় তখনও সমাধান হয় নি। জনগণের ও জমিনদারদের সাহায্য-পুষ্ট আদর্শবান ডাকাত দলের সংখ্যা তখন কম। তার পরিবর্তে বহু সাধারণ ডাকাত-অপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা প্রতিশোধের জন্য রাত্রিকালে বারে বারে শহরের উপকণ্ঠে আক্রমণের চেষ্টা করতো। কিন্তু সুরক্ষিত নগরের অভ্যন্তরে তাদের কোনোও উৎপাত সম্ভব ছিল না।

৫. বিশেষ পুলিশ

বিশেষরূপে শিক্ষিত একদল পুলিশকে 'বিশেষ পুলিশ' [Special police] বলা হতো। এরা প্রধান-হাকিমের বাসগৃহ-সংলগ্ন গার্ডরুমে বহাল থাকতো। একজন জমাদার, ন'জন নায়েব এবং বাহাত্তর জন গিরদার-পাইক দ্বারা উহা গঠিত। এরা বন্দুকধারী সশস্ত্র বিশেষ পাইক। রণবিদ্যাতেও এরা সুশিক্ষিত ছিল। একপ্রকার অর্ধসামরিক মিলিশিয়া পুলিশ। জরুরী প্রয়োজনে প্রধান-হাকিম, যিনি জাস্টিস অফ-পিসদের চেয়ারম্যান, স্বয়ং তাদের ঘটনাস্থলে পাঠাতেন।

বাগদী, ডোম, কিছু ভোজপুরী, কৈবর্ত ও অন্য বর্ণহিন্দুরাও এর সদস্য ছিল। এরা রীতিমতো প্রাত্যাহিক কুচকাওয়াজ করতো। বাদ্যযন্ত্ররূপে এরা পুরনো যুগের দামামা ও শিঙা ব্যবহার করেছে।

৬. রিভার পুলিশ

পূর্বতন নৌ-পুলিশ এই সময় রিভার-পুলিশ নামে পরিচিত হয়। এতে ন'জন নৌ-সরকারের অধীনে নৌ-চৌকিদার বাদে আঠারো জন পিওন এবং নিরানব্বই জন মাল্লা, মাঝি ও দাঁড়ি ছিল। প্রয়োজনে এরা কিছু গিরদারী তথা বন্দুকধারী পাইক সঙ্গে নিতো। সমগ্র বাহিনী একজন নৌ-দারোগা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এই পদটি এ সময়ে অন্য-নামে অভিহিত হয়।

ভাগীরথী নদীতে টহল দেওয়া এদের কাজ। এরা জলদস্যু-দমন ও স্মাগলিং বন্ধ করতো। এদের প্রহরায় নদীবক্ষ বিপদমুক্ত থাকতো। বর্তমান পোর্ট-পুলিশ এদের উত্তরাধিকারী।

কলকাতা-পুলিশের অধীনে ওইকালে তিনটি আটক-ঘর তথা প্রিজন্ বা হাজত ছিল। যথা, ১. হাউস অব করেকসন (সম্ভবত জুভিনাইলদের জন্য)। ২. টাউন-গার্ডপ্রিজন তথা কুঠা-ঘর (নারীদের জন্য)। হাউস অফ করেকসনের সঙ্গে পুলিশ-হাসপাতাল যুক্ত ছিল।

কনসারভেন্সি

মিউনিসিপ্যালকে তথা পৌরকার্যকে কনসারভেন্সি বলা বলা হতো। এতে চারজন য়ুরোপীয় ঝাড়ুদার, দু'জন য়ুরোপীয় কনস্টেবল এবং তাদের অধীনে মজদুর [মিনিয়্যা-লস্] প্রভৃতি ছিল। পৌরকার্যের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক তখনও আছে। পুলিশ কনস্টেবল ঝাড়ুদারদের কাজের তদারকি করে।

এদের অধীনে কিছু পুলিশ-পাইক বে-আইনী গৃহ বন্ধ করতো। পৌরকর আদায়েও

তারা সাহায্য করতো মিউনিসিপ্যাল-সম্পত্তিও তারা পাহারা দিতো। এই পুলিশ-দল কনসারভেন্সির কর্তৃপক্ষের অধীন ও আজ্ঞাবাহী।

[বর্তমানে কলকাতা-পুলিশে 'সিটি আর্চিটেক্ট নামে একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগেও ইনস্পেক্টর ও পুলিশগণ শহরের বে-আইনী গৃহ-নির্মাণ করপোরেশনের নির্দেশে বন্ধ করে।]

পৌরকার্য, বিচারকার্য, এবং পুলিশী-কার্য—সমাজ ব্যবস্থার এই তিনটির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্বে একই ম্যাজিস্ট্রেসির [বড় হাকিম] অধীনে এই তিনটি সংস্থা থাকায় এদের মধ্যে সহযোগিতা নিবিড় হয়। এতে জনহিতার্থে কার্যক্রম দ্রুত-গতিতে সম্পন্ন হতো। তখন নাগরিকরা সুখী ছিল।

বি. দ্র ১৮১৮ খ্রী. ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাজপথ চামড়ার মশকের সাহায্যে জল-সিক্ত করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পরে লটারির টিকিট বিক্রয় করে বর্তমান বহু রাজপথ ও পুষ্করিণী তৈরি হলো। রাস্তা পাকা করার জন্য কলকাতা-পুলিশ বহু লটারির টিকিট বিক্রয় করে। এ যুগেও রেডক্রশ ও অন্যান্য জনকল্যাণে কলকাতা-পুলিশ টিকিট বিক্রয় করেছে।

[কলকাতা শহরের উপরোক্ত প্রশাসন-বিভাগের সঙ্গে পাটলিপুত্র ও রাজগৃহ প্রভৃতি প্রাচীন নগর প্রশাসন-বিভাগের মিল আছে। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ওই যুগে ইংরাজ-রাজপুরুষদের বাংলা, সংস্কৃত ও পার্শি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের শিক্ষণ সমূহ এই বিষয়ে তাঁদের প্রভাবিত করেছিল।]

কলকাতা-পুলিশের সুব্যবস্থা ও সুরক্ষণে ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা-অপরাধ ও সিঁদচুরি প্রভৃতি শহরে ছিল না বললেই চলে। এই নিরাপত্তার কারণে ধনী ব্যক্তি-দের মতো মধ্যবিত্তরাও গ্রামাঞ্চল ও অন্যত্র হতে এসে কলকাতায় গৃহনির্মাণ করে। তাদের ধন-দৌলত কলকাতায় পুঞ্জীভূত হয়।

গোবিন্দরাম মিত্রের কাল থেকেই কলকাতা-পুলিশের এই সুনাম। ফলে কলকাতা শহর ক্রমশ জনবহুল ও বৃহৎ আকার হয়। অন্য প্রদেশবাসী ব্যবসায়ী ও ধনীরা এই শহরে এসে বসবাস শুরু করে। কলকাতা কসমোপলিটন তথা পাঁচমিশালী শহরের রূপ নেয়।

কলকাতা-পুলিশের সংগঠন ও সুরক্ষণ-খ্যাতি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে ও মার্চেন্টদের ডেসপ্যাচ-সমূহের মাধ্যমে লণ্ডন শহরে পৌঁছুলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পিল কলকাতা-পুলিশের অনুকরণে ইংরাজি কায়দায় প্রথম লণ্ডন-পুলিশ তৈরি করেন ১৮২০ খ্রী.। ঐ সময়ে লণ্ডন শহরে সুগঠিত কোনো পুলিশ ছিল না। এ সম্বন্ধে কলকাতার সহিত লণ্ডনের তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। জনসংখ্যা ও আয়তনে

উভয় শহর তখন প্রায় সমান। উল্লেখ্য—লণ্ডন-পুলিশের একশত বৎসর পূর্বে কলকাতা-পুলিশ সৃষ্টি হয়। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ও জোসেফ গোল্ডস্‌-এর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দ্রঃ। মূল ইংরাজি মূল বয়ান পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হয়েছে।

"১৮২০ খ্রী. লণ্ডন শহরে কোনও পুলিশ-বাহিনী নেই। কতিপয় প্যারিস-ওয়াচম্যান অকর্মণ্য ও দুর্নীতি পূর্ণ। তাদের কোনও তদারকি কর্মী নেই। এরা অপরাধীদের মদত দেয় ও লুণ্ঠনে সাহায্য করে। লণ্ডন শহরে চব্বিশ জন নাগরিকদের মধ্যে এক-জন ক্রীমিন্যাল। তস্কর ও দুর্বৃত্তরা নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে। তারা প্রকাশ্য দিবা-লোকে নাগরিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। পরে রাজপথে পোস্টে বেঁধে তাদের উলঙ্গ করে নির্মম ভাবে প্রহার করে। প্রতিদিন টেমস নদীতে রবারি ও ডাকাতি হয়েছে। [সেখানে রিভার-পুলিশ নেই] রবারি বারগ্লারি ও চুরি অসংখ্য ও নিত্য-নৈমি-ত্তিক ঘটনা। ফুটপাথ-সমূহ ফুট-প্যাডদের দ্বারা অধিকৃত। শহরে অসংখ্য নোঙরা বস্তি সমূহ। গাভীর কানে মটর দানা পোরা হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করলে তাকে বল্লম দ্বারা খুঁচিয়ে মারা হয়। বস্তিবাসী বালকদের ঐ বয়েল-নিধন একটি প্রিয় ক্রীড়া।

হৃতসর্বস্ব নাগরিকরা এবং তৎসহ ব্যাঙ্কারগণ শেষে সম্পত্তি উদ্ধারার্থে অপরাধীদের নিকট কেঁদে পড়তো। অপরাধীরা বহু অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করে হৃত সম্পত্তির সামা-ন্যাংশ তাদের ফেরত দিতো।

তবু ঐ সময়ে লণ্ডনে আগে পিছু স্বল্পকালে দুইশত ব্যক্তির শুধু জালিয়াতি-অপরাধে ফাঁসি হয়। এক দিনেতেই একবার চল্লিশ জনের বেশি লোকের ফাঁসি হয়। নিউগেট প্রিজনে বহু শিশু-অপরাধী। সেখানে একটা স্কুল খুলতে হয়। লণ্ডনে শান্তিরক্ষার ভার সৈন্যদের উপর ছিল। তারা শুধু গুলিবর্ষণে অভ্যস্ত। ওই চরম মুহূর্ত এড়ানোর কোনও জ্ঞান তাদের নেই।

লর্ড পিল প্রথমে শহরের বস্তিগুলি উচ্ছেদ করে অপরাধী কমান। তরপর লণ্ডনববি [Boby] সম্বলিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লণ্ডন-পুলিশ তৈরি করেন। লণ্ডন-পুলিশে পুরনো কলকাতা-পুলিশের প্রভাব সুস্পষ্ট।"

[এই সময় গোলাবারুদ রসদ ও মাল বহনে গরুর গাড়ি ছিল অপরিহার্য। অন্য-দিকে যাত্রী বহনে একমাত্র পালকি সম্বল। শহরের উৎকলবাসী বাহকরা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা দেশেতে পাঠাতো।

১৮২৭ খ্রী. ২১শে মার্চ কলকাতা-পুলিশের কর্তৃপক্ষ পালকি-বাহকদের বিশেষ ব্যাজ পরিধানের এবং ফি প্রদান করে নম্বর ও লাইসেন্স গ্রহণের হুকুম দিলেন। প্রতিবাদে বাঙালী ও ওড়িয়া পালকি-বাহকরা ধর্মঘট করে গড়ের মাঠে সভা করে। সেটাই ভারতের প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভা। তার ফলে পালকির

বদলে শহরে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন হয়। এ সময় অন্যদের মতো পুলিশ-অধিকর্তা-রাও পালকি পরিত্যাগ করে দ্রুতগামী অশ্বশকট ব্যবহার করেন।]

লর্ড বেনটিঙ্ক [১৮২৯ খ্রী.] এ দেশীয় পুলিশকে ইংরাজি ধাঁচে তৈরি করতে চাইলেন। এজন্য তিনি একটি তদন্ত-কমিটি তৈরি করেছিলেন। সেই কমিটির সুপারিশ মতো পুলিশের বেতন কিছুটা বর্ধিত করা হলো। ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও এ্যাসেসমেণ্ট সম্বন্ধে নিয়ম-কানুনের অদল-বদল করা হয়। দেশীয় ব্যক্তিদের মিউনিসিপ্যাল কার্যে অধিকার দেওয়া হয়। কয়েকজন দেশীয় কমিশনার দেশীয়দের দ্বারা নির্বাচিত [?] হন।

লর্ড বেনটিঙ্কের নির্দেশে এই সময় কলকাতার স্থল ও নৌ-পুলিশ এবং বাংলা-পুলিশ যুক্তভাবে গঙ্গাসাগরে মানত-রক্ষা ও সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন। তবে সতীদাহ বন্ধ করা তাদের মনঃপূত না হলেও তারা ওই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিল। এজন্য কলকাতা ও বাংলা-পুলিশ প্রথম জনপ্রিয়তা হারায়।

[বি. দ্র.] সতীদাহ বন্ধ উপলক্ষে দেশীয় পুলিশ সর্বপ্রথম জনগণের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসে। বহুসংখ্যক জনগণ প্রতিরোধ করাতে পুলিশ সর্বপ্রথম লাঠিচার্জের আশ্রয় নেয়। তখন থেকেই পুলিশে লাঠিচার্জ প্রথা সৃষ্টি হয়। কিন্তু জনগণও অধিকার রক্ষার জন্য পুলিশকে প্রতি-আক্রমণ করতে দ্বিধা করে নি। এতে বহুসংখ্যক পুলিশ-কর্মী আহত হলে তাদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য শহরে সর্বপ্রথম বৃহদাকারে পুলিশ-হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল।]

[বি. দ্র.] সতীদাহ বন্ধ উপলক্ষে সর্বপ্রথম (তৎকালীন) ছাত্রদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয়। জনগণের সহিত সংস্কৃত টোলের (তৎকালীন স্কুল) এবং চতুষ্পাঠীর (কলেজ) কিছু ছাত্ররাও সতীদাহ বন্ধে ক্ষিপ্ত হয়। পাঠশালা বলতে তখন শিশুদের বিদ্যালয় বুঝাতো। ওঁরা শাস্ত্র নির্দেশ না খুঁজে আইন করে সতীদাহ বন্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্ম বিশ্বাসে বিদেশী হস্তক্ষেপ বুঝেছিল। উপরন্তু ওদের মধ্যে মধ্যে ওই সতীদের উদ্ধার করে তাদের স-সম্মানেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বা স্ব সমাজে তাদের ফেরত না দিয়ে খ্রীশ্চান করে বিবাহ করা বা উপ-পত্নী রাখা তাদের পছন্দ ছিল না। এই দুষ্কার্য জবচার্নক প্রথম করে বাঙালীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। [পরবর্তীকালে এই ভুল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর করেন নি। উনি বিধবা-বিবাহের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন, তৈরির পূর্বে প্রথমে শাস্ত্রীয় অনুমোদন খুঁজে বার করেছিলেন।]

এর পর থেকে সাবধান হয়ে ব্রিটিশ শাসকরা ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। এতে বহু কুসংস্কার এদেশে ধর্মের নামেতে রয়ে যায়। ওরা বুঝেছিলেন যে বারংবার ধর্মে হস্তক্ষেপ করাতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। ব্রিটিশরা ইতিহাস হতে প্রায়ই

শিক্ষা নিতেন। তাই আমেরিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ওঁরা আর কোনও ইংরাজকে ভারতে স্থায়ী অধিবাসী হতে দেন নি। তাঁদের ভয় ছিল যে আমেরিকার মতো ভারতে স্থায়ী অধিবাসী ইংরাজরাও ভারতের লোকদের সহিত একযোগে স্বাধীনতা চাইতে পারে।

বেনটিঙ্ক ভারতের প্রশাসন-ক্ষেত্রে বহু সংস্কার-সাধন করেছিলেন। তাঁর দ্বারাই বর্তমান আকারে [কর্নওয়ালিশের পর] ভারতীয় সিভিল সার্ভিস তথা কর্মকৃত্য সৃষ্ট হয়েছিল। এই আই. সি. এস. কর্মকৃত্য বস্তুতপক্ষে প্রশাসনের লৌহ-কাঠামো তথা স্টিল-ফ্রেম ছিল। আই. সি. এস.দের সর্বজ্ঞ মনে করে যে কোনও বিভাগে তাঁদের বহাল করা হতো। তৎকালে এঁদের সকলকেই য়ুরোপ হতে সংগ্রহ করা হতো। এই সময় একটি সর্বভারতীয় পুলিশ সার্ভিসও (I. P.) তৈরি হয়। কিন্তু তাতে ভারতীয়দের প্রবেশ অধিকার ছিল না। উপরন্তু তাদের বিভাগের সর্বোচ্চ পদে জনৈক সিভিলিয়ানাকে (I. C. S.) বহাল রাখার রীতি ছিল।

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দেও ক্ষমতাবান জমিনদারদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানো হয়েছে। তাদের ক্ষমতা খর্ব করে অবশিষ্ট জমিনদারী-পুলিশ ভাঙা হচ্ছিল। অবশ্য তখনও কিছু জমিনদারী-পুলিশ বাতিল করা হয় নি।* ফলে স্থানে স্থানে আরও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল। পাশাপাশি গভর্নমেণ্ট ও জমিনদারী থানার অবস্থিতি। ওগুলির মধ্যে কিছু বে-আইনী ও কিছু আইনসম্মত ছিল। কিছু বংশানুক্রম বরখাস্ত জমিনদারী-পাইকরা ডাকাত-দলে ভর্তি হয়। স্বত্বভোগী পুলিশকে বেতনভোগী করা কারোরই পছন্দ নয়। বেতনভোগীদের সেবামূলক মনোভাব থাকে না পূর্বতন পাইক ও বরকন্দাজরা নতুন গভর্নমেণ্ট পুলিশে ভর্তি হতে চায় না। কলকাতা থেকে পলাতক আসামীদের ওরা আশ্রয় দেয়। প্রদেশে গভর্নমেণ্টের নতুন পুলিশ তখনও শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি। সে জন্য বাংলা-পুলিশ এবং কলকাতা-পুলিশের মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এক কলকাতা পুলিশ মূলত শহরে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। তবে প্রয়োজন হলে তারা শহরগুলিতে পুলিশী-কাজ তো করবেই ; অধিকন্তু তারা কলকাতার চতুর্দিকে চব্বিশ পরগণার অভ্যন্তরে কুড়ি মাইল পর্যন্ত যাবে এবং গৃহতল্লাসী ও আসামী

* ১৮৬৬ খ্রী. D. T. Mc Niele I. C. S. স্পেশাল অফিসার রূপে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত রূপ একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন।

"দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বের ন্যায় উহার পরেও দেশের পুলিশ কার্যের ভার এই দেশের জমিদারদের উপরই অর্পিত আছে। ওই জমিদাররাই চুরি ও ডাকাতি অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ ও শান্তি রক্ষার জন্য এখনও দায়ী। তদন্ত-করে অপহৃত উদ্ধারের কার্য ওঁদের পুলিশেরই করণীয় কার্য।"

গ্রেপ্তার করবেন।

এজন্য কলকাতা-পুলিশের নিয়ন্ত্রক জাস্টিস অফ-পিসদেরও শহরের বাইরে প্রদেশের কুড়ি মাইল পর্যন্ত অভ্যন্তরে ম্যাজিস্ট্রেট করে তাঁদের ওই এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

[কলকাতার শহরতলি ক্রীত হওয়ার পর তা কলকাতা-শহরের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু চব্বিশ পরগণা জেলা ১৭৫৭ খ্রী. অধিগ্রহণের পর তা চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে, কলকাতার শহরতলি-পুলিশ চব্বিশ পরগণা-পুলিশের অধীন হলো। পরে অবশ্য ঐ শহরতলি পুলিশকে পুনরায় মূল কলকাতার মধ্যে আনা হয়।]

দুই (জেলা-পুলিশ) কলকাতার শহরতলিতে ও জেলাতে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু কলকাতার মূল শহরের মধ্যে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। মূল কলকাতা শহরে অপরাধ-নিরোধ ও নির্ণয় ব্যাপারে তারা ক্ষমতাশূন্য। মূল কলকাতা শহরে খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তারেও তারা অক্ষম।

কলকাতা শহরে হেড কোয়ার্টারস স্থাপিত করে গভর্নরের প্রত্যক্ষ অধীনে মৌর্য-রাজাদের ফেডারেল-পুলিশের মতো কলকাতা-পুলিশ'এবং প্রদেশ-পুলিশের জন্য একটি যুগ্ম গোয়েন্দা বিভাগ [ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশন ডিপার্টমেন্ট] ছিল। এই বিভাগে বহু প্রাচীন খোঁজী-সম্প্রদায়ের জাত-গোয়েন্দা বহাল ছিল। এরা সমগ্র বাংলাদেশে ও কলকাতা-শহরে গোয়েন্দার কাজ করতো। জেলাভিত্তিক বাংলা-পুলিশ ও কলকাতা-পুলিশের সঙ্গে এদের সহযোগিতা ছিল।

১৮৩৭ খ্রী. এই যুগ্ম-ব্যবস্থা বাতিল করে কলকাতা-পুলিশের নিজস্ব ডিটেকটিভ-বিভাগ স্থাপিত হয়। আজও উহা লালবাজার-ভবনে কার্যরত। জেলা-ভিত্তিক প্রদেশ পুলিশ উহার প্রতি জেলায় নিজস্ব গোয়েন্দা-বিভাগ তৈরি করে। তার ফলে কলকাতা-পুলিশের সঙ্গে প্রদেশের জেলাগত পুলিশের শেষ-সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়।

কলকাতার থানাদারী ও জল-পুলিশ এবং নতুন গোয়েন্দা-বিভাগ এই তিনটি সংস্থাই এই সময়ে এক য়ুরোপীয় পুলিশ-সুপারের অধীন হয়। তবে এই য়ুরোপীয় পুলিশ-সুপার জাস্টিস অফ-পিসদের অধীনে কর্মরত রইলেন।

পূর্বের যুগ্ম-গোয়েন্দা বিভাগ বংশানুক্রমে খোঁজী তথা গোয়েন্দাদের দ্বারা অপরাধ-নির্ণয় ও অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করতো। সমগ্র বাংলাদেশে এদের সুগঠিত ব্যবস্থা ও গতিবিধি ছিল। এরাই আন্তঃজেলার সংযোগ রক্ষা করতো। জনগণসব সময়েই এই কাজে তাদের সাহায্য করেছে। এরা জমিনদার-শাসকদের সাহায্যপুষ্ট ছিল। অধিকাংশ জমিনদারী-পুলিশ অধিকৃত হলে এরা ক্রমে বিরল হয়।

বিকেন্দ্রিত গোয়েন্দা-বিভাগের বেতনভুক পুলিশ-কর্মীরা নিজেরাই ছদ্মবেশে গোয়েন্দা-

গিরি করতে থাকে। কিন্তু এতে তারা সকল ক্ষেত্রে সফল হতে পারে নি। পরে বশী-ভূত করে সাধারণ মানুষ ও অপরাধীদের মধ্য হতে গুপ্তচর সংগ্রহ করা হয়। এ প্রথা আজও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু পূর্বের জাত খোঁজীদের মতো স্বল্পকালে সমগ্র সম্পত্তি এরা উদ্ধার করতে পারে না।

১৮৩৮ খ্রী. বার্ড কমিটির সদস্য মিঃ এফ. সি. হ্যালিডের সুপারিশ মতো বাংলা ও কলকাতা-পুলিশদ্বয়কে একই পুলিশ প্রধানের অধীন করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তখনও বাংলা-পুলিশ জেলাভিত্তিক। জমিনদারী-পুলিশ সম্পূর্ণ ভাঙা যায় নি। বাংলা-পুলিশ কলকাতা-পুলিশের মতো সুসংহত নয়। ঐতিহ্যময় কলকাতা-পুলিশ সাম্রাজ্যের প্রথম পুলিশ। ইংরাজ জাতিরও ইহা একটি গর্বের বস্তু। দেশীয়দের মত লণ্ডন শহর হতেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। ফলে এই অবাস্তর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

১৮৪৫ খ্রী. কলকাতা-পুলিশ এবং বাংলা পুলিশেও পাইক বরকন্দাজদের প্রাধান্য বেশি। বাংলা-পুলিশের থানা-ইনচার্জের শুধু থানাদারদের বদলে দারোগা করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের থানা-ইনচার্জ তথা থানাদাররাও তখন দারোগা হলেন। কলকাতা-পুলিশে প্রত্যেকজন এবং বাংলা-পুলিশে [বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগ-পুর] অধিকাংশ কর্মী তখন স্বস্ব প্রদেশীয়।

পুরানো বাংলা নাটকে কলকাতা-পুলিশের মুখের ভাষা—'কনে কনে?' [অর্থাৎ কোথায় চোর] তাদের মুখে 'কাঁহা কাঁহা' শোনা যেতো না। আপদে লোকে পুলিশ-পুলিশ বলে হাঁক-ডাক না করে 'পাইক-পাইক' বলে ডাকাডাকি করতো। সেই কালে সাধারণ লোকে পুলিশকে পাইক বলতো।

থানায় কাজকর্ম বরাবরই বাংলা ভাষাতে সমাধা হতো। নথিপত্রের সারাংশ জনৈক ইংরাজীনবিশ ইংরাজ-সুপারিনটেণ্ডেন্টের নিকট তর্জমা করে পাঠাতো। সংখ্যায় স্বল্প হওয়ায় এরা থানাগুলিকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করে নেয়। কলকাতা-পুলিশের ১৯০৮ খ্রী. পর্যন্ত যাবতীয় নথিপত্র বাংলায় লেখা হতো। তারপরে ধীরে ধীরে থানার ভাষা ইংরাজি করা হয়।

[ওইকালে বাংলাদেশের বহুস্থানে বাংলা-পুলিশ জেলাভিত্তিক পুলিশরূপে একজন ইংরাজ পুলিশ-সুপারের অধীনে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। অবশ্য জমিনদারী-পুলিশও তখনও কিছু-কিছু স্থানে ছিল।]

১৮৪৫ খ্রী. ডালহাউসির নিযুক্ত একটি কমিটির সুপারিসে লণ্ডন-পুলিশের কিছু আইন-কানুন তৎকালীন কলকাতা-পুলিশে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ কলকাতা পুলিশ হতে শেখা বিদ্যা লণ্ডন-পুলিশ কলকাতা-পুলিশকেই শেখায়। এঁরা কলকাতা-পুলিশের পদগুলির দেশীয় নাম পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জনবিক্ষোভের ভয়ে

বেশ কিছুকাল ওঁরা তা থেকে বিরত থাকেন।

এঁরা কলকাতা-পুলিশের বরকন্দাজদের মাসিক বেতন বর্ধিত করে পাঁচ টাকা করেন। এতকাল সমগ্র কলকাতা-পুলিশ (গোয়েন্দা ও জলপুলিশ-সহ), একজন সুপারিনটেন-ডেণ্টের অধীন ছিল। এঁদের সুপারিশে আর একজন সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হলো। এঁরা গোয়েন্দা পুলিশ তথা ডিটেকটিভ-বিভাগকে পৃথক করে ওই নবনিযুক্ত সুপারিনটেনডেণ্টের অধীন করেন। সেই সঙ্গে জলপুলিশকেও এই নবনিযুক্ত পুলিশ-সুপাবের অধীন করা হয়। কলকাতা-পুলিশে তখন দু'জন পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হলেন।

১৮৫৬ খ্রী. ডালহাউসির নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশে কলকাতায় মিউনসিপ্যাল, বিচার-বিভাগ ও পুলিশ-বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক করা হলো। জাস্টিস অফ-পিসদের পদগুলি বাতিল হযে যায়। কলকাতা পৌরসভা একজন পৌর-প্রধানের অধীন হয়। বিচারেব কাজের জন্য জাস্টিস অফ-পিসদের বদলে শহরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনটি পুলিশ-কোর্ট স্থাপিত হলো। একজন পুলিশ-কমিশনারেব পদ সৃষ্টি করে কলকাতা-পুলিশকে জলপুলিশ, সল্ট-পুলিশ এবং আবগারী পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক দল আদি কযটি বিভাগও তাঁর অধীন হলো। অবশ্য পরে আবগারী-পুলিশ পৃথক সংস্থা রূপে পৃথক অধিকারের অধীন হয়।

[পুলিশ কোর্টটি পুলিশের সঙ্গে ওই কালে লালবাজারে ছিল। পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য করতে উহাকে ঐ সময় পৃথক পৃথক ভবনে স্থাপিত করা হলো। বর্তমান ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ভবনটি তৎজন্য ঐ সময় অধিগৃহীত হয়।]

এই নবনিযুক্ত পুলিশ-কমিশনারকে সীমিত ক্ষমতা-সহ অপরাধী গ্রেপ্তার ও আটক এবং শহরে শান্তি-রক্ষার জন্য জাস্টিস অফ-পিসও করা হলো। ইনি তখন একাধারে পুলিশ-কমিশনার এবং জাস্টিস অফ-পিস।

[কলকাতার পূর্বতন প্রশাসক জাস্টিস অফ-পিসদের নামগুলি এখনো আমি পাই নি। পোল্যাণ্ডের 'ওয়ারস' যুনিভারসিটির প্রফেসর আমার ভ্রাতা ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল পি. এচ. ডি. আমার তরফে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া-অফিসে ও অন্যত্র নথিপত্র ঘেঁটেছে। ওখানে গোবিন্দরাম সম্পর্কে তথ্যাদি পেলেও ঐ জাস্টিসদের নামে সে পায় নি। কিন্তু কারো নামে কিবা আসে যায়। গোবিন্দরামের পুলিশের পর এই জাস্টিস অফ-পিসদের কলকাতা-পুলিশই জনপ্রিয় রূপে স্বীকৃত।]

[বি. দ্র.] কলকাতা-পুলিশকে সৈন্য-বাহিনীর সহিত সর্ব প্রথম রামগড়ে নেওয়া হয়। একথা পূর্ব আখ্যানভাগে আমি বলেছি। কলকাতা-পুলিশকে দ্বিতীয়বার সৈন্য-বাহিনীর সহিত তিতুমিয়ার বাঁশের কেল্লা দখলে বারাসতের নিকট একটি স্থানে

পাঠানো হয়। অবশ্য বারাসত কলকাতা শহরের কুড়ি মাইলের মধ্যে হওয়ায় তারা তার অধিকারী ছিল (তৃতীয়বার কলকাতা-পুলিশ টেগার্ট সাহেবের সহিত বিপ্লবী দমনে চন্দননগরে যায়।) কলকাতা-পুলিশকে মোট তিনবার কলকাতার বাইরে অভিযানে যেতে হয়।]

[তিতুমিয়ার বাঁশের কেল্লা ধ্বংস-কালেও সৈন্যদের সাথে কলকাতা-পুলিশের একদল তথা সশস্ত্র পাইক ছিল। 'শুট টু' কিল—অর্থাৎ হত্যার জন্য গুলি করো, নচেৎ গুলি করো না। এটা একটা পুরানো হুকুম। প্রথমে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। তাতে তিতুমিয়ার সঙ্গীরা রটায় : 'তিতুমিয়া গুলি খা লিয়া' ফলে পরে বহু জীবন-হানি ঘটে। সেই প্রতিবেদনে উক্ত হুকুম প্রথম দেওয়া হয়। সেই হুকুম আজও বাংলা ও কলকাতা পুলিশে রয়েছে।

এ যুগেও ব্লাঙ্ক-ফায়ার করলে বা শূন্যে গুলি ছুঁড়লে সংশ্লিষ্ট নেতারা লোককে বোঝান যে পুলিশ তাঁদের পক্ষে। এতে পরে বহু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এজন্য পূর্বে বন্দুকের বদলে লাঠি ব্যবহার করা হতো। তৎকালে ঘূর্ণায়মান লাঠির দ্বারা দেশীয় লাঠিয়ালরা বন্দুকের গুলিও আটকেছে।]

এই সময় ভারতব্যাপী সিপাহী মিউটিনি শুরু হলো। এতে ব্রিটিশরা ভারতীয় মাত্র-কেই অবিশ্বাস করতে থাকেন। সিপাহী মিউটিনির পর সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেক স্থানের জমিনদারী-পুলিশ তথা জাতীয় পুলিশ ভেঙে দেওয়া হলো। অমান্যকারীদের এজন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। ব্রিটিশরা দেশীয় সংগঠনগুলিকে ভয়ের চোখে দেখে। এজন্য প্রয়োজনে মিলিটারীও নিযুক্ত করা হতো।

[বি. দ্র.] সিপাহী মিউটিনির পর ইংলণ্ডেশ্বরী তথা ইংরাজ গর্ভমেণ্ট কোম্পানীর নিকট হতে ভারতের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে ইংরাজ ও স্কচ উভয় জাতিই ছিল। রাজত্ব হস্তান্তরে অধিকাংশ স্কচ কোম্পানীর ব্যবসায় বিভাগে এবং অধিকাংশ ইংরাজ উহার গর্ভমেণ্ট বিভাগে চলে এসেছিল। এতে ইংরাজদের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

এবার সমগ্র প্রদেশব্যাপী নীরব বিক্ষোভ। কলকাতা-পুলিশের পাইকরাও সন্ত্রস্ত! এদের আশংকা ও অনুমান ভুল হয় নি। এই নীরব বয়কটের ফল অবিলম্বে ফললো। কলকাতা-পুলিশের নিম্নপদগুলি বাঙালীশূন্য করা হলো।

দেওয়ান, পূর্বতন দারোগা ও থানাদাররা পূর্বেই বাতিল হয়েছিল। এবার পাইক-বরকন্দাজদের বিদায় নিতে হলো। সুবা-বাংলার পুলিশেরও একই অবস্থা। ব্রিটিশরা নিম্নপদী বাঙালী পুলিশকে বিশ্বাস করেন নি। তবে পরবর্তীকালের থানাগুলির দারো-গারা রাজভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেন। তাই তাদেরই শুধু বিশ্বাস করা হয়। এবং

বহাল ভবিষ্যতে রাখা হয়। সুবা বাংলার জাতীয় ঐতিহ্যের শেষ-চিহ্ন বিলুপ্ত হলো। দায়িত্বহীন ও কর্তৃত্বহীন নতুন জমিনদাররা অলস ও উৎপীড়ক হয়। এদের অধিকাংশ পত্তনীদার ও কলকাতার ব্যবসায়ী। পূর্বতন রাজবংশের অধিকাংশই বিলুপ্ত। তাদের উত্তরপুরুষরা জানে না যে তারা কোন্ রাজবংশের সন্তান। কারণ এদের অধিকাংশই দু'পুরুষের অধিক পূর্বপুরুষের নাম জানে না। এরাই বোধকরি ভারত হতে ব্রিটিশ-বিতাডনে অধিক উৎসাহী ছিল।]

সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের জন্য কলকাতা হতে যাবতীয় সেনাবাহিনীকে উত্তরভারতে প্রেরণ করে কলকাতা-পুলিশকে শহর-রক্ষার ভার দেওয়া হয়। এই কার্য কলকাতা-পুলিশ সুষ্টুরূপে ও নির্ভয়ে দক্ষতাব সহিত সমাধা করেছিল।

সিপাই মিউটিনিব পর দেশীয় সৈন্যদের বহু বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। তাদের স্থলে ইংল্যাণ্ড হতে গোরা-সৈন্যদের আনা হলো। ঐ সকল বরখাস্ত অথচ অনুগত সিপাহী-দেব পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়। তাই কলকাতা ও বাংলা-পুলিশের বাঙালী-পরিত্যক্ত নিম্নপদগুলি পূরণে আর অসুবিধা নেই। সিপাহী, জমাদার ও হাবিলদারদের দলে দলে কলকাতা ও বাংলা-পুলিশে ভর্তি করা হলো। পুরানো পুলিশের পাইক ও নায়কদের যথাক্রমে সিপাহী ও জমাদার নাম হলো।

[বি.দ্র.] ১৮৫৭ খ্রী. কলকাতার নিকটবর্তী বারাকপুর হতে সিপাই মিউটিনি শুরু হলো। তখন মাত্র বাংলাদেশে সুগঠিত ও বৃহৎ সমরশক্তি-সম্পন্ন কলকাতা ও বাংলা-পুলিশ। তাবা নিয়োগ-কর্তাদেব প্রতি অনুগত থাকাই পছন্দ করে। বিশ্বাসঘাতকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের ঐতিহ্য-বিরোধী। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ইংরাজ শাসকরাই তাদের প্রতি করলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তাদের বিদায় দিয়ে ঐ সিপাহীদের দ্বারাই কলকাতা ও বাংলা-পুলিশের নিম্নপদগুলি তাঁরা পূরণ করলেন।

[সিপাহী-বিদ্রোহ কলকাতার সন্নিকটে বারাকপুর ছাউনিতে প্রথম শুরু হয়। ব্রিটিশদের মূল ঘাঁটি কলকাতা দখল না করে তারা দিল্লী-চলো ধ্বনি দেয়। নেতৃত্বহীন দেশ-ওয়ালী মুল্লুকী সিপাহীরা তখন স্ব স্ব মুল্লুকে ফিরতেই বেশি আগ্রহী। ওরা কলকাতা দখল করলে কানপুরের পতন অতো সহজ হতো না।

সিপাহী-মিউটিনি দমনের খরচ ওঠাতে প্রথম আয়কর গ্রহণ করা হয়। পরে সমগ্র পৃথিবীতে তার অনুকরণে রাজস্ব বাড়াতে আয়কর-প্রথার সৃষ্টি হয়।]

ব্রিটিশ প্রথম কিছু বাঙালী-সামন্তদের নিজস্ব ফৌজের বিলুপ্তি ঘটায়। হেস্টিংস তাঁদের বিচারালয়গুলি বাতিল করেন। কর্নওয়ালিশ ও পরবর্তীরা জাতীয় পুলিশ ভেঙে দেন। কিন্তু তাদের জাতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন রয়ে যায়। এগুলি প্রাচীন হিন্দু-আইন ও মুসলিম-আইন অদল-বদল করে জমিনদার-শাসকরা যুগোপযোগী করে

ব্রাহ্মণ ও মৌলবীদের সাহায্যে ও অনুমোদনে তৈরি করেছিলেন। অধিগৃহীত ব্রিটিশ-আদালতগুলিতেও এদেশীয় আইনে বিচার করা হতো। জনগণের ইচ্ছা ও বিবেকের সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ ছিল। অবশ্য সুপ্রীম-কোর্ট মাত্র একবার, নন্দকুমারের বিচারে বিলাতি আইনের সাহায্য নেন। বাংলাদেশের আদালতগুলির বিচারপদ্ধতি বহুকাল পূর্বের অনুরূপ ছিল।

১৮৪০ খ্রী. বাঙালী-বিদ্বেষী বেনথাম ও মিল-সাহেব দেশীয় আইনের পরিবর্তে য়ুরোপীয় আইনের জন্য প্রতিবেদন দিলেন। মেকলের অধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি আইন-কমিশন বসল। তাঁরা ইণ্ডিয়ান পিনাল-কোডের আইনগুলি বিলাতি আইন-অনুসারে তৈরি করলেন। কিন্তু তখনও বাংলার বহু স্থানে বৈধ ও অবৈধ জমিনদারী-পুলিশ ও দেশীয় আইন বর্তমান থাকায় ব্রাহ্মণ ও মৌলভী সমাজ ও জনগণ তার বিরোধী হয়ে উঠলো। তাই পরবর্তী কুড়ি বৎসর ওই আইন কায়েম হলো না। ঐ সময় জনগণ এবং ব্রাহ্মণ ও মৌলভীদের সম্মিলিত মতবাদের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"বিদেশী আইন এ-দেশের ধ্যান ও ধারণার উপযোগী নয়। আইন স্বল্পসংখ্যক, সুবোধ্য, জনপ্রিয়, সরল ও পালনযোগ্য হতে হবে। কিছু দেশীয় আইন তাতে সংযোজিত হলেও তার ইংরাজিকরণ দুর্বোধ্য। তার ব্যাখ্যার জন্য বহু টিকা টিপ্পনীর প্রয়োজন হবে। মামলাগুলির মিটমাট করার ব্যবস্থা ওতে নেই। এক শ্রেণী লোভী দালাল ও আইনজীবীর প্রয়োজন অনিবার্য। লোকে আর বিনা ব্যয়ে বিচার পাবে না। আইনের ফাঁকে দোষীরা সাজা এড়াবে ও নির্দোষীরা সাজা পাবে। জনগণ মিথ্যা-সাক্ষী দিতে শিখবে। আইন-অমান্যকারী অপরাধী ও পাপীদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। জনগণ অশান্ত, মামলাবাজ, লোকমত-বিরোধী ও অসামাজিক হবে। বাদী, প্রতিবাদী ও উভয়পক্ষের সমর্থকরা ও সাক্ষীরা মুহুর্মুহুঃ উত্তেজনাজনিত মতিভ্রমগ্রস্ত এবং অপরাধীমনা হবে।"

জনগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুড়ি বৎসর যাবৎ বহু বাদানুবাদ ও টালবাহানার পর কলকাতা ও বাংলা-সহ সমগ্র ভারতের জন্য স্যার বেরিন্না পিককের কর্তৃত্বাধীনে ১৮৬২ খ্রী. এই আইন বিধিবদ্ধ হলো। কিন্তু উহা আরোপণের জন্য ১লা জানুয়ারী ১৮৬২ খ্রী. পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

বাঙালী এতদিনে তাদের জাতীয় ফৌজ, পুলিশ, আদালত এবং জাতীয় আইনহীন প্রায় পরাধীন জাতিতে পরিণত। কিন্তু মনের স্বাধীনতা তারা কোনও দিন হারায় নি। গ্রামীণ লোকদের পক্ষে একথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

মিঃ ককবার্ন, আই. সি. এস.
[Mr. Cockburn, I. C. S.]

ডালহাউসির সময় কলকাতা-পুলিশে কমিশনার-পদসৃষ্টির পর কলকাতা পুলিশকে পুনর্বার নূতন করে তৈরি করা হলো। ডালহাউসি নিযুক্ত একটি রিফর্ম কমিটির সুপারিশে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ ককবার্ন, আই. সি. এস. কলকাতার প্রথম পুলিশ-কমিশনার হলেন [১৮৫০-৫৬ খ্রী.]।

তাঁর সময়ে কলকাতা পৌরসভা, বিচার-বিভাগ এবং পুলিশ-বিভাগ তিনটি পৃথক সংস্থায় পরিণত হয়। কলকাতা শহরে প্রথম জুডিসিয়ারি ও একসিকিউটিভ এবং পৌরকার্য পৃথকীকৃত হলো।

পূর্বে কলকাতা-পুলিশ হিংস্র পশুবধ ও অন্য পশু ধরার কাজ করতো। অগ্নিনির্বাপণের কাজও তাদের করতে হতো। পশুধরা (হিংস্র পশু তখন নেই) ও অগ্নিনির্বাপণ পুলিশের হাতে রইল। এই সব কাজ তখন থানাভিত্তিক ছিল।

[পরে অগ্নিনির্বাপণের ভার পৃথক সংস্থার অধীনে হেড-কোয়ার্টারস পুলিশের অধীন হয়। এখন এই কাজ একটি পৃথক ডাইরেকটরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গবাদির জন্য ক্যাটেল পাউণ্ড ও কুকুরাদির জন্য ডগ পাউণ্ড আজও কলকাতা-পুলিশের অধীন।

সৃষ্টিকাল হতে কলকাতায় বিচারের কাজ দেশীয় আইনে হতো। জমিনদার-শাসকদের মতো কলকাতার পুলিশ-প্রধানরা নিজেরা আইন প্রণয়ন করতেন। কলকাতায় একসিকিউটিভ-ক্ষমতা পুলিশ-কমিশনারের উপর ছিল। প্রয়োজনমতো শহর-শাসনে কিছু উপ-আইন এঁরা তৈরি করতেন। পৃথকীকৃত বিচার-বিভাগে ঐ সকল আইনে বিচারের কাজ করতেন। কিন্তু বিচার-ক্ষমতা ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের অন্য ক্ষমতা কলকাতা পুলিশের থাকে। তাঁরা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন। তদন্তান্তে কয়েদীদের নিজেরাই মুক্তি দিতেন। প্রয়োজনমতো কমিশনার কয়েদীদের হাজতে রাখতেন।

[পুলিশ অ্যাক্টের একটি ধারামতো আজও তারা কিছু উপ-আইন পূর্বের মতো তৈরি করার অধিকারী।]

অভিযুক্তরা রাজী হলে কমিশনার-সাহেব ছোট মামলা বিচার করে তাদের সামান্য জরিমানা করে মুক্তি দিতেন। কিন্তু ওরা রাজী না হলে মামলা আদালতে যেতো।

[উক্ত প্রথানুযায়ী পরবর্তীকালে কলকাতার ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার পুওর ফাণ্ডে চাঁদা গ্রহণ করে আসামীদের কোর্টে না পাঠিয়ে মুক্তি দিতেন। এতে তারা সাবধান হবার ও শোধরাবার সুযোগ পেতো। দাগী না হওয়াতে এদের জীবন বিফল বা মনোকষ্ট হতো না। ঐ প্রথা অপরাধীর সংখ্যা কমানোর সহায়ক। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কায়েম ছিল।]

মিঃ ওয়াটচপ
[Mr. Wattchope]

মি. ওয়াটচপ, আই. সি. এস. (১৮৫৭-৬৩ খ্রী.) কলকাতা-পুলিশের দ্বিতীয় পুলিশ-কমিশনার হলেন। তাঁর কর্মকাল ঘটনাবহুল ছিল। তাঁর কর্মকালের দ্বিতীয় বৎসরে (১৮৫৭ খ্রী.) সিপাই-বিদ্রোহ শুরু হয়। ওই বিদ্রোহের শেষে মহারানী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির নিকট হতে ভারতের শাসনভার নেন। তখন কলকাতা-পুলিশ ক্রাউন-পুলিশ আখ্যা পায়।

মিঃ ওয়াটচপের কর্মকালের পঞ্চম বর্ষে কুড়ি বৎসর যাবৎ মুলতবি-রাখা ইণ্ডিয়ান পিনাল-কোড দেশীয় আইনের পরিবর্তে ১৮৬২ খ্রী. কলকাতা-সহ ভারতে প্রথম আরোপিত হয়। কিছুকাল পূর্বতন আইন ও উক্ত পিনাল-কোড পাশাপাশি চলে। তাতে অসুবিধা হওয়ায়, বহু পরে দেশীয় আইনগুলি বাছাই করে কলকাতা-পুলিশ-অ্যাক্ট পরবর্তী কমিশনারের সময় ১৮৬৬ খ্রী. তৈরি হয়।

বি. দ্র. ইংরাজরা প্রথমে বাঙালীর সৈন্যদল ও পরেতে তাদের নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা ও তার পরে তাদের নিজস্ব জাতীয় পুলিশ কেড়ে নেয়। এইবার তারা তাদের দেশীয় আইনগুলিরও বিলোপ ঘটালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণ স্বেচ্ছায় পূর্বতন জমিনদার ও পল্লীর মান্যগণ্যদের নিকট বিচারপ্রার্থী হতো। এ অবস্থা এড়াতে এবং হৃতসর্বস্ব জমিনদারদের খুশি রাখতে শাসককুল তাদের ও পল্লীর ধনী মানীদের মধ্য হতে অনারারি হাকিম নিযুক্ত করতে থাকেন। এঁরা ধনী সম্মানীয় হওয়ায় উৎকোচ উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না এবং সম্ভবমতো মামলা-সমূহ মিটিয়ে দিতেন। পল্লীর জনগণ আজও পর্যন্ত তাদের পূর্ব-অভ্যাস ত্যাগ করেন নি। এ যুগেও তারা বিচারের জন্য পল্লীর মোড়ল ও পাঁচজনের দ্বারস্থ হয়। মামলাবাজ না হলে ইলেকটেড পঞ্চায়েত ও যুনিয়ন-বোর্ডের বিচারও তাদের পছন্দ নয়। মান্যগণ্যদের বেছে নমিনেট করে এই অবস্থা এড়ানো যায়। কারণ সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিরা প্রায় ইলেকসনের ঝামেলা সহ্য করতেও দলভুক্ত হতে চায় না। অধিকন্তু এ-ও স্বীকার্য যে দল ও গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ হতে পারে না।

কমিশনার ওয়াটচপের কর্মকালের শেষ বছরে বাঙালী পাইক ও নায়কদের কলকাতা ও বাংলা-পুলিশ হতে বিদায় দিয়ে সেক্ষেত্রে নিম্ন-পদগুলি হিন্দীভাষী ফৌজী সিপাহী জমাদার হাবিলদারদের দ্বারা পূরণ করা হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ডিসব্যান্ডেড সিপাহী জমাদারদের পুনর্বাসনের জন্য তার প্রয়োজন হয়। তবে উভয়-পুলিশের মধ্য-বর্তী পদগুলি পূর্বের মতো বাঙালীদের দ্বারাই অধিকৃত থাকে।

মিঃ ওয়াটচপের কর্মকালে হাওড়া-শহর চার বৎসরের জন্য কলকাতা-পুলিশের অন্ত-

ভুক্ত হয়। কিন্তু নদী-পারাপারের সুব্যবস্থার অভাবে অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে, পরবর্তীকালে হাওড়া-শহরকে কলকাতা-পুলিশ হতে বার করে বাংলা-পুলিশে দেওয়া হয়।

তাঁর কর্মকালের শেষ বছরে তিনি কলকাতা সিপাই জমাদারদের পদগুলিকে কনেস্টবল ও হেড-কনেস্টবল করেন। পুলিশের মধ্যবর্তী পদগুলিরও তিনি ইন্সপেক্টর-আদি ইংরাজী নামকরণ করেন। তবে পুলিশের কাজকর্ম ও থানার নথিপত্র পূর্বের মতো বাংলায় লেখা হতে থাকে।

[তৎকালীন সেরেস্তা, লালকেতাব, অভিযোগ-বহি, বয়াম তথা ভিসারা, তদন্ত কার্য, মালখানা, ময়না-তদন্ত, সরজমিন-তদন্ত, খানা-তল্লাস, আসামী, এলাকা, চৌকী, ফাঁড়ী, থানা, ফরিয়াদী, গ্রেপ্তার, মুন্সীবাবু, হাতকড়া, হাজত ঘর, মামলা-দায়ের, দায়রা-আদালত, সোপর্দকরণ, উর্দী, পেটি তথা বেল্ট, জবানবন্দীগ্রহণ, বয়ান-লেখা, হাকিম-সাহেব, পেশকার, চৌহদ্দী, গরহাজির, গাফলতি বেয়াদবী প্রভৃতি বাংলা নাম আজও রয়ে গেছে।]

কমিশনার ওয়াটচপ বাংলা-পুলিশেও বহু পরিবর্তন ঘটান। বাংলা পুলিশের উন্নতির জন্য ১৮৯৩ খ্রী. একটি কমিটি গঠিত হয়। কলকাতার পুলিশ-কমিশনার ওয়াটচপ ওই কমিটিব প্রেসিডেন্ট হন। মাদ্রাজের মিঃ রবীনসন, সীমান্ত-প্রদেশের মিঃ কট, পেগুর মিঃ ফয়েড তার সদস্য হন। উদ্দেশ্য—বাংলা ও কলকাতা-পুলিশ হতে দেশীয় পদগুলি বাতিল করে লণ্ডনের মতো কনস্টেবল, ইনস্পেক্টর প্রভৃতি করা। এই কাজ উভয়-পুলিশেই (বাংলা ও কলকাতা) কিছু আগে ও পরে সমাধা হয়।

উক্ত কমিশন বাংলা-পুলিশে উল্লেখ্য পরিবর্তন আনে। বাংলা-পুলিশে পুনর্গঠন একে বলা চলে। এই কমিশন আধুনিক বাংলা-পুলিশের কাঠামো তৈরি করে। অবশ্য এর পরে অন্য কমিশনও তার পরিবর্তন ঘটায়।

প্রদেশ-পুলিশে সুপারিনটেণ্ডেন্টদের সাহায্যের জন্য একজন এ্যাসিসটেন্ট পুলিশ-সুপার নিযুক্ত হয়। এঁদের অধীনে প্রতিটি সার্কেলের জন্য একজন সার্কেল-ইনস্পেক্টর বহাল হলো। দারোগার বদলে সাব-ইনস্পেক্টরকে থানা-ইনচার্জ করা হলো। থানার অধীন ফাঁড়িগুলির ভার হেড-কনস্টেবলদের উপর রইলো। পুলিশ জেলাভিত্তিক রূপে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন থাকলো না। তাকে প্রদেশ-ভিত্তিক করে একজন ইনস্পেক্টর-জেনারেলের অধীন করা হলো। ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের এক ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর-জেনারেল করা হয়। থানার ইনচার্জদের তদন্তাদিতে সাহায্যের জন্য জুনিয়ার সাব-ইনস্পেক্টররা রইলেন। পূর্বে এ সকল কাজে পুলিশের নায়েবরা থানাদারদের সাহায্য করতো।

পুলিশ-সুপার ও এ্যাসিসটেন্ট-সুপারগণের পদে মাত্র ইংরাজদের ভর্তি করা হতো। এঁদের সরাসরি ইংল্যাণ্ড হতে আমদানি করা হয়। কোনও ভারতীয়কে এ-পদগুলিতে নেওয়া হতো না। ব্যতিক্রম হিসাবে আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল-কে (জন্ম ১৮২০ খ্রী.) প্রথম ভারতীয় এ্যাসিস্টেণ্ট পুলিশ-সুপার করা হয়।

[এ সময়ে পুলিশ-ইনস্পেক্টর পদ হতে বহু ব্যক্তিকে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হতো। এদের সাহেবী-পদ এ্যাসিস্টেণ্ট পুলিশ-সুপার করা হতো না। এ-পদ শুধু য়ুরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ডেপুটি পুলিশ-সুপারের পদ তখনও সৃষ্টি হয় নি।

পুলিশ-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগের জন্য মাত্র এক বৎসর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শীঘ্রই দেখা যায় যে পুঁথিগত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা দক্ষ পুলিশ-কর্মী হন না। এজন্য পরে এ-প্রথা পরিত্যক্ত হয় এবং তাদের পূর্বের মতো মনোনীত করা হতে থাকে। তবে কিছু ব্যক্তিকে বাহির হতে সরাসরি ইনস্পেক্টর-পদে নিয়োগ করা হয়। ওদের কিছু ব্যক্তিকে ঐ-পদে সাব-ইনস্পেক্টর হতে উন্নীত করা হয়।]

নতুন আইনে জেলাভিত্তিক বাংলা-পুলিশ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন হতে মুক্ত হলো। তবে বিচার ও আইন-সম্পর্কিত তাঁদের আদেশসমূহ পুলিশকে মানতে হবে। পূর্বের মতো পুলিশ ছোট মামলা [Non-Cog] তদন্ত কবতে পারবে না। অপরাধ-সমূহ পুলিশ-অগ্রাহ্য ও পুলিশ-গ্রাহ্য [Cog] রূপে বিভক্ত হলো। পুলিশ-অগ্রাহ্য মামলা শুধু হাকিমের এক্তিয়ারে থাকবে। সকল বিচার-কার্য মাত্র হাকিমরা করবে। পুলিশ-প্রধানদের কোনও বিচার ক্ষমতা থাকবে না।

বাংলা-পুলিশে এ সময় ইনস্পেকটরদের একশত টাকা এবং সাব-ইনস্পেকটরদের পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন ছিল।

[দারোগা পদটির নামও বিলুপ্ত হলো। পরে সাব-ইনস্পেক্টররা তাদের দারোগা বললে ক্রুদ্ধ হতো। এ নামের উপর জনতার আজও মোহ। জনগণ তাই এখনও তাদের এ নামে ডাকে।]

কলকাতা-পুলিশ অপেক্ষা বাংলা-পুলিশের জীবন বহু গুণে কঠোর। আমার পিতামহ রায় বাহাদুর (বাংলার তৃতীয় রায় বাহাদুর) কমলাপতি ঘোষাল প্রথম দেশীয় এ্যাসি-স্টেণ্ট পুলিশ-সুপার হন। শৈশবে ছিয়ানব্বই বর্ষ বয়স্কা পিতামহীর নিকট পুরানো পুলিশের বহু কাহিনী শুনেছি। পিতামহীর মুখে শোনা বিবরণের কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

"বজরাতে করে পিতামহ থানাগুলি বাৎসরিক পরিদর্শনে যেতেন। ঐ বজরাতে পিতা-মহীও থেকেছেন। সম্মুখে ও পিছনে দুইটি ছই-ঢাকা বড় নৌকা। তাতে ঢাল-তরো-

য়াল বর্শা ও বন্দুকধারী শাস্ত্রী। ঘাটে ঘাটে পালকি থাকত। এ পালকিতে চেপে তিনি থানা-পরিদর্শন করতেন। পরে সেই বজরাতে তিনি ফিরতেন। মাসাধিক কাল নদীতে বাস করে তাঁরা বাংলোয় ফিরতেন। ঘাটে তাঁদের জন্য পালকি তৈরি থাকতো।

বাংলোর সম্মুখে কয়েকজন শাস্ত্রী সারা রাত ডিউটি দিতো। একজন শাস্ত্রী রাত্রে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। অন্যান্য শাস্ত্রীদের ঢাক-ডিউটি থাকতো। নিকটে বাঘের গর্জন শোনা মাত্র তারা ঢাকে কাঠি দিত। তারা সারারাত্রি ঢাক পিটিয়ে বাঘ তাড়াতো। মধ্যে মধ্যে বাংলোর রোয়াক পর্যন্ত কুমির উঠে এসেছে। তাদের রেড়ির তেলের ডিবা ও মশালের আগুন ছিল সম্বল। সাপ-মশা তাড়াতে ধুনো দেওয়ার জন্য ধনুচি-আর্দালী ছিল। বাংলোর ঘরে মোমবাতির ঝাড় জ্বলতো। একজন সাপুড়েকে ওইকালে সাপ তাড়াবার জন্য কনস্টেবলরূপে ভর্তি করা হতো।

বাংলা প্রদেশ-পুলিশ সম্বন্ধে কিছুটা বলা হলো। কারণ, একই সঙ্গে উভয়-পুলিশের পরিবর্তন ঘটে। এই সময় কলকাতা-পুলিশ পুনরায় কলকাতা পৌরসভার সহিত যুক্ত হয়।

১৮৬৪ খ্রী. স্যানিটারি-কমিশনার জন টার্চ কমিটির সুপারিশে ঠিক হলো যে একই ব্যক্তি কলকাতা-পুলিশের কমিশনার ও কলকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যান হবেন। কারণ, কলকাতা-পৌরসভা পুলিশবাহিনী হয়ে ভালো চলছিল না। আজও কলকাতা করপোরেশন মধ্যে মধ্যে কলকাতা-পুলিশের সাহায্য নেয়।

মিঃ স্কাল্‌চ
(Mr. Schalch)

১৮৬৪ খ্রী. উক্ত কমিশনের সুপারিশমতো মিঃ ওয়াটচপের পরে কলকাতা-পুলিশের তৃতীয় কমিশনার মি. স্কাল্‌চ এই যুগ্মপদে প্রথম অধিষ্ঠিত হলেন। বাগবাজারের কুমোরটুলিতে শক (Shalch) স্ট্রীট তাঁর স্মৃতি বহন করছে। করপোরেশন ও পুলিশ-বিভাগ : একত্রে এ দুটির গুরুভার বহন সহজ নয়। এ কারণে, তাঁকে সাহায্যের জন্য মাসিক একহাজার পাঁচশত টাকা বেতনে ১৮৬৪ খ্রী. একজন ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার নিযুক্ত হলেন। এঁদের দুজনকে একবার মিউনিসিপ্যাল-অফিসে আর-একবার পুলিশ-অফিসে ছুটাছুটি করতে হতো।

মিঃ স্কাল্‌চ ১৮৬৪ খ্রী. হতে ১৮৮৬ খ্রী. পর্যন্ত কলকাতার পুলিশ-কমিশনার ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই কলকাতার শহরতলিকে চব্বিশ পরগণা হতে বিচ্ছিন্ন করে পুনরায় পূর্বের মতো কলকাতা-পুলিশের অধীন করা হয়। কলকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকাও সেই অনুযায়ী বাড়ে। তাঁর কর্মকালের মধ্যে কলকাতা-পুলিশ-এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ

হয়। কাউওয়েল-সাহেব এক সভায় তার সারমর্ম বোঝান। প্রচলিত দেশীয় আইন বাছাই করে এই এ্যাক্‌ট নগরবাসীদের ইচ্ছায় তৈরি হয়। কলকাতা-পুলিশ-এ্যাক্‌টের সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'কলকাতা-পুলিশের সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার পুলিশ-কমিশনার নামে এক ব্যক্তির হস্তে থাকবে। তিনি লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর তথা ছোট লাট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। পুলিশ-কমিশনার সাহেব মাত্র ছোট লাটের কাছে জবাবদিহি হবেন। উক্ত পুলিশ-কমিশনার সাহেবের আদেশ কার্যকরী করার জন্যে ছোটলাট-বাহাদুর ইচ্ছামতো পুলিশ-কমিশনারের অধীনে একাধিক ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার নিযুক্ত করবেন। কলকাতা শহরের জন্য বিশেষ এক প্রকার ফৌজ থাকবে। তার লোকসংখ্যা ভারত-গভর্নমেণ্টের সম্মতিক্রমে ছোটলাট-বাহাদুর ঠিক করবেন। পুলিশ-কমিশনার সাহেব স্বয়ং ঐ সকল লোককে নিযুক্ত করবেন। তাদের অর্থদণ্ড বা পদচ্যুতি গভর্নমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি করতে পারবেন। তাদের য়ুনিফর্ম ও অস্ত্র বহন আদিও তাঁর মতে হবে। আবশ্যক হলে পুলিশ-কমিশনার সাধারণের মধ্য থেকে পুলিশের ক্ষমতাবিশিষ্ট স্পেশাল-কনস্টেবল নিযুক্ত করতে পারবেন।'

এই আইনে কলকাতার কোনও পুলিশকর্মী পুলিশ-কমিশনারের হুকুমের বিরুদ্ধে কোথাও আপীল করতে পারতেন না। কিন্তু বাংলা-পুলিশকর্মীরা ইনস্পেক্টর-জেনারেলের আদেশের বিরুদ্ধে যথাক্রমে প্রাদেশিক ও ভারত গভর্নমেণ্টে ও বিলাতের ইণ্ডিয়া-হাউসে আপীল করতে সক্ষম ছিলেন। বাংলা-পুলিশের বহু সাব-ইনস্পেক্টর ইণ্ডিয়া-হাউসে সেক্রেটারি অফ স্টেটের নিকট আপীল করে তাদের বরখাস্তের হুকুম বাতিল করেছেন। এঁদের একজন থানা-ইনচার্জ স্বয়ং বিলাতে উপস্থিত হয়ে তাঁর মামলার সওয়াল করেন। ওখানকার অধিকর্তা জনৈক লর্ড রায়-দান প্রসঙ্গ লেখেন: 'বেশী এ্যাগ্রিভড না হলে উনি এত অর্থব্যয়ে এতদূর আসতেন না। অতএব তাঁকে আমরা পুনর্বহালের হুকুম দিলাম।' জঘন্য অপরাধে* অপরাধী একজন অফিসরকে ওঁরা মুক্তি দেন। বরখাস্তকারী য়ুরোপীয় উর্ধ্বতনকে তাঁরা কঠোর সমালোচনা করেন।

কলকাতা পুলিশ এ্যাক্‌ট

ইণ্ডিয়ান পিনাল-কোড বিধিবদ্ধ হওয়ায় কলকাতা পুলিশের অন্য বিষয়ে অসুবিধা ঘটে। শহর সুরক্ষণে কলকাতা-পুলিশ আবহমানকাল হতে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী। প্রাচীনকাল হতে ভারতীয় পুলিশের কিছু ক্ষমতা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

---

* Committing Sodomy on the Maji [মাঝি] of a Nouka [নৌকা] and outraging the modesty of Chowkidar's wife.

ঐগুলিকে আইনী ও তার বহির্ভূত কাজকে বে-আইনী বলা হতো। হিন্দু-আমলের ও জমিনদারী-আমলের ঐ আইন মতো কলকাতা-পুলিশ কাজ করতো।

তৎকালে প্রচলিত পুলিশ ক্ষমতা পৃথকরূপে ক্যালকাটা পুলিশ-এ্যাক্টে (১৮৬৬ খ্রী.) বিধিবদ্ধ হয়। তার ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ আইনী মারপ্যাঁচ নেই। সেটি সহজবোধ্য বাংলার সরল ইংরাজী অনুবাদ। প্রাচীন ঐতিহ্যমতো তাতে উল্লিখিত দণ্ড যৎসামান্য। এই এ্যাক্‌টে ইণ্ডিয়ান পিনাল-কোডের অতিরিক্ত বহু ক্ষমতা কলকাতা-পুলিশের আছে। তার প্রয়োগ ও বিচার পূর্বকালের মতো দ্রুত সমাধা হয়। কয়েকটি বিষয়ে (চোরাই মাল উদ্ধার এবং জুয়া প্রভৃতি) কলকাতার পুলিশ-প্রধান তল্লাসী-পরোয়ানা প্রদানেও সক্ষম।

"আমি এনফোর্সমেণ্ট ও এ্যাণ্টি-রাউডির ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার থাকাকালে একটি বাসগৃহের সম্মুখে ওয়াচ মোতায়েন করি। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কৈফিয়ত চান কোন্ আইনে উহা করা হলো। কলকাতা পুলিশ এ্যাক্টের ধারায় আছে যে, পুলিশ যে-কোনও স্থান হতে যে-কোনও উপায়ে সংবাদ সংগ্রহ করবে। হাকিমকে বলা হয় যে ঐ ধারা মতে আমার হুকুমে ওখানে পুলিশ-পোস্টেড হয়েছে।"

"এক ভদ্রলোক অনুমতি-সহ একদিন রাইটার্সে এলেন। সেখানে করিডরে তিনি থুতু নিক্ষেপ করায় গ্রেপ্তার হলেন। কমিটিঙ্ নুইসেন্স ধারাটি মাত্র পাবলিক রোড বা প্লেস সম্পর্কে প্রযোজ্য। উপরন্তু থুতু নিক্ষেপ নুইসেন্সের মধ্যে পড়ে না। এখানে ওঁর লিগালি এণ্টারিঙ হলেও ইল্‌লিগালি রিমেনিঙ হয়েছে। কারণ তদ্বারা সেখানে তিনি অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করলেন। কলকাতা পুলিশ-এ্যাক্টের...সিম্পিল ট্রেস-পাস ধারায় তিনি অভিযুক্ত হলেন।"

পূর্বকালে ব্যক্তিগত স্বার্থে নাগরিকদের হয়রানি করলে পুলিশ কর্মীর সাজা হতো। এই পুরানো ধারাটিও কলকাতা পুলিশ-এ্যাক্টে সংযোজিত হয়। 'তাতে ম্যালিস' প্রমাণ হলে পুলিশকর্মীর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

কলকাতা পুলিশ-এ্যাক্টের ধারা অনুযায়ী পুলিশ-কমিশনার পূর্বের মতো প্রয়োজনে কিছু উপ-আইন স্বয়ং তৈরি করতে পারেন। হিন্দু-রাজারা, নবাবরা এবং জমিনদার-শাসকরাও এরূপ আইন প্রণয়ন করতেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন দেশীয় কানুনই কলকাতা পুলিশ-এ্যাক্‌টে বিধিবদ্ধ।

পুরানো কলকাতার হাকিমদের সামারি-ট্রায়েল-এর মতো বর্তমান কলকাতার প্রেসি-ডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেটরাও বিচার-কার্যে নথি লিখতে আইনত বাধ্য নন। কিন্তু মফস্বলের হাকিমরা প্রাচীন ব্রাহ্মণ-আদালতের মতো সুচারুরূপে নথি রক্ষণ করতে আইনত বাধ্য। কলকাতার প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেটরা পঞ্চায়েত ও কাজীদের মতো সংক্ষেপে

নিম্নোক্তরূপ বিচার করতেন। পরে হাইকোর্ট নম্রভাবে জানান যে আইন যা-ই থাকুক, আপিলকালে তাঁদের বোঝবার মতো নথি রাখুন।

"Ex. P. W. 'I, 2, 3+4 দে' প্রুভড্ দি কেস U/S 379 I.P.C. হার্ড বোথ পার্টিস। একুইসড্ টু ফিফটিন্ ডেস্ R. I. প্রপারটি টু কমপ্লেণ্ট।"

কলকাতা-পুলিশও কলকাতা-পুলিশ-এ্যাক্টের ধারায় ডায়েরি লেখে। তারাও সংক্ষেপে ডায়েরি লেখার অধিকারী। ইচ্ছা করলে তারা শুধু পকেট-বুকেও নোট নিতে পারে। তবে পুলিশ-কমিশনারের প্রণীত উপ-ধারায় তারা বেঙ্গল-পুলিশ অপেক্ষাও বিস্তারিত ডায়েরি লেখে। বেঙ্গল-পুলিশে সমস্ত সাক্ষীদের বিবৃতি একসঙ্গে লেখা হয়। অর্থাৎ —'অমুক অমুক সাক্ষীদের নিকট হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি ও কাহিনী অবগত হলাম।' কোন্ সাক্ষী কতটুকু কি বলেছে তা ঠিকমতো বোঝা যায় না। তাই বিচারকালে জবানবন্দীর সঙ্গে ডায়েরিতে লেখা বিবৃতির অমিল ঘটানোর সুযোগ নেই। ওঁরা Cr. P. C. অনুযায়ী স্মারকলিপি রচনা করেন। কিন্তু কলকাতা-পুলিশে ডায়েরিতে কমিশনারের হুকুমে প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী পৃথক পৃথকরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। এইভাবে লিখিত ডায়েরির সাহায্যে পুলিশের সাক্ষীর আদালতে প্রদত্ত-বিবৃতির কনট্রাডিকশন প্রমাণের সুযোগ বিপক্ষের উকিলদের আছে। পুলিশের কাছে সাক্ষী যা বলেছে বা যা বলেনি তা আদালতে বললে কিংবা না-বললে, তার সাক্ষ্য সন্দেহ-জনক হয়। বহু জজ এজন্য কলকাতা-পুলিশের ডায়েরি বেশি পছন্দ করেন। কলকাতা-পুলিশের ডায়েরিতে প্রাত্যহিক বিশদ বিবরণ (এ্যাক্টস্ ডান এণ্ড ফ্যাক্টস্ এসারটেণ্ড) মন্তব্যসহ তারিখ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয় এবং তাতে ঊর্ধ্বতনরা প্রত্যহ দস্তখত করেন বলে পরবর্তীকালে তা বদলানো যায় না। জজ-সাহেবরা তাই ওই ডায়েরি আদ্যোপান্ত পাঠ করে মামলার প্রাথমিক ধারণা করে নেন। বেঙ্গল-পুলিশের ডায়েরির মতো তা গোপন নথিরূপে বিবেচিত নয়।*

কলকাতা-পুলিশ-এ্যাক্টে প্রদত্ত ক্ষমতা মতো 'হোটেল' ও টি-শপ প্রভৃতির লাইসেন্স-কলকাতা পুলিশ দিতে কিংবা তা নাকচ করতে পারেন। জনগণকে নানাবিধ অধি-কার দেওয়া এবং পরে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের আছে। হাইকোর্টের বহু জজ এগুলিকে 'সেক্রেড ট্রাস্ট অন দি একসিকিউটিভ বাই দি জুডিসিয়ারি' বলে অভিহিত করেছেন। বাবু গোবিন্দরাম মিত্রের কাল হতে কলকাতা-পুলিশের এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি আছে।

অস্ত্র-আইনে বন্দুকের এবং ভিহিক্ল-আইনে গাড়ির লাইসেন্স কলকাতা-পুলিশ দিতে

* কলিকাতাতে নবাগত হাকিমরা কলিকাতা পুলিশ অ্যাক্ট্ সম্বন্ধে উক্তি করতেন : ইজ ক্যালকাটা এ প্রেস আউট অফ্ ইণ্ডিয়া।

পারেন। মোটর-ভিহিক্‌ল পূর্বে কলকাতা-পৌরসভার অধীন ছিল, কিন্তু সেখানে কাজ ভালো না-হওয়ায় তা কলকাতা পুলিশের অধীন হয়। আবগারি দোকান-গুলির লাইসেন্সেও কলকাতা-পুলিশের অনুমোদন প্রয়োজন। কলকাতায় জুডিসি-য়ারি ও একসিকিউটিভ পৃথক। এখানে পুলিশের উপর একসিকিউটিভের ভার অর্পিত। বাংলাদেশে এই-সব কাজ শুধু ম্যাজিস্ট্রেটরা করে থাকেন। তবে পূর্বতন কলকাতা-পুলিশের পৃথক-সত্তা সব ক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

এই সময়ের কিছু আগে কিংবা পরে, রাজপুরুষদের সম্পর্কে গোপন নথি [C. C. Roll] কনফিডেনসিয়াল কারেক্টর রক্ষা প্রচলিত হয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের জন্য তাঁর উপর লক্ষ্য রাখতে এই প্রথার প্রথম সৃষ্টি। উর্ধ্বতন কর্মীরা প্রতি বৎসরের শেষে সংশ্লিষ্ট অধীন কর্মীদের সম্পর্কে তা নথিভুক্ত করতেন। এই গোপন-নথির প্রথম শিকার হন বঙ্কিমচন্দ্রই। অভিযোগ—তিনি প্রচ্ছন্ন ব্রিটিশ-বিরোধী সাহিত্যিক। 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজি-অনুবাদকের নাম জানা সত্ত্বেও তিনি কর্তৃপক্ষকে তা জানান নি। অধিকন্তু 'নীলদর্পণে'র লেখক দীনবন্ধু মিত্রের তিনি বন্ধু। এ-সব কারণে তাঁকে জেলা-হাকিম পদে উন্নীত করা হয় নি। তবে ইংরাজ উর্ধ্বতন-কর্মী এ-ও লিখেছিলেন যে, অসীম প্রতিভাধর এই ব্যক্তি ইংলণ্ডে জন্মালে নামী-ব্যক্তি হতে পারতেন।

[বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বংশের দৌহিত্র-শাখার সন্তান। মাতামহের সম্পত্তির অর্ধাংশ পেয়ে তাঁরা কাঁঠালপাড়ায় আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমার পিতামহ কমলাপতির মাসতুতো ভ্রাতাও হতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংকলিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, বঙ্কিমবাবু কমলাপতির নিকট ইংরাজি শিক্ষা করেন। পিতামহ পদাধিকার-বলে তৎকালীন প্রথম বাঙালী বিভাগীয় কমিশনার কে. জি. গুপ্তের নিকট উক্ত তথ্যাদি শুনেছিলেন। বঙ্কিম-পিতা যাদবচন্দ্র, কমলাপতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র যথাক্রমে ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রায়বাহাদুর ছিলেন।]

নিকট-আত্মীয় হওয়ায় বঙ্কিমবাবুকে ওই গোপন-নথি সম্পর্কে কমলাপতিবাবু জানিয়ে-ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবু তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তৎকালে সি. সি. রোল-এর কপি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে দেওয়ার রীতি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র উপলক্ষ্য হলেও নব-প্রবর্তিত এই সি. সি. রোল রক্ষার প্রথায় পুলিশ-কর্মীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

[বি. দ্র.] বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম লক্ষ্য করেন যে প্রান্তিক বিদ্রোহ অসম্ভব করতে ভারতের সমুদ্র কিনারা বরাবর রেল লাইন স্থাপিত হয়েছে। তাই উনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে-ছিলেন : তুলে নাও তোমাদের টেলগ্রাফ ও রেললাইন।

ওঁরই গ্রন্থের নির্দেশিত পন্থাতে বাংলাতে বিপ্লবী দল সৃষ্টি হয়। উপরন্তু উনি একটি

উদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত তথা 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রও জাতিকে দিয়েছিলেন।

এ সময়ে কলকাতা অঞ্চলে উদ্যোগ-শিল্প শুরু হয়েছে। ঐগুলি তখনও ইংরাজদের একচেটিয়া কারবার। বয়লারে ঢুকানো বা পিলেফাটানোর কাহিনীও শোনা যায়। সর্বক্ষেত্রে না হলেও, ওদের শ্রমিকদের প্রতি উৎপীডন সুবিদিত। বে-সরকারী স্তরে ব্রাহ্মসমাজ শ্রমিক-কল্যাণে এগুলেন। ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদক বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৩ খ্রী. 'ভারত-শ্রমজীবী'-সঙ্ঘ নামে প্রথম শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানও তার মুখপাত্ররূপে 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকা স্থাপন করলেন। এর কিছু পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৩খ্রী. শ্রমিক-নেতারূপে একটি রেলওয়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের কিছুকাল সভাপতি হন। এর বহু পরে ধীরে ধীরে শ্রমিকদের নিজস্ব 'সংগঠন' গঠিত হতে থাকে।

[সরকারী পর্যায়ে ১৯৩৮-১৯৪০ খ্রী.] লেবার কমিশনারের পদ সৃষ্টি হয়। কলকাতা-পুলিশের এ্যাসিসটেণ্ট-কমিশনার মুরসিদ সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হন। আমি কিছুকাল ডেপুটেশনে তাঁকে ঐ কার্যে সাহায্য করি। আমরা ফ্যাক্টরি-সমূহে একটি করে সিলড্-লেটার বক্স রাখি। শ্রমিকদের তাতে স্বনামে বা বেনামে অভিযোগ-পত্র নিক্ষেপ করতে বলা হয়। বহু অভাব-অভিযোগ পত্র ঐ সকল বাক্সে জমা পড়ে। অভিযোগের স্বরূপ বুঝে আমরা প্রয়োজনীয় শ্রমিক-আইনের খসড়া সাজেশন গভর্নমেণ্টে পাঠাই। পরে বাংলা-গভর্নমেণ্ট সুগঠিত সরকারী লেবার-ডিপার্টমেণ্ট তৈরি করে যোগ্য অ-পুলিশ লেবার-কমিশনারদের নিযুক্ত করেন।]

[বি. দ্র.] প্রাচীন ভারতের ত্রিস্তরীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্রিটিশরা অনুসরণ করেন। প্রদেশকে কয়েকটি ডিভিশনে বিভক্ত করে, প্রতি ডিভিশনে একজন ডিভিশন্যাল-কমিশনার (মহাসামন্ত) নিযুক্ত করেন। প্রতিটি ডিভিশন কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলা জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের (সামন্ত শাসক) অধীন করেন। প্রতিটি জেলা কয়টি মহকুমায় ভাগ করে তাতে একজন করে মহকুমা-হাকিম (মণ্ডলেশ্বর) রাখেন।

অন্যদিকে—পুলিশ বিভাগের জন্য ডিভিশনগুলিতে ডি. আই. জি. এবং তাঁদের অধীনে জেলাতে পুলিশ সুপার রাখেন। একালে আই. সি. এস. কর্মকৃত্যে কিছু দেশীয় নিযুক্ত হন। তাদের প্যারালাল পুলিশ-সার্ভিসের ইংরাজ-সুপাররা উর্ধ্বতন হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় আই. সি. এস.-দের উপর নজর রাখতেন। ইংরাজদের পৃথক ক্লাবে ওঁদের সলা-পরামর্শ হতো।

কমিশনার মিঃ ওয়াইচোপ

Mr. Wanchope

কমিশনার মিঃ স্কাল্চ-এর পর মিঃ ওয়াইচোপ কলকাতা-পৌরসভা ও কলকাতা-পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার ছিলেন (১৮৭২ -১৮৭৬ খ্রী.) ইনি কলকাতার চতুর্থ পুলিশ-কমিশনার। ইনি হাওড়াকে পুনরায় কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। এমন-কি দক্ষিণে বেহালা ও উত্তরে বারাকপুর পর্যন্ত স্থান কলকাতা পৌর-সভা ও কলকাতা-পুলিশের অধীন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অধিকিন্তু, তিনি বাঙলা-পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের সংযোগরূপে একটি যুগ্ম-কমিটি স্থাপনের বিষয়ও বলেন।

মিঃ ওয়াইচোপের প্রথম প্রস্তাবটি বহু বাকবিতণ্ডার পর কার্যকর হয় নি। সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের খরচ ওঠাতে আয়-কর প্রথম প্রবর্তন হয়। তখনও পর্যন্ত ওই নতুন কর দ্বারা যুদ্ধের খরচ ওঠে নি। তার উপর, কলকাতার বিস্তৃতির জন্য অত অর্থব্যয় সম্ভব নয়। তবে তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি বহু পরে উভয়-পুলিশের প্রতিভূদের ত্রৈমাসিক ও মাসিক মিটিং-এর ব্যবস্থা করে কিছুটা কার্যকর হয়।

পুলিশ কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ

স্যার স্টুয়ার্ট হগ ১৮৭৬-৮১ খ্রী. পর্যন্ত কলকাতা পুলিশে ও পৌরসভার কর্মকর্তা-রূপে যুগ্ম-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি বর্তমান মিউনিসিপ্যাল তথা হগ-মার্কেটের স্রষ্টা। কলকাতা-পুলিশের পঞ্চম যুগ্মপদী পুলিশ-কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ পূর্ব-কলকাতার খালগুলি বুজিয়ে রাজপথ করার প্রতিবেদন দেন। অন্যথায় ওগুলিকে প্রশস্ত করে নৌ-বিহারের উপযোগী করতে বলেন।

এই সময় ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসে কয়েকজন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস্. একজন বাঙালীকে করা হয়।

স্যার হেনরি হ্যারিসন

[Sir Henry Harrison]

হেনরি হ্যারিসন কলকাতা-পুলিশ ও মিউনিসিপ্যাল-চেয়ারম্যানের যুগ্ম-পদের শেষ কমিশনার, ১৮৮১-৮৯ খ্রী.। তিনি ষষ্ঠ পুলিশ-কমিশনার। হ্যারিসন রোড তাঁর দ্বারা সৃষ্ট বা উন্নত হয়। এই রাস্তার বর্তমান নাম, মহাত্মা গান্ধী রোড।

হেনরি হ্যারিসনের কর্মকালে দ্বিতীয়বার বাংলা ও কলকাতা-পুলিশ একত্রিত করার প্রস্তাব আসে। (প্রথম বার ১৮৩৮ খ্রী.) কিন্তু বাংলা-পুলিশের ইনস্পেক্টর-জেনারেল মিঃ ডেভিড লয়েল ও কলকাতা-পুলিশের কমিশনার হেনরি হ্যারিসনের বিরোধিতায়

সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

১৭৮৯ খ্রী. ১লা এপ্রিল এই যুগ্মপদ বাতিল করে ১. পুলিশ-কমিশনার এবং ২. মিউ-নিসিপ্যাল চেয়ারম্যান : এই দুটি পৃথক পদ পুনরায় সৃষ্টি হলো। কারণ দু'জন ইংরাজ-সিভিলিয়ানকে দুটি বড় পদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সেই কালে কলকাতা-কর্পোরে-শনের চেয়ারম্যান পদটি গভর্নরের পববর্তী লোভনীয় পদ ভাবা হতো। আসামের গভর্নর না হয়ে সিভিলয়ানদের সেটাই কামনা। তাই কমিশনার-সাহেব স্বয়ং কল-কাতা-কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হলেন এবং তাঁর ডেপুটি-কমিশনারকে পদোন্নতি ঘটিয়ে কলকাতা-পুলিশের কমিশনার করা হলো।

[ব্রিটিশ-আমলে দারোগা-পদটিকে হাকিম ও পুলিশ-সুপার হতে থানার দারোগা তথা থানদার করা হয়। পরে বাংলা ও কলকাতা উভয়-পুলিশে তাদের সাব-ইনস্পে-ক্টর করা হয়। কিন্তু তার স্মৃতিবাহী একটি মাত্র দারোগা-পদ কলকাতা-পুলিশে থাকে। ইনি হেড-কোয়ার্টার্সের দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল হন। পরে ঐ পদকে আরও অবনত কবে গুদাম-রক্ষক করা হয়।]

কলকাতা পুলিশকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা, ১. দক্ষিণ বিভাগ ২. উত্তর বিভাগ ৩. ডিটেকটিভ ডিপার্ট এবং ৪. রিভার পুলিশ। কর্নেল ক্রুসের সুপ - রিশে সণ্ট-পুলিশ রিভার-পুলিশে সংযুক্ত হয়।

উক্ত চারটি পুলিশ-বিভাগের জন্য কলকাতার কমিশনার অফ্-পুলিশের অধীনে এই সময় চারজন পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এঁরা সকলেই ইংল্যাণ্ড হতে আগত তরুণ য়ুরোপীয় হতেন।

এই চারজন ইংরাজ পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের অধীনে থানাগুলিতে এবং অন্যান্য স্থানে নিম্নোক্ত পুলিশ-কর্মীদের নিযুক্ত করা হলো।

১. মাসিক সত্তর হতে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে ত্রিশজন ইনস্পেক্টর। ২. মাসিক কুড়ি হতে পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজন দারোগা ৩. পঁয়তাল্লিশ জন য়ুরোপীয় সার্জেণ্ট। ৪. মাসিক নয় হতে ষোল টাকা বেতনে বত্রিশ জন হাবিলদার। ৫. মাসিক পঁচিশ হতে ষাট টাকা বেতনে পঁচিশ জন য়ুরোপীয় কনস্টেবল এবং ৬. এক হাজার তিন-শত পনের জন ভারতীয় কনস্টেবল। রিভার তথা জলপুলিশে পৃথক একশত ষোল-জন সাধারণ ও একশত তিরাশি জন সশস্ত্র-পুলিশ ছিল। নৌ-পুলিশ হতে রিভার-পুলিশ এবং রিভার-পুলিশ হতে বহু পরে পোর্ট-পুলিশ তৈরি হয়। উপরোক্ত বাহিনী ব্যতীত ছয়জন মাউনটেড-আর্দালি ছিল। পরবর্তী অশ্বারোহী-পুলিশের তারা অগ্র-দূত।

জাস্টিস অফ-পিসদের কালে একজন পুলিশ-সুপার সমগ্র কলকাতা-পুলিশ, জল-

পুলিশ-সহ, নিয়ন্ত্রণ করতো। পরে গোয়েন্দা-বিভাগের জন্য একজন পৃথক পুলিশ-সুপার নিযুক্ত হন। এবার একজন পুলিশ-কমিশনারের অধীনে চারজন পুলিশ-সুপারের প্রয়োজন হয়। পুলিশ-কমিশনারকে সাহায্যের জন্য হেড-কোয়ার্টার্স-এ এক-জন ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার নিযুক্ত হলেন। সুগঠিত আর্মড্-ফোর্স ও হেড কোয়া-টার্স ফোর্সও তৈরি হলো।

১৮৯০ খ্রী. সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের পুলিশের জন্য দ্বিতীয় পুলিশ-কমিশন নিযুক্ত হয়। ১. গয়া-র জেলা-জজ মিঃ স্টিভেনসন, ২. বাংলা-পুলিশের ইনস্পেক্টর-জেনারেল মিঃ জে. সি. ভেয়ারি, ৩. প্রখ্যাত জমিনদার বাবু প্যারীমোহন মুখার্জি, ৪. বিহার প্ল্যান-টারস-এ্যাসোসিয়েসনের মিঃ ই. আর. ম্যাকাউনটেন ওই কমিটির সদস্য এবং স্যার. এইচ রিস্‌লে তার সেক্রেটারি হন।

উক্ত কমিটির রিপোর্ট মতো দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা-পুলিশ গঠিত হলো। তবে কল-কাতা-পুলিশের বিষয়ে তারা কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করে নি।

এই কালে বাংলা-পুলিশে কনস্টেবলদের ছয় টাকা, হেড-কনস্টেবলদের দশটাকা, ইনস্পেক্টরদের একশত টাকা মাসিক বেতন ছিল।

ওঁদের রিপোর্ট মতো এ্যাসিসটেণ্ট-সুপারদের সংখ্যা বাড়ানো হয়। পুলিশ-ইনস্পেক্টর-দেব ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটদের পদে প্রমোশন রহিত হলো কিন্তু ওই কালেও এ্যাসিস-টেণ্ট সুপারের পদগুলি ইংরাজদের জন্য সংরক্ষিত। দেশীয় ইনস্পেক্টরদের প্রমোশনের জন্য এঁরা ডেপুটি পুলিশ সুপার পদ-সৃষ্টির সুপারিশ করেন।

[তৎকালীন প্রবাদ—ইংরাজ ধনীদের মূর্খ পুত্রকে পুলিশ-সুপার এবং দেশীয় ধনীদের মূর্খ পুত্রকে সাব-রেজিস্ট্রার করা হয়। অবশ্য—মূর্খ বলতে এখানে স্বল্প-শিক্ষিত বুঝায়। আরও একটি প্রবাদ, তেলা-পোকা আবার পাখি, সাব-রেজিস্ট্রার আবার হাকিম, ঘোষাল আবার বামুন।']

ডেপুটি-সুপার পদে কিছু দেশীয় ইনস্পেক্টারের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়। ঠিক হয় যে—বাকী ডেপুটি-সুপারের পদে উচ্চ শিক্ষিত দেশীয় যুবকদের সরাসরি নিয়োগ করা হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে এবং আমাদের পরিবারের এক-জনকে অন্যদের সঙ্গে প্রথম ব্যাচের ডেপুটি সুপার করা হয়। এই পদগুলিকে মনো-নয়ন দ্বারা নিয়োগ করা হতো। ওই কালে পুলিশ ও বিচার-বিভাগে উভয় পরি-বারে : অর্থাৎ আমাদের ও বঙ্কিমবাবুদের অবারিত দ্বার ছিল। রাজভক্ত পরিবার-গুলিকে তখনও কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো।

[বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃকুল এবং আমাদের পিতৃকুলের পূর্বপুরুষ রঘুদেব ঘোষাল। রাজা

দোলগোবিন্দের ত্যক্ত জমিদারী উভয় পরিবারে বিভক্ত হয়।

রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র, অন্য সম্পর্কে আমার পিতামহ রায় বাহাদুর কমলাপতির মাসতুতো ভ্রাতা ছিলেন। তবে আমাদের পরিবারের মতো ওঁদের পরিবার অতো বেশী রাজভক্ত ছিল না। আমাদের বাড়ির মতো ওঁদের বাড়িতে রাজা-রানীর ছবি থাকতো না।]

এই কালে বাংলা-পুলিশের জন্য অন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা ছিল। দক্ষ পুলিশ-ইনস্পেক্টর-দের অবসর-গ্রহণের পর, সমর্থ থাকা পর্যন্ত, কিছুকাল সাব-রেজিস্ট্রার করা হতো। তৎকালে সাব-রেজিস্ট্রারগণ বেতনের পরিবর্তে কমিশনে কাজ করতেন। এতে তাঁদের আয় যথেষ্ট বেশি হতো।

এই সময় বেতন-বৃদ্ধির দাবিতে বাংলা পুলিশে কয়েক স্থানে নিম্নপদী কর্মীরা সর্বপ্রথম স্ট্রাইক তথা ধর্মঘট করলো। ইংরাজ উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ পুলিশের বেতন অত কম জেনে অবাক হন। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য গভর্নর বার্ড-কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করলেন। তাঁরা বাংলা-পুলিশের পূর্বোক্ত বেতন-হার সংশোধন করেন। সংশোধিত বেতন-তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বাংলা-পুলিশ

পদের নাম	পূর্ব বেতন	পরবর্তী বেতন
কনস্টেবল	টা. ৬	—
হেড-কনস্টেবল	টা. ১০	১৫—২০—২৫
সাব-ইনস্পেক্টর	টা. ৩০	৪০—৬০—৮০
ইনস্পেক্টর	টা. ১০০	১৫০—২০০—২৫০

[এই স্ট্রাইকে ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য নির্মমভাবে বহু কর্মী ছাঁটাই হয়। ঐ সকল ব্যক্তিদের স্থলে বহির্বঙ্গ হতে লোক আসে। তবে—নিজেদের ক্ষতি হলেও তাদের কর্মরত সহকর্মীদের বেতন বাড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয় বছর পরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দ্বিতীয়বার স্বল্প পুলিশ স্ট্রাইক হয়। এবারও বহু ব্যক্তির কর্মচ্যুতি ঘটলেও তাদের সহকর্মীদের বেতন-বৃদ্ধি ঘটে।]

উপযুক্ত হেড-কনস্টেবলদের বাংলা-পুলিশে ফাঁড়ির ইনচার্জ করা হয়। পূর্বের সাব-ইনস্পেক্টরদের অনুপস্থিতিতে তাঁরা থানা-ইনচার্জ হতেন। তাঁদের অপরাধ তদন্ত করারও ক্ষমতা ছিল। এই-সব অধিকার হতে বার্ড-কমিটি তাঁদের বঞ্চিত করেন। ফার্স্ট আর্ট পাশ-করা বাঙালী ও এনট্রান্স পাশ বেহারীদের বাংলা-পুলিশে সাব-ইনস্পেক্টর পদে মনোনয়ন করা হয়।

বাংলা-পুলিশে থানা-ইনচার্জ সাব-ইনস্পেক্টরদের জন্য যথাক্রমে বেতন-অতিরিক্ত দশ, পনের ও ত্রিশ টাকা চার্জ-এ্যালাউন্স দেওয়া হয়। থানার গুরুত্ব অনুযায়ী একাধিক জুনিয়র সাব-ইনস্পেক্টর এঁদের অধীন করা হয়।

এই কালে ইনস্পেক্টর-জেনারেল, পুলিশ সুপার ও এ্যাসিসটেণ্ট পুলিশ-সুপার পদে শুধু ইংলণ্ড হতে আগত ইংরাজ-নাগরিকদের নিয়োগ করা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডে বেকার না-রাখা। কিছুকালের জন্য দ্বিতীয়বার ইনস্পেক্টর-পদের জন্যে কমপিটিটিভ-পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। পরে পুনরায় এ-ব্যবস্থা রহিত করা হয়। কারণ, আবার প্রমাণিত হয় যে পণ্ডিত-ব্যক্তিদের দ্বারা পুলিশী কাজ হয় না। জেলা হেড-কোয়ার্টারসে একটি রিজার্ভ-ফোর্স স্থাপিত হয়।

[তৎকালে কলকাতায় তদারকি-কাজে উর্ধ্বতন কর্মীরা পালকি বাতিল করে ঘোড়ার-গাড়ি ব্যবহার করেতেন। পুলিশ-কমিশনার স্বয়ং জুড়িগাড়ি চড়তেন। কলকাতা-পুলিশের সুপারিনটেনডেণ্টরা বগিগাড়ি ও স্বচালিত ফিটনে চড়ে রোঁদে বেরুতেন। এই সময়ে ইংরাজরা ভেটারনরি-ডাক্তারদের অত্যন্ত সমাদর করতেন। কারণ, তাঁদের প্রিয় কুকুর ও ঘোড়ার এঁরাই চিকিৎসা করতেন। উচ্চপদী কর্মীদের উপর এই ডাক্তারদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এঁদের সুপারিশে লোকের চাকরি হতো। এঁরা বিরূপ হলে চাকরি হতে লোকে বরখাস্তও হতো।

[বি. দ্র.] বিগত শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতার নাগরিকরা টাউনহলে সভা করে পুরাতন চোরদের স্বভাব-নিরাময়ের নিমিত্ত 'প্রিজনার্স এইড্ সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে জেল-ফেরত অপরাধীদের থাকার ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। চোরদের ভাষায় এটিকে 'চোর-অফিস' বলা হতো। জেল হতে বেরিয়ে নিরাশ্রয় চোররা এখানে কিছুদিন থেকে ও বিশ্রাম করে এবং কিছু অর্থসাহায্য নিয়ে চলে যেতো। আজও পূর্ব-কলকাতায় গ্যাস কোম্পানির পিছনে এই অট্টালিকা ও শিল্প-যন্ত্রাদি পড়ে আছে। জজ স্যার মন্মথনাথ এই সোসাইটির শেষ সভাপতি ছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রিহ্যাবিলিটেশন-কমিশনার শম্ভুনাথ ব্যানার্জি, আই. এ. এস. এই প্রতিষ্ঠানকে পুনর্জিবিত করলে গভর্নমেণ্ট আমাকে একস্পার্ট-রূপে তার কার্য-নির্ধারক সমিতির অন্যতম্ সদস্য করেছিলেন।

বিগতশতাব্দীর এই সময় জুভেনাইল-অপরাধীদের জন্য পৃথক আটক-ঘর তথা হাউস অফ ডিটেনসন ও তাদের জন্য পৃথক আদালতসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া, য়ুরোপীয় ভবঘুরে তথা ভেগাবণ্ডদের জন্য আমহার্স্ট স্ট্রীটে পুলিশের অধীনে 'আটক-নিবাস' তৈরি হয়েছিল।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে উক্ত হাউস অফ ডিটেনসন-এর কার্যনির্ধারক সমিতিতে পদাধিকার-বলে আমি কিছুকাল সদস্য ছিলাম।

১৯০০ খ্রী. বাংলা দেশের তথা ভারতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কলকাতায় বিশ্বের প্রথম টিপশালা তথা ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরো স্থাপিত হয়। এর দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় টিপশালা স্থাপিত হয় লণ্ডন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। এই বছর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

অঙ্গুলি টিপবিদ্যা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয়ে বর্ধিত ও উন্নত হয়। আজ এই বিদ্যা বিশ্বের সর্বত্র সাদরে গৃহীত। য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও বাঙালী পণ্ডিত উভয়েরই এতে অবদান আছে।

প্রাচীন ভারতে ও চীনদেশে অঙ্গুলি-টিপবিদ্যার মূলসূত্র কিছুটা প্রচলিত ছিল। অবশ্য আজকের মতো এত কার্যকর ও উন্নত না হয়ে উহা অবলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতে উহার বিভাগ ও উপবিভাগ বোঝাতে যথাক্রমে চক্র তথা হোর্ল, শঙ্খ তথা আলনেয়ার, পদ্ম ও অংকুশ প্রভৃতি শব্দ এবং চীনে Ho. KE. প্রভৃতি শব্দ কিছুটা সম-অর্থে প্রচলিত ছিল। এদেশে হস্তরেখা বিদ্যায় ও বাদশাহদের পাঞ্জাতেও তার মূলসূত্র আছে। বাদশাহের পাঞ্জার স্বরূপ হতে তা জাল নয় বুঝেই এক-সুবাদার অন্য সুবাদারকে বদলির সময় ধনাগার, অস্ত্রাগার ও রাজ্যপাট বুঝিয়ে দিতো।

হুগলীর ইংরাজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এক পল্লীগ্রামের দোকানে, কাছারিতে, কাঠগোলায় সর্বত্র সই-এর পাশে টিপ নিতে দেখেন। তাঁকে বলা হয় যে সই জাল হলেও টিপ জাল হয় না। সেই ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় অফিসারদের সাহায্যে প্রথমে কয়েদীদের, পরে পেনসনের কাগজেও রেজেস্টারি দলিল টিপ-সই নেন। বহু বৎসর পরে রেজিস্টার রামগতিবাবুর সাহায্যে সেই-সব ব্যক্তিদের খুঁজে এনে দেখা যায় যে, কালের ব্যবধানেও তাদের টিপে কোনও পরিবর্তন হয় নি। তখন ব্যাপকভাবে বাংলা-পুলিশ বিভাগে তা গৃহীত হয়।

কয়েদীদের অসংখ্য টিপ-পত্র টিপশালায় জমা থাকে। এগুলিকে বেছে সঠিক টিপ বার করা কঠিন কাজ। বাংলা পুলিশের দু'জন অফিসার, হক সাহেব ও হেমচন্দ্র বসু, টিপ ফরমূলা আবিষ্কার করলেন। এ ফরমূলার সাহায্যে তার শ্রেণী ও উপশ্রেণী হতে অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় টিপ-পত্র বার করা সম্ভব। কিন্তু এই মহা-আবিষ্কার ইংরাজ উর্ধ্বতন তাঁর নিজের নামে বিশ্বে প্রচার করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ক্যাথলিক পাদরির কাছে প্রথম কন্‌ফেসনে বলেন, 'প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে আবিষ্কারকদের পুরস্কৃত করা হোক। নচেৎ মৃত্যুর পরেও আমার আত্মার শান্তি নেই।' ততদিনে এ-দু'জন অফিসারও অবসর গ্রহণ করেছেন। বিলাতের পত্র এলে একজনকে বিহারের নিজস্ব খামারে

এবং অন্য জনকে পূর্ববঙ্গের হরি-সভায় পাওয়া গেল। তাদের যথাক্রমে খান-বাহাদুর করা হয়। তাদের নগদ পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল।

১৯০২—১৯০৩ খ্রীঃ বাংলা ও কলকাতা-পুলিশের উন্নতির জন্য দুটি পৃথক কমিশন নিযুক্ত হয়। এ কমিশন দুটি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে বিবৃত করবো।

কলকাতা-পুলিশ : ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হতে কলকাতা-পুলিশ কমিশনারের মনোনয়ন ও নিয়োগ রহিত হয়। বাংলা-পুলিশ হতে সিনিয়র-মোস্ট ডেপুটি-ইন-স্পেক্টর-জেনারেলদের মধ্য হতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কলকাতা-পুলিশের কমিশনার করা হবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রদেশ-গভর্নমেণ্টের অধীন থাকবেন। পাঁচ বৎসরকাল তিনি নিযুক্ত হবেন। প্রয়োজন হলে কিছু বেশীদিনও তাঁকে বহাল রাখা যেতে পারবে। এঁকে প্রথম শ্রেণীর প্রেসিডেন্সি ও অন্য ম্যাজিস্ট্রেটও করা হবে। ম্যাজি-স্ট্রেটরূপে তিনি শুধু শান্তিরক্ষা ও আসামীদের জামিন এবং মুক্তি-দেওয়ার অধিকারী।

বাংলা পুলিশ : এতে বাংলা-সহ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন ইনস্পেক্টর-জেনারেল, প্রদেশের প্রত্যেক রেঞ্জের জন্য একজন ডেপুটি ইনস্পেকটর-জেনারেল, প্রতিটি জেলায় একজন ইংরাজ-এ্যাসিস্টেণ্ট পুলিশ সুপার কিংবা দেশীয় ডেপুটি পুলিশ-সুপার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

উক্ত প্রতিবেদনের মুখবন্ধে দেশীয় পুলিশকে উৎকোচ গ্রাহক ও উৎপীড়ক এবং যুরোপীয় উর্ধ্বতন পুলিশকে সৎ বলা হয়েছে। সার্কেল-ইনস্পেকটর তত বেশী নিন্দিত হন নি। কিন্তু, য়ুরোপীয় উর্ধ্বতনরা শৌখীন খাদ্য ও মদ্যাদি ও অন্য উপঢৌকন নিতেন কি না, তাঁদের মেমরা সস্তায় কর্মীদের দ্বারা শাকসবজী আণ্ডা-মোণ্ডা আনা-তেন কিনা, দেশীয় অফিসারদের তাঁদের জন্য সুলভে কিংবা বিনা মূল্যে দৈনিক সংগ্রহ করতে হতো কিনা! সে-সব বিষয় সম্বন্ধে এই প্রতিবেদনে কোনও কিছুর উল্লেখ নেই। তবে প্রতিবেদনে য়ুরোপীয় উর্ধ্বতনদের কাজে সুবিধার জন্য দেশীয় ভাষা শিখতে বলা হয়েছে।

লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর-জেনারেল হয়ে কলকাতায় এলেন। তাঁর নির্দেশে কল-কাতা বাদে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগ (ক্রিমিনাল ইন-ভেস্টিগেশন ডিপার্ট) স্থাপিত হয়। জেলাভিত্তিক গোয়েন্দা-বিভাগ পূর্বে থেকেই বাংলা-দেশে ছিল।

[বি. দ্র.] কলকাতা-পুলিশের সৃষ্টিকাল হতে ১৯১২ খ্রী. পর্যন্ত তার যাবতীয় নথি-পত্র, স্মারকী (ডায়েরি), অভিযোগ-কেতাব প্রভৃতি বাঙলা-ভাষায় লেখা হতো। বাংলা ভাষা তখনও প্রাণবন্ত। কিছু ইংরাজী বাক্যকেও তারা বাংলা-করণ করে নেয়। যথা : রাউণ্ডকে তারা রোঁদ, সেন্টি কে শান্ত্রী, ড্রিলকে তারা দলিল, প্লেটুনকে

পল্টন, ট্রপকে টুলি, জেনারেলকে জাঁদরেল প্রভৃতি তারাই করে নেয়। তবে বেশী ক্ষেত্রে তারা খাঁটি বাংলা বাক্যই ব্যবহার করতো। আজও লাল-কেতাব সেরেস্তা মুন্সি, হাজত ময়না-তদন্ত বয়াম (ভিসারা) হাতকড়া, থানা, দাঙ্গা জামিন হেপাজত ভৃত্যচৌর্য সিঁদমারি আসামী ফরিয়াদী নজরবন্দী ফাঁড়ি দারোগা পাহারা টহল গরদ-খানা এলাকা, গ্রেপ্তার খানাতল্লাসী প্রভৃতি খাঁটি বাংলা শব্দ কলকাতা-পুলিশে ব্যবহৃত হয়।

প্রতি সন্ধ্যায় জনৈক ইংরাজনবিশ থানার বাংলা নথিপত্র ও অভিযোগ-বই হতে উল্লেখ্য অংশ ইংরাজিতে তর্জমা করে বিভাগীয় ইংরাজ সুপারিনটেনডেণ্টের নিকট পাঠাতো। সব অফিসারদের ইংরাজি জানার প্রয়োজন হতো না। ১৯১২ খ্রী.-র পর ধীরে ধীরে থানাগুলি হতে বাংলা-ভাষা বিদায় করা হয়।

কলকাতা-পুলিশে ১৯০২-০৩ খ্রী. পুলিশ-কমিশনের সুপারিশের দুই বৎসর পর, ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের বদলে পুলিশ-কর্মকৃত্য (আই. পি.) হতে পুলিশ-কমি-শনার নিযুক্ত হতে থাকে। সাধারণত বাংলা-পুলিশের সিনিয়র-মোস্ট ডেপুটি-ইন-স্পেক্টরকে এই পদে পরপর নিযুক্ত করা হয়।

প্রথমে কলকাতার পুলিশ-কমিশনারকে সাহায্যের জন্য একজন মাত্র ডেপুটি-কমি-শনার হেড-কোয়ার্টারসে ছিলেন। পরে সুপারিনটেনডেণ্টদের পদ বাতিল করে সেই জায়গায় জুনিয়ার ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার নিযুক্ত হয়। কমিশনার, ডেপুটি কমি-শনারদের নিজ-নিজ এলাকায় তাঁর সব ক্ষমতা আইন মতো অর্পণ করেন। তবে, পূর্ণ শাসনের ক্ষমতা ও তদারকির ভার তাঁরই থাকে। ইচ্ছামতো হস্তান্তরিত ক্ষমতা তিনি প্রত্যাহার করতেও পারেন।

কমিশনারের মতো তাঁর ডেপুটি-কমিশনারদেরও জাস্টিস অফ-পিস করা হলো। এঁদেরও পুলিশ-কমিশনারের মতো প্রথম শ্রেণীর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য ম্যাজিস্ট্রেট করাও হয়। এঁদেরও বিচার ও দণ্ডদান ক্ষমতা বাদে হাকিমের অন্য ক্ষমতা থাকে। এঁরা ধরাপড়া আসামীদের জামিন বা মুক্তি দেবার অধিকারী ছিলেন। তার ফলে আদালতে হয়রানি ও বাড়তি উকিল-খরচ হতে লোকে অব্যাহতি পেত। স্বাধীনতার পর তাঁদের এই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। পূর্বে তাঁরা পনেরো দিন পর্যন্ত আসামীদের পুলিশ-হেপাজতেও নিতে পারতেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কলকাতা-হাইকোর্ট হতে পুলিশের ঐ ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হলো।

[বি. দ্র.] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জেলা ডেপুটি-কমিশনারদের সাহায্যের জন্য তার দুটি বিভাগে দু'জন এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারের পদ তৈরি হয়। প্রত্যেক বিভাগে ছ'টি থানা থাকে। প্রত্যেক জেলায় বারোটি থানা থাকে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ,

গোয়েন্দা-বিভাগ ও পোর্ট- পুলিশে সেই-সেই ডেপুটি-কমিশনারকে সাহায্যের জন্য একজন করে এ্যাসিসটেণ্ট-কমিশনার নিযুক্ত হন। পূর্বের পোর্ট-পুলিশ একজন এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারের অধীনে গোয়েন্দা-বিভাগের অধীন ছিল।

উপরোক্ত ব্যাপার পূর্বে পুলিশের বিভাগীয় এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারের কার্যের জন্য তাঁদের স্থলে চিফ-ইনেস্পকটার নামে একটি পদ ছিল। এই পদগুলি আরও কিছু-কাল উপ-বিভাগীয় কর্তা রূপে বিভাগীয় এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারদের অধীনে রেখে পরে ওই পদগুলি বাতিল করা হয়।

১৯০২ খ্রী. স্যার জন উড্‌বার্ন নামে এক ব্যক্তির নাম কলকাতা-পুলিশ-সম্পর্কে পাওয়া যায়। তিনি গভর্নর না-হলেও পুলিশ-কমিশনার ছিলেন। কারণ, তাঁর বাসভবনে বাংলা ও কলকাতা-পুলিশের যুগ্ম-বৈঠকের বিষয় বলা হয়েছে।

লর্ড কার্জন সুবা-বাংলাকে সুশাসনের জন্য দুইভাগে বিভক্ত করলেন। প্রতিবাদে দেশব্যাপী মহা-আন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র বঙ্গব্যাপী উত্তাল বিক্ষোভ। অরন্ধন, রাখী-বন্ধন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং ব্রিটিশ-বিতাড়নে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ চলতে থাকে। মুসলিমরাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ঢাকার গভর্নর ফুলার কোনও এক যুবককে বলেন, ইউ নো, হু আই অ্যাম? সেই বিক্ষুব্ধ মুসলিম ছাত্র নির্ভয়ে উত্তর দেয়: ফুল ইউ আর তাই তুমি ফুলার। অবস্থা বুঝে ব্রিটিশ সেই সময় প্রথম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদনীতির আশ্রয় নেন।

ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট কঠোর হস্তে এই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন দমন করেন। কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত। এই আন্দোলন ক্রমে গুপ্ত-বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ নিলো। কিছু-কাল এই উভয় আন্দোলন একসঙ্গে চলে। গুপ্তবিপ্লবী-আন্দোলন দমনে কলকাতা গোয়েন্দা-বিভাগ ব্যর্থ হলে কলকাতা-পুলিশের বিশেষ-বিভাগ তথা স্পেশাল ব্রাঞ্চ সৃষ্টি হয়। বাংলা-পুলিশে সেই জায়গায় ইনটেলিজেন্স-ব্রাঞ্চের সৃষ্টি হলো।

আমার পিতৃকুলের রাজভক্তি তখনও অটুট। কিন্তু মাতৃকুল স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মাতামহ 'পদ্মকুসুম' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কবি গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রামে গ্রামে গান বেঁধে বেড়ান। তিনি যুবকদের স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত হতে আহ্বান করেন। ফলে, আমাদের উভয়-পরিবারের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। গভর্নমেণ্ট ওই বৃদ্ধের পেনসন বন্ধ করে দেন।

এই কালে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১৯০৩ খ্রী. শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়া ও তৎপরে ১৯০৫ খ্রী. তাঁর বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়া ইংরাজ গভর্নমেণ্টের পছন্দ নয়। উনি ১৯০৩ খ্রী. রেলওয়ে ওয়ার্কস য়ুনিয়নের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রী. তাঁর নাম জোড়াসাঁকো থানার সারভেলান্স রেজি-

স্ট্রারে রেজিষ্ট্রি-ভুক্ত করা হয়। সেই থেকে তাঁর গতিবিধি ও বাটিতে উপস্থিত ও অনুপস্থিতির উপর গোপনে লক্ষ্য হতো। কোনো এক অ্যাংলো উর্ধ্বতন কর্মী তাঁর সম্পর্কে তদজন্য নিয়ম মতো একটি হিস্টি, সিট তৈরি করেছিলেন। ওই লিপিবদ্ধ তথ্য হতে কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।'

"রবীন্দ্রনাথ একজন জমিদার হওয়া সত্ত্বেও প্রজাদরদী। উপরন্তু উনি ধনী ব্যক্তি হয়েও বোলপুরে একটি ছোট্ট স্কুলে মাস্টারী করেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু মণ্ডিত দীর্ঘকায় অতি গৌরবর্ণ আলখাল্লা পরা এই লোকটিকে হঠাৎ দেখলে যীশুখ্রীষ্ট বলে ভ্রম হয়। ওতে বিভ্রান্ত হয়ে বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিতের ওর বাটিতে যাতায়াত। একটি ব্রিটিশ বন্ধু পরিবারে জন্মে ওঁর ব্রিটিশ বিরোধীতা দুঃখজনক।"

[বি. দ্র.] ওঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পরও উর্ধ্বতনদের নজর এড়িয়ে কিছুকাল পুরানো প্রথামতো ওঁর উপস্থিতি অনুপস্থিতি গোপনে জোড়াসাঁকো থানাতে লিপি-বদ্ধ হতো। একদিন এক জমাদার গোপন তদন্তান্তে ইনচার্জ কর্মীকে রিপোর্ট লেখা-চ্ছিল :—'দশ নং দাগী রবীন্দ্রনাথ হাজির নেহি। ওই সময় একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে ডাইরী লেখাতে উপস্থিত ছিলেন। ওটি উনি শুনে স্যার যদুনাথ সরকারকে জানালে তিনি ওটি প্রবাসীতে প্রকাশ করলে আলোড়ন ওঠে। উর্ধ্বতন কর্মচারীরা তাদের অজ্ঞাতে ঐ প্রাচীন প্রথা থানান্তরে তখনও প্রতিপালিত জেনে অবাক হন ও তাঁদের নির্দেশে তখুনি তাঁর নাম ওই থানা রেজিস্ট্রারি হতে 'স্ট্রাক অফ্' করা হয়েছিল। পরে কবিগুরুকে দাগী বলাতে জমাদারদের দশ টাকা জরিমানা এবং গতানুগতিক হুকুম বজায় রাখাতে ইনচার্জ অফিসারের সার্ভিস বুকে কালো দাগ পড়ে।

[ওঁর নাটকগুলিও ওই সময়ে অন্য নাটকের মতো লালবাজারে পুলিশের প্রেস সেক-সানে যথারীতি দাখিল করে ওগুলি অভিনয়ের পূর্বে অনুমোদিত করাতে হতো।]

উনি ভারতীয় পুলিশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মুকুট নাটকে উনি লিখে-ছিলেন : 'পুলিশ যদি কারুর পা জড়িয়ে ধরে তাহলে লোকে মনে করে যে তার তাহলে জুতো জোড়াটা সরাবার মতলব আছে।" এ হতে বোঝা যায় যে জনগণের পুলিশের প্রতি অহেতুক সন্দেহ ও বিরাগ তাঁর অপছন্দ ছিল ও তাতে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। বস্তুত পক্ষে রাজনৈতিক কারণে দলগত ভাবে পুলিশ কিছুটা আনপপুলার তৎকালে হলেও ব্যক্তিগত ভাবে তারা জনপ্রিয় ছিল। সবকিছু ব্যক্তিগত জনসেবা ও সদ্ ব্যবহারের উপর নির্ভর করতো। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন : মিশনারীদের অপেক্ষা পুলিশের জনসেবার সুযোগ বেশী।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি [পরে স্যার] এবং অন্যেরা বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। সুরেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ন [আই. সি. এস.] কর্মকৃত্য হতে বেরিয়ে এসে মাঠে-ঘাটে ঘোষণা করলেন : 'আই উইল শেক্ দি ফাউণ্ডেশন অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার।' অর্থাৎ : 'আমি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল গুঁড়িয়ে দেবো।' সুরেন্দ্রনাথের হাত থেকে তাঁর 'নেশন ইন মেকিঙ' গ্রন্থখানি গ্রহণ করার সময় মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করেছিলেন যে বাল্যকালে সংবাদপত্রে তাঁর বক্তৃতা পাঠ করে তিনি অনুপ্রাণিত হন। তিনি পরে মন্ত্রী হয়ে নতুন আইনে কলকাতা-পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র পদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

[মৈমনসিংহের মহারাজা এবং তৎকালীন জমিদারকুলও বঙ্গভঙ্গ-রোধ-আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। অবশ্য নতুন ব্যবসাদার-জমিদারদের কেউ ওই-সব আন্দোলনে থাকেন নি। কিন্তু বাংলার প্রত্যেক প্রাচীন জমিদার-বংশ এতে যোগ দিয়েছিলেন।]

এবার বাছা-বাছা ইংরাজ ও ভারতীয় রাজপুরুষদের পথে-ঘাটে গুপ্ত বিপ্লবীরা হত্যা শুরু করলো। উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা বাড়ে। এখানে বিপ্লবীদের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই, কিংসফোর্ড প্রভৃতি সম্পর্কে বহু পুস্তক আছে। বহু বিপ্লবী'র ব্যবহৃত পুস্তক-বোমা প্রভৃতি শস্ত্র পুলিশ-মিউজিয়াম আছে। এখানে আমি পুলিশের প্রশাসনীয় ইতিহাস সম্বন্ধে শুধু বলবো।

উক্ত মুভমেণ্টের পর হতে গভর্নমেণ্টের বিশ্বস্ত কর্মী ও পরিবারদের ও পুলিশের আত্মীয়দেরই পুলিশে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই সুযোগ আমরাও নিয়েছিলাম। বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় আমাদের বহু আত্মীয় বিচারক এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ হন। কলকাতা পুলিশেও আমাদের বহু আত্মীয় থাকে।

ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রোধ করলেন। বংলাদেশ তার রাজধানী ও উল্লেখ্য অংশ হারালো। ফলে কলকাতায় আর রাজধানী পুলিশ রইলো না। সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে এ-সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও নেতারা একস্থানে অপেক্ষা করে ছিলেন। ওই সময় রাজধানী ও কিছু ভূমি হারানোর সংবাদ শোনামাত্র তাঁরা হায়-হায় করে উঠেছিলেন। বাংলার কিছু নেতা এ ঘটনায় তাঁদের রাজনৈতিক পরাজয় মনে করেছিলেন।

[বি. দ্র.] মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়ার অংশ বিহারে এবং চৈতন্যদেব-খ্যাত সিলেট এবং গোয়ালপাড়ার অংশ আসামে রয়ে গেল। উদ্দেশ্য— একটি অবাধ্য বাঙালী সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু করে শাস্তি দেওয়া ও দুর্বল করা। সামগ্রিক ভাবে বাঙালীকে ইংরাজশাসকরা দুর্বল করে দিল।

পরে বাঙালীরা আরো শোচনীয় বঙ্গবিভাগ মেনে নেয়। কার্জন অখণ্ড বাংলাদেশ

দু'খণ্ড করেন। কিন্তু পরবর্তী নেতারা ভারতকে তিন খণ্ড করেন। কার্জনকে তা সত্ত্বেও তার পুরাকীর্তি প্রভৃতি রক্ষার জন্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর তৈরি পার্টিশন বর্তমান পার্টিশন অপেক্ষা উত্তম ছিল। ভারত-ত্যাগের সময় কার্জন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : 'বাঙালী একদিন বুঝবে আমি তাদের কত উপকার করে-ছিলাম।'

গুপ্ত-বিপ্লব-আন্দোলন তখনও কিন্তু থামে নি। বিপ্লবীরা সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করতে বদ্ধপরিকর। স্বদেশী-আন্দোলনও পুরাপুরি থামে নি। ভারতের অন্যত্রও স্বদেশী-আন্দোলনে সাড়া জাগে। আমাদের পরিবারের কয়েকজন তরুণও তাতে যোগ দেওয়ায় বিতাড়িত হয়। বাংলার প্রতিটি পরিবারই তখন এই আন্দোলনে উজ্জীবিত।

জ্যেষ্ঠতাত রায়বাহাদুর কালিসদয় ঘোষাল তখন বাংলা-পুলিশের নামী অফিসর। তাঁকে স্পেশাল-ব্রাঞ্চ পুলিশ-সংগঠনের জন্য কলকাতায় নিযুক্ত করা হলো। পিতৃদেবকেও কলকাতা-পুলিশে নেওয়া হয়। কিন্তু পরে তিনি রেলওয়েতে উচ্চপদী অফিসর হন। জেষ্ঠ্যতাত ও পিতৃদেব উভয়েই ডিরেক্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন। সাব-ইনস্পেক্টর হতে ইনস্পেক্টর করার নিয়ম ; কিন্তু বহু পরিবারের পুত্রদের সোজাসুজি ইনস্পেক্টর করা হতো। তখন দেশীয়দের জন্য পুলিশ সুপারের পদ [আই. পি.] ছিল না। এমন-কি পুলিশ-ইনস্পেক্টর পদগুলির অর্ধেক কলকাতায় ইংরাজ ও অ্যাঙলোদের অধিকারে ছিল।

[বি. দ্র.] আমি এনফোর্সমেণ্ট-বিভাগের ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার থাকার সময় প্রশ্ন ওঠে, যুদ্ধোত্তরকালে সিভিল-সাপ্লাই বিভাগ হতে পুলিশে গৃহীত ইনস্পেক্টরদের ওই বিভাগে স্থায়ী করা প্রিসিডেণ্টের অভাবে নিয়ম-বহির্ভূত কিনা। আমি হোম-সেক্রেটারি মৃগাংকমৌলী বসু. আই. সি. এস, সমীপে ওই-রকম কিছু নথিপত্র উপ-স্থিত করি। ১৯২৮ খ্রী. শ্রীমেটা নামক একজনকে ও তার পূর্বে অন্য কয়েকজনকেও বাংলা-পুলিশে সরাসরি-ইনস্পেক্টর করা হয়। আমাদের পারিবারিক নথিপত্র হতেও সেই সম্পর্কিত প্রমাণ তাঁর নিকট দাখিল করি। ফলে, সিভিল-সাপ্লাই হতে গ্রহণ-করা কয়েকজনকে ইনস্পেক্টর-পদে কনফার্ম করা সম্ভব হয়।

স্বদেশী-আন্দোলন ও বিপ্লবী-আন্দালন ও ১৮০৮ খ্রী.-র পরেও বহুকাল থামে নি। বিপ্লবী ও পুলিশ-পক্ষে কিছু ব্যক্তি তখনও শহীদ হচ্ছে। সেই মহাযুগ-সন্ধিক্ষণে রাজভক্ত পিতৃকুল এবং দেশভক্ত মাতৃকুলের মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করলাম। অবশ্য তাতে পৃথিবীর লাভ বা ক্ষতি কোনও কিছুই হয় নি।

এই আন্দোলনে প্রথম বিদেশী বস্ত্র দহন ও বর্জন ও গভর্নমেণ্টের সহিত অসহযোগিতার উদ্ভাবিত হয়।

কমিশনার হ্যালিডে

পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব [১৯০৫-১৯১৫ খ্রী.] দশ বৎসর পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বিপ্লবী আন্দোলনেরও সম্মুখীন হতে হয়। এঁরই শাসনকালে কলকাতা হতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলে কলকাতা পুলিশ রাজধানী পুলিশের গৌরব হারায়।

১৯১৩ খ্রী. হ্যালিডে সাহেবের নেতৃত্বে ভোর রাত্রে হিন্দু হোস্টেল তল্লাসী কালে কলকাতা পুলিশের সহিত ছাত্রদের সঙ্ঘাত ঘটে। ঐ হোস্টেলের ইংরাজ সুপারিনটেণ্ডেন্টের নেতৃত্বে ছাত্ররা পুলিশকে তল্লাসীতে বাধা দেয়। পরে অবশ্য মাত্র সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির বাক্সটি তল্লাস করতে দেওয়া হয়। এইটিই পরে স্থায়ী প্রথা হয়ে যায়। অর্থাৎ সমগ্র হোস্টেল তল্লাস নয়। পরে পুলিশ কমিশনারকে য়ুনিভারসিটি ক্যাম্পাসে ঢোকার জন্য য়ুনিভারসিটির কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

[এতাবৎকাল ফরাসী চন্দননগর ও প্রাচীন ভারতীয় প্রথামত নাইট সার্চ নিষিদ্ধ ছিল। উপরন্তু পুরুষদের অবর্তমানে কোনও বাটীতে প্রবেশও রীতিবিরুদ্ধ ছিল। এই সময় নতুন হুকুমে সাধ্যমত ওইরূপ তল্লাস এড়ানোর নিয়ম হলো।]

কমিশনার হ্যালিডে সাহেব কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্ট হতে রাজনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগটা তুলে নিয়ে তদ্জন্য পৃথক 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ,' পুলিশ সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন কঠোর দমন নীতি দ্বারা নিষ্পেশিত করা হলে 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। তদ্জন্য উহা দমনে উপরোক্ত রূপ একটি বিশেষ বিভাগের প্রয়োজন হয়েছিল।

এঁরই কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। ঠিক হয় যে—বাঙালী তরুণদের যুদ্ধস্পৃহা অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করতে বাঙালী তরুণদের পৃথক পল্টন তৈরি করে ওই যুদ্ধে পাঠানো হবে। পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমে বাঙালী এ্যামবুলেন্স ও পরে ওদের যোদ্ধবাহিনী মেসোপটামিয়ার রণক্ষেত্রে পাঠানো হলো। এতে হিন্দু মুস্লিম মধ্যবিত্ত গ্র্যাজুয়েট ও নিরক্ষর কৃষক তরুণরা একত্রে যোগ দিয়েছিল। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় জীগির কেউ দেয় নি। কলকাতা পুলিশের জনৈক ডেপুটি কমিশনার ক্যাপটেন উড সাহেব ওদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তুর্কীদের বিরুদ্ধে বাঙালী সৈন্য পরিচালনা কালে অন্যদের সহিত তাঁর মৃত্যু ঘটে। কবি নজরুল ইস্লাম-এর অধীনে একজন হাবিলদার ছিলেন। কলকাতা পুলিশ ওই সময় বাঙালীদের যোদ্ধ-পল্টনে রিক্রুট করতে সাহায্য করেছিল।

[প্রখ্যাত দানবীর ব্যারিস্টার রাসবিহারী ঘোষকে নূতন ইংরাজ চিফ জাস্টিস হাইকোর্টের এজলাসে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'ওয়েল! জার্মানরা কলকাতাতে

এলে তোমরা কি করবে ? ওঁর এই উপহাসটি গভীরভাবে গ্রহণ করে বিখ্যাত বাগ্মী রাসবিহারী ঘোষ উত্তর করেছিলেন : আমরা তখুনি টাউন হলে একটা সভা করবো ও তার পরে মালা হাতে চাঁদপাল ঘাটে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাবো। ওই ইংরাজ জাস্টিস ওঁর ওই উত্তরে বিস্মিত হয়ে উনি গিরিয়াস কিনা' জিজ্ঞাসা করলে রাস-বিহারী ঘোষ বলেছিলেন : তাছাড়া আমাদের করণীয় কি আর আছে ? বিগত দেড়'শ বছরের ব্রিটিশ রাজত্বে তোমরা অন্য আর কিছু অর্থাৎ যুদ্ধ বিদ্যাদি আমাদের শেখাও নি।

এই বাগবিতণ্ডার পরই ইংরাজদের একান্ত 'ক্যালকাটা ক্লাবে' উর্ধ্বতন ইংরাজদের পরামর্শ হয় এবং উত্তরে ডিনার টেবিলে ঠিক হয় যে বাঙালীদের একটি পৃথক রেজি-মেণ্ট তৈরি করে ওদের শান্ত করা হোক। অন্য কারণ এই যে চন্দননগরে ফরাসীরা ইতিমধ্যেই বাঙালীদের বিমান বাহিনীতে ও গোলন্দাজ বাহিনীতে গ্রহণ করে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল। সেখানে জার্মানদের বিরুদ্ধে তারা যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিল। বাঙালী জনগণ কিন্তু জার্মানদের বিষয়ে তখন সহানুভূতিশীল ছিল।

[এ সময় ডালহাউসি স্কোয়ারের জলেতে পৃষ্ঠে বড় ডিম্বসহ একটি বিরাট হাঁস ভাসানো হয়। ওই ডিম্বের গাত্রে লেখা ছিল : ওয়ার বণ্ড কিনলে হোমরুল তথা ডিম্ব পাবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ওই হোমরুল আসে নি। দেশীয় সংবাদ পত্রে ওই হোমরুলকে ভীম-রুল বলা হতো।]

যুদ্ধ শেষ হলে বাঙালী পল্টন পল্টনীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভেঙে দেওয়া হলো। পরি-বর্তে বছরে মাত্র এক মাসের মেয়াদে পঞ্চাশ টাকা বেতনে বাঙালীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থে টেরিটোরিয়াল ফোর্স খোলা হয়। বাঙালী কৃষকরা শহরে গরু কিনতে এলে একমাস গড়ের মাঠে ট্রেনিং নিতে ক্যাম্পে থাকতো। এক মাস পর ঐ পঞ্চাশ টাকাতে এক জোড়া বলদ কিনে গ্রামে ফিরতো। অবস্থা বুঝে বৃটিশ পরে ছাত্রদের জন্য ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর খুলেছিল।

[বাঙালী পল্টনদের বিরুদ্ধে ওই কালে ইংরাজ অফিসারগণ একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তাদেরকে মগজী বাঙালী বলে ওই সময় নিম্নোক্ত গণ-গল্পটি প্রচার করে ছিল।

"মেসপোটেমিয়ার রণক্ষেত্রে বাঙালী সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হলো। 'কুড়ি কদম (পেশেশ) এগিয়ে গুলি ছোঁড়ো। এতে ওই মগজী বাঙালী সৈন্য তর্ক শুরু করে বললো : রাইফেলের রেঞ্জ বাড়ানো ও কমানো যায়। এখানে বসেই তো টোয়েন্টি পেশেশ রেঞ্জ বাড়ানো যেতে পারে। হুকুমটি ভুল হুকুমই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওটি তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন না করে তর্ক করাতে তুর্কীরা এসে পড়ে সকলকে খতম

করে দিয়েছিল।

প্রত্যুত্তরে বাঙালী পণ্টনীরাও নিম্নোক্ত রূপ দুইটি গণ-গল্প মুখে মুখে তৈরি করে তারা, সেগুলি প্রচার করেছিল। *

"এক ভদ্রলোক এক ডাক্তারের কাছে এসে বললো : 'আমার ব্রেনটা (মগজ) খারাপ হয়ে গেছে। ওটা একটু মেরামত করে দিন। ডাক্তার ওটি মেরামতের জন্য অপারেট করে মস্তক হতে বার করে কাঁচের বোতলে রেখে তাকে সাতদিন পরে ওটির ডেলিভারি নিতে বললো কিন্তু এক মাস পরেও সেই লোক ওই ব্রেন ডেলিভারি নিতে এলো না। হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবু তাকে বাজারের পথে দেখে বললো : ওহে। তোমার ব্রেনটি চমৎকার ভাবে মেরামত করা হলো। কিন্তু তুমি ওটি নিয়ে গেলে না কেন? উত্তরে ওই লোকটি ডাক্তারবাবুকে বলে ছিল : 'ওই ব্রেন আমার আর দরকার নেই। কারণ—ইতিমধ্যে আমি সেনা বিভাগে ঢুকে পড়েছি।'

"পরীক্ষার দিন কর্নেল সাহেব আমাকে আর্মির ওই স্কোয়াডটি কম্যাণ্ড করতে বললে আমি ভাবছিলাম যে কি করে কম্যাণ্ড শুরু করবো। হঠাৎ আমার মগজে একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমি ছুটে গিয়ে একজন সিপাহীর গলাটা দুই হাতে চেপে ধরে খেঁকরে উঠে বলে ছিলাম : 'উল্লুক কাঁহা কো! তুমি শির হেলাতা। আমি তোমরা শির তোড়েগা। আউর তোমার আঁখ উপাড় লেগা। এতে ওই পরীক্ষক কর্নেল সাহেব খুশী হয়ে বলে ছিলেন। 'বহুৎ খুশ হুয়া। যাও তুম পাশ।' অর্থাৎ : এদের মতে 'যে যতো বড়ো বুলিই [Bully] সে ততো ভালো অফিসার।"

এঁর কালে চাকুরি সহ সর্বত্র সাম্প্রদয়িক ভেদনীতি গর্ভমেণ্ট গ্রহণ করে। এজেণ্ট প্রপোগেটর দ্বারা মধ্যে মধ্যে ওই কাল হতে হিন্দু মুস্লিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধানো হয়। উদ্দেশ্য—এদেশের লোকদের স্বাধীনতারস্পৃহা স্তিমিত করে তাদের আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত রাখা। কিন্তু এতে বিপ্লবী আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠে। বিপ্লবীরা বুঝেছিল যে সমগ্র জনগণের সাহায্য আপাতত নিস্প্রয়োজন। বিপ্লবী পন্থাতে দেশোদ্ধারে সঙ্ঘবদ্ধ স্বল্প লোকই যথেষ্ট। বিপ্লবীরা পথে-ঘাটে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারদের গুলি করতে শুরু করলো।

[ওই কালে ইংরাজরা বাঙালীকে শিরোপরি রেখেছিল। দেশ জয় করার পর তারা বাঙালীদের দ্বারা গর্ভমেণ্ট স্থাপন করতো। কর্মীসহ সমগ্র ভারতে বড় সাহেব বলতে ইংরাজ ও ছোট সাহেব বলতে জনৈক বাঙালীকেই বুঝতো। বাঙালী যেখানেই গিয়েছে

* পণ্টন বাক্যটি ইংরাজী প্লেটুন শব্দটির বাঙলা-কৃত পরিভাষা। অনুরূপ ভাবে প্রাণবন্ত বাংলা ইংরাজী 'ট্রুপ' [Troop] কে বাংলাতে স্কোয়াড অর্থে 'টুলি' করে নিয়ে ছিল। অনুরূপ ভাবে সেণ্ট্রিকে শাস্ত্রী, রাউণ্ডকে রোঁদ ও জেনারেলকে জাঁদরেল ও ড্রিলকে হলিল করে নেয়।

সেখানেই একটি কালীবাড়ি, একটি নাট্যশালা ও স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য কয়টি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লব ও আন্দোলনের জন্য একালে বাঙালীরা ইংরাজদের অত্যন্ত বিরাগ ভাজন হয়েছিল।]

"প্রায়ই দেখা যেতো হাসপাতাল হতে নিহত অফিসারদের শবাধার বাহীদের পিছনে উর্দীপরা পুলিশ বাহিনীর শোভাযাত্রা। পুলিশ কোয়ার্টার্সের সুমুখে শবাধার নামলে পুষ্পাচ্ছাদিত মৃতদেহের উপর এক সদ্য বিধবা বাটির ভিতর থেকে ছুটে এসে আছড়ে পড়লো। কয়েক জন তখুনি তাকে জোর করে তুলে ভিতরে নিয়ে গিয়েছে। এরপর শ্মশানে লাস্ট বিউগিল বেজে উঠলো। তারপর উচ্চ ও নিম্নপদী সহকর্মীরা একে একে মৃতদেহকে স্যালুট করে ফিরে এসেছে।"

ওই সময় সকালে বেরুলে বিকালে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। রাত্রে ফিরতে দেরি হলে ধরে নেওয়া হতো যে অমুক বাবু আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তার জন্য ভীত হয়ে কেহ বদলী হতে বা কর্মে ইস্তফা দিতে চান নি। ইংরাজদের নিকট ভীত লোক প্রতিপন্ন হতে তাদের অসীম লজ্জা। কর্তব্য কর্মে ওঁদের কারো গাফলতি দেখা যায় নি।

তবে—একথাও ঠিক যে ওই পরিবারের নিহত কর্মীদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার নিয়েছে। তাদের পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় ও কন্যাদের বিবাহের অর্থ গর্ভমেণ্ট যোগাতো এবং পুত্রকে উপযুক্ত চাকুরিও দেওয়া হয়েছে। বেঁচে থাকলে স্ব স্ব পরিবারের জন্য তারা এতটা করতে পারতো না। তাদের বিধবারা আজীবন পেনসনভোগী হতো।

[ওই কালে বেসরকারী ও সরকারী ইংরাজ কর্মকর্তারা অবসর গ্রাহী বা মৃত কর্মীদের পুত্রদের খুঁজে ডেকে এনে চাকুরি দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ওদেরই পুত্ররা ভেদ-নীতির ফলে ব্রিটিশ তাড়াতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।]

এঁর কর্মকালে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মেডিকেল কলেজ হতে ডাক্তার হয়ে বেরুনোর পর কিছু সময় কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের কেডেটদের ফার্স্ট এইড্ পড়াতেন। সেইদিন উনি কল্পনাও করেন নি যে ভবিষ্যতে একদিন মুখ্যমন্ত্রীরূপে ওই পুলিশেরই উনি অধিকর্তা হবেন।

পরিশিষ্ট ক.

(*I*) *Material for the History of Bengal Police.*

[Govt. Records]

(1) "There was a force of watch men at Calcutta of maintenance of the peace within the city bounderies.

(2) There was a force of watch men and thanadars under control of the company as *Zamindar* of 24 Parganas.

(3) There were various forces of watch men, thanadars and other retainers belonging the Zamindars through out Bengal, Bihar and Orissa."

"The fiirst of these forces developed into Calcutta Police Force, the second was merged in the Bengal Police Force and the third with the exception of village watch men was abolished by Regulation of 1792."

[চব্বিশ পরগণা জমিনদারী ও তার পুলিশ ব্রিটিশরা ১৭৭৪ খ্রী. কিংবা তার পূর্বে অধিগ্রহণ করেছিল ।]

(2) *Orders of Mr. Varlet, Governor* [1767—1769] *of Bengal.*

"The office of Justices and Kazis who are established by Mohomedan Law and the Brahmins who administer Justice among Hindoos and others in every village town and quarters should be summoned to appear, produce their Sanands or authority for acting and require them. Records whatever cases are heard and determined are to be sent to and deposited in Sadar Kachary of the province and monthly return there of forwarded to Murshidabad."

(3) Orders of Lord Warren Hastings, Governor General.

"In the proceedings dated 6th December 1775 it is stated Mhd. Rezaul Karim took charge of Fouzdari Police of Hooghly, Katwa, Mirzanagar and Boosna and to him the local *Zamindari* Police was ordered to obey. In the rest of the province there were Zamindari Police officers responsible to their Masters."

(4) Letter of Lord Hastings, Governor General Dated 18th July 1773.

"Dacoits of this type are races of Out Laws who live from father to son in a state of warfare against all. The Muslims

and others in the Provincial courts in their area refuse to pass sentence of death on the Dacoits unless their crimes attended with murder. After capture they are to be sold as slaves or transported as such to the companys Establishment at Fort Marlaboroughs and that this Regulations be carried into Execution by the immediate orders of the Board. By these Means the Govt. will be released from Expense on prisons, keeping Guards Etc. The Sale of the convicts will raise a considerable fund if disorders continue.

(5) Letter of Colonel Bruce—Re. Non-co-operation of Bengalees against British Take over of Zamindari Police.

"It was found that neither the old Barkandazes nor the local inhabitants presented themselves freely for enrolment and large bodies of men from North western Provinces and even, I believe, Panjabis were consequently imported. The efficiency of police must be impaired when it consists of foreigners. The Bengalees do not present themselves as they are expected for enlistment.

(6) Orders of Emp. Akbar quotod in "Materials for the History of Bengal Police—Re. power of Bengali Zamindars.

"The Fouzdar should pitch his camp in the neighbourhood of the body of the rebels. He should not be rash in attacking their forts but obstruct the roads and communication, should cultivators and their collectors prove rebellious he should induce them to submit by fair words. But not risk at once a general engagement."

(7) Report of the select committee reported in 1812. [Govt.]

"The Zamindars exercised chief authority and was entrusted with the charge of maintaining the peace of his District or Zamindary. In his official engagement he was bound to apprehend murderers, robbers, house breakers and generally all disturbers of peace. In case of failure in producing robbers or the articles stolen he was answerable to the injured person to make good the loss by their own ruler. In that it needed for discharging these responsiblity necessiated large establishments and close work can be gathered from the details furnished in the report itself of such establishment of the Zamindar of Burdwan. The Report says—His Police establishment as described in a letter from Magistrate of 12th Oct. 1788 consisted of

"Thanadars acting as chief Police Divisions and gurdians of peace under whose orders were stationed in different villages for the protection of the inhabitants and to convey information to the Thanadars about 2400 pykes or armed constables. But exclusive of these guards who were for the express purpose of the Police the principal dependence for the protection of the inhabitants of the people rested on the Zamindari pykes, on less than 19000 thousands of whom were at all times liable to be called out to aid the police."

(8) Mr. D. T. Mc. Niele I. C. S, a Special officer in his Report 1866 recorded.

"With the acquisition however of these new property positions, the Zamindars did not loose their character of Officers of the State. Before the Decemanial settlement and three years after it had been concluded, the whole police administration of the country was left in their hands and they were left responsible for the prevention of theft and dacoity the apprehension of criminals and restoration of stolen property.

(9) Letter of East India Company to its Directors Dated 22nd September 1809 by Mr. Dowdeswell, highly praising the work of local heriditary Goendas of Bengal Zamindary Police.

(10) Quotation from Materials for the History of Bengal Police & other then availble official Records.

"In December 1757 the merchants undertook the administration of the Zamindari rights of Dst. 24 Parganas and became responsible like other Zamindars for the policing of the area. The state of affairs continued upto 1722, when the company made up their minds to acknowledge their responsibility and to stand forth as "Dewan." The cessesations of the revenues of Burdwan, Midnapur and Chittagong made no difference to the Police responsibilities of the Merchant ; the Zamindars of the District who paid the revenue direct to the company were responsible to the Moghul Viceroy at Murshidabad for the police administration and even when the company became Dewan in 1763 we know from the despatch of the court of Directors that they repudiated any responsibility for Police Adminstration.

In 1772 with the advent of Warren Hastings commenced the

responsibility when in 1774 Warren Hastings wrote his minutes on police Reforms the state of affairs was as stated before."

(11) Orders of Lord Cornwallis Dated 15th November 1788 requiring the New Darogas of the New Police to take steps and to destroy ruthlessly country made Ship Building Industries of the Bengalees vide Materials for the History of Bengal Police.

(12) Scotland yard By Joseph Collomb London. Published by Row E. C. quoted also from Britannica Encyclopedia. page 5.

"In 1820 London crimes were rampant, highway men terrorised roads, foot pads invested streets, burglaries were constant occurrance, river thieves on the Thames committed depredations wholesale."

"London watchman appointed by Parishest were useless inadiquate inefficient and untrust worthy, acting often as accesories in aiding and abetting crimes. There was one criminal in England for every twenty-four of the population—On many street corners in London in broad day light stood bands who seized every fairly well clad passersby man or woman stripped of every bit of clothing, robbed them tied them maked to a post. Banks were robbed daily. Promise not to prosecute them and you will get back in part after paying revenue and there were no police in London. Para 6, Page 50 2nd line. Finally in 1820 Sir Robert Peel organised under special Parliament Act. the present Metropolitan of London. [Page 53, Para 3. lst line.]

পরিশিষ্ট খ

[সংবাদপত্রে কলিকাতা পুলিশ]

১. সংবাদ ভাস্কর, ২৬ জুন ১২৪২ : কলিকাতা নগরীর গাড়ী ঘোড়ার উপর ট্যাকস হইবে, ইহাতে-শকট বাহকরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া গত সোমবার অবধি তাহাদের চলায়ন বন্ধ করিয়াছে। মুটেরাও গাড়োয়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। গাড়োয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি-গভর্নর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি এই ট্যাক্স ক্ষমা হয়।

২. সংবাদ ভাস্কর, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ : কলিকাতা শহরে পূর্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাণিজ্য কার্যেরও দিন ২ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে গো-গাভীর ভাগ অধিক হইয়া উঠিয়াছে, বাঙালীরা ইংরাজ রীতি ব্যবহারে অনুগত হইয়াছেন

তদহেতুক অনেকে পাল্কীর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন। যাহা-দিগের গাড়ীতে সবল ঘোটক যোজিত থাকে তাহারাও সম্পূর্ণবেগে ঘোটক চালাইতে ত্রুটি করেন না, সেই বেগে অনেক পথিক মারা পড়ে, বহু লোকের হস্তপদাদি ভঙ্গ হইয়া যায়। বড় রাস্তা ও গলিপথ অত্যন্ত অপ্রশস্ত।

৩. সংবাদ প্রভাকর, ১৭ বৈশাখ ১২৫৭ :

[ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার বিস্তারিত বিবরণ]

দুই অশ্বযোজিত চার চাকার গাড়ী ৬৭৬ ; এক অশ্বযোজিত গাড়ী ১৬৮৯ ; ছ্যাকড়া ও অন্যান্য গাড়ী ১৩৯১ ; দুই চাকার গাড়ী ৮৬৭ ; সোয়ারী পানিঘোড়া ৪২৬ ; গাড়ীটানা বড় ঘোড়া ২৮৫০ ; গাড়ীটানা টাট্টু ঘোড়া ২৪৩৩।

৪. সংবাদ প্রভাকর, ১২ চৈত্র ১২৫৮ : নগরের মধ্যে কি উৎপাত হইল, এক সূত্র লইয়া পুলিশের কর্তারা কি ফ্যাসাদ করিয়া তুলিলেন, যেখানে যেখানে শুনা অমুক ব্যক্তি নরদমার ধারে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছিল তাহাকে চৌকীদার ও সারজন আসিয়া ধৃত করিল, অনেকেই বলেন এই প্রস্রাবে অমুকের অপমান, অমুকের জরি-মানা, অমুকের ঘোড়দৌড়, অমুক ব্যক্তির প্রহার প্রাপ্তি প্রভৃতি হইয়াছে। গত দিবস আমাদিগের পল্লীতে বিদ্যালয়ের দুইটি বালক হেদুয়ার পূর্বদক্ষিণ ধারের নরদমায় মূত্রত্যাগ করিতেছিল, তাদৃষ্টে রাজদূতরা অনায়াসে তাহাদিগ্যে তেরেমেরি বাক্যে অপমান করত হস্তধারণপূর্বক রাস্তা দিয়া লইয়া গেল।

৫. সংবাদপ্রভাকর, ১৭শ্রাবণ ১২৫৯: চৌর্য্যাদি দূষণাবহ ব্যাপার দমনে দশের নিকট ভাজন হইতে না পারিয়া পুলিশ ক্ষান্তিকার্যে যত্নারূঢ় হইয়া বুঝি প্রতিপত্তি লাভের সূত্রপাত করিতেছেন। বিশেষ কারণবশতঃ ইংরাজী টোলায় যাইয়া ঐ মহাপাপ কর্মেতে আসক্ত হইতে একান্তই বাধ্য হই তবে আমাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবেক।

৬. সংবাদ প্রভাকর, ২৩ আশ্বিন ১২৫৯ : ভদ্রলোকেরা শকটারোহণে কোনো স্থানে গমন করিয়া যদ্যপি রাস্তার ধারে শকট রাখিয়া যান, তবে ভেড়িওয়ালা মেড়ুয়াবাদী চৌকীদারেরা কোচম্যান অথবা সহিসকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সেই গাড়ী লইয়া যাইতে বলে, তাহাতে কোনো আপত্তি করিলে চৌকীদার মারিতে উদ্যত হয়, গাড়ী ধরিয়া ষ্টেসিয়ানে লইয়া যায়, এই নিয়ম প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়াছে।

৭. ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৯ কলিকাতা গেজেটে টেরিটি বাজারের দূষিত খাদ্য বিক্রয় বন্ধের জন্য উহা প্রতিটি ফটকে পুলিশকে বরকন্দাজ ও চৌকিদার মোতায়েন করিতে বলা হইয়াছিল। ওই প্রবন্ধে জানা যায় যে ওই দূষিত খাদ্য নষ্ট করার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হইয়াছিল।

৮. সংবাদ প্রভাকর, ৩০ বৈশাখ ১২৬০ : ধূলার নিমিত্ত রাজপথে গমনাগমন করা যায় না, নরদমার পচা গন্ধে বিবিধ প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, এদিকে টেক-সের দায়ে প্রতি দিবস দুঃখী লোকদিগের হাঁড়ী কলসী ঝাঁটা কুলা পর্যন্তবিক্রয় হইয়া যাইতেছে।

৯. সংবাদ প্রভাকর, ৪ কার্তিক ১২৬০ : ভবানীপুর, কালীঘাট, চক্রবেড়ে, ডুলাণ্ডা, শিবাদহ, ইটালি, বৈঠকখানা, বরানগর, কাশীপুর, চিৎপুর, পাকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকল কলিকাতা নগরভুক্ত হইবেক।

১০. ১৮৩১ খ্রী. ৭ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গেজেট ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অশ্বযানের গতি কমাতে অক্ষম পুলিশ কর্মীদের বরখাস্ত করে নূতন কর্মীদের নিয়োগ করার বিষয় বলা হইয়াছে।
[ডুলাণ্ডা গ্রামটির স্থানে বর্তমান কলিকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুল হয়েছে। লৌহ গরাদসহ বহু কক্ষবিশিষ্ট চক্রাকার অট্টালিকাটি ডুলাণ্ডা হাউস নামে পরিচিত। ওটি পূর্বে পাগলা গারদ ছিল। ওই পাগলা গারদ প্রথমে বহরমপুর ও পরে রাঁচিতে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষণে ডুলাণ্ডা হাউসটি পুলিশের আবাস তথা গতিরুম রূপে ব্যবহৃত।]
পরে ঘোড়ায় টানা ট্রাম কলিকাতাতে বসানো হয়। ধর্মতলার মোড়ে ওগুলির অষ্ট্রে-লিয়ান হর্সগুলি বদলী করা হতো। কিন্তু পরেতে স্টীম ইঞ্জিন যুক্ত ট্রাম ও আরও পরে ইলেকট্রিক ট্রাম চালু করা হলো।
১৯০৪ খ্রী. কলিকাতা শহরে ইংলণ্ড থেকে ৫০টি মোটরকার আমদানী করা হয়। ততোদিনে কেরোসিন ও রেড়ীর তেলের বাতি ও ঝাড় লণ্ঠনের বদলে ইলেকট্রিক আলো ও পাখা—পূর্বের মতো পুলিশ আর মশালের আলোক ব্যবহার করে না। কলের জল এলে থানার পাতকোগুলোও বুজানো হলো। ঘোড়ার গাড়ি ও পাল্কীর বদলে পুলিশের কর্তারা মোটর ব্যাবহার করতে থাকে।
[ট্রাফিক ডিপার্ট পূর্বে থানাওয়ারী ছিল। এবার উহা লালবাজারের অধীন হলো। যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ভার পুলিশের উপর থাকলেও ওগুলোর লাইসেন্স দিবার এক্তিয়ার কলিকাতা কর্পোরেশনের ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বহু সহস্র লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকাতে গরুর গাড়ি ব্যতীত ঘোড়ার গাড়ি ও মোটরের লাইসেন্স দেওয়ার ভার কর্পোরেশন থেকে পুলিশকে দেওয়া হয়।]
"মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের বংশধর মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট পুরানো কলিকাতার প্রশাসন এবং পলাশী যুদ্ধ সম্পর্কিত বহু নথীপত্র ছিল। তদপুত্র মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্র কুমার দেব বাহাদুরের নিকট হতে ১৯৩৪ খ্রী. আমি ওই সম্পর্কিত বহু তথ্য জেনেছিলাম। সেই সকল তথ্যের সাহায্য এই পুস্তকটিতে গৃহীত হয়েছে।
"হালিডের কালে লালবাজারের উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিল্ডিং দুটি ছিল। প্রশস্ত

প্রাঙ্গণে লর্ড কারমাইকেল অশ্বারোহণে পুলিশের ও দমকলের প্যারেড দেখতেন। পরেতে—এই প্রাঙ্গণ সঙ্কুচিত করে পূর্ব দিকের প্রধান বিল্ডিং তৈরি হয়। ১৯২৮ খ্রী. দক্ষিণ দিকের বিল্ডিংটি তৈরি করা হয়েছিল। এতে পুলিশ প্যারেড পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের প্রাঙ্গণে করা হতো। এখন ওইজন্য ব্রিগেড গ্রাউণ্ড ব্যবহার করা হয়।"

"কলিকাতার পুলিশ হাসপাতালটি প্রথমে লালবাজার অঞ্চলে ছিল। পরে ওটি আমাহার্স্ট স্ট্রীটে (বর্তমানে মাড়োয়ারী হাসপাতাল) স্থাপিত হয়। সর্বশেষে—১৯২০ খ্রী. বরাবর উহা বেণীনন্দন স্ট্রীটে নিজস্ব বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়।"

"কলিকাতা পুলিশকে সাদা ও বাংলা পুলিশকে খাকি উর্দী দেওয়া হতে থাকে। পূর্বে—জমিনদারী পুলিশের নিম্নপদীরা নীল পোশাক ও উচ্চপদীরা লাল পোশাক পরতো। আজও গ্রামীণ চৌকীদারদের নীল পোশাক সরবরাহ করা হয়। উড়িষ্যা পুলিশ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও নীল উর্দী ব্যবহার করেছে। তখন ঊর্ধ্বতন কর্মীরা ঘন্টি বাঁধা খাটো কোর্তা ও নিম্নপদীরা হাঁটু [পর্যন্ত] ঝুলা লম্বাজামা পরতো। জুতা পরলে তারা খড়পা বা নাগরী পরেছে। শিরস্ত্রাণ রূপে লাল, সাদা ও নীল পাগড়ী বা গোল টুপি বেঁধেছে কিংবা এক খণ্ড বস্ত্র মাথাতে বেঁধেছে। কিছুকাল পূর্বেও পুলিশের কোনও কোনও পদে গোল টুপি পরার রীতি ছিল।"

[অস্ত্র রূপে তারা ব্যাটন, লাঠি, বর্শা, তরবারি, বন্দুক বহন করেছিল। কলিকাতা পুলিশের থানাগুলিতে ১৯৪৬ খ্রী.-সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গাকালে ব্যাপক ভাবে সর্ব প্রথম বন্দুক, পিস্তল ও পরে অফিসারদের স্টেনগানও দেওয়া হয়। অবশ্য—পূর্ব হতে অ্যাঙলো সার্জেন্টদেরও সশস্ত্র পুলিশের হাতে যথারীতি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।]

"ব্যাপক রেল লাইন স্থাপন ও দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণের পূর্বে গ্রামাঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক কর্মী সহ থানাগুলি দখলকারী প্রতীক ঘাঁটির মতো ছিল। ওদের সংখ্যা অকিঞ্চিত-কর হওয়াতে ওদের প্রভাবও নগণ্য ছিল। স্বনির্ভর গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের পুলিশী ও বিচারকার্য জনগণের সাহায্যে করতো। যানবাহনের উন্নতি হলে জিলা কেন্দ্রগুলি হতে থানাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়।"

"গ্রামীণ থানা কর্মীদের যাতায়াতে হণ্টন করতে হতো কিংবা নৌকা বা অশ্ব ব্যবহার করতে হতো। কলিকাতা শহরে অবশ্য পাল্কী আদি ঘোড়ায় স্টেজ-কার পুসপুস গাড়ি, সাইকেল ও পরে ট্রাম ও মোটর হওয়াতে ওই শহরের পুলিশের যাতায়াতে অসুবিধা ছিল না।

[গ্রামীণ মানুষ বহুকাল তাদের জমিনদারদেরই রাজা বলে বুঝতো। বহু দূরবর্তী পুলিশ থানা ও ইংরাজ আদালত তারা পরিহার করেছে। শহরে না এলে তারা যে পরাধীন তা তারা বুঝতে পারতো না।]

বৃহৎ বাংলার পুলিশ ট্রেনিং স্কুল ছিল প্রথমে ভাগলপুরে ও পরে রাঁচিতে। বিহার উড়িষ্যা পৃথক হলে উহা সাবদাতে থাকে। এখন বিভক্ত বাঙলাতে ওটা বারাকপুরে।
'য়ুরোপীয় নিষ্কর্মাদের কখনও ভিক্ষা করতে দেওয়া হয় নি। য়ুরোপীয় ভিখারীদের ভেগরেণ্ট [আইন মত] এবং ভারতীয় ভিখারীদের ভ্যাগাবণ্ড বলা হতো। আমহার্স্ট স্ট্রীটে কলিকাতা পুলিশের অধীন ভেগরেণ্ট হোমে সরকারী খরচাতে ওদের সসম্মানে আটকে রাখা হতো। স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত ওইরূপ ব্যবস্থা ছিল।
"য়ুরোপীয় ও ভারতীয় পুলিশ কর্মীদের সুযোগ সুবিধা ও আরাম স্থল পৃথক রাখা হতো। উভয়ের ক্লাব লাইব্রেরী ও ল্যাভেটরীও আলাদা। য়ুরোপীয়দের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলিতে ভারতীয় কর্মীদের অধিকার নিষিদ্ধ। ট্রেনিং স্কুলে থাকার ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণও উভয়ের জন্য পৃথক ছিল।
[এই বিষয়ে সত্যেন্দ্র মুখার্জি এবং আমি স্বয়ং প্রথম প্রতিবাদ করলে দেশীয়দের জন্য আমাদেরকে পৃথক লাইব্রেরী, এ্যামবুলেন্স ও ক্লাব আদি তৈরি করতে অনুমতি দেওয়া হলে ওগুলি আমরা পৃথকরূপে নিজেদের জন্য পৃথক স্থানে স্থাপন করেছিলাম।]
"পূর্বে পুলিশের পশুবধ ও পশুর আটক শহর পুলিশের কর্তব্য ছিল। তাই দুইটি ক্যাটেল [খোঁয়ার] পাউণ্ড ও একটি ডগ পাউণ্ড আজও পুলিশের অধীন। আজও গবাদি পশু পুলিশই রাজপথ হতে পাকড়াও করে। কিছুকাল আগেও রাজপথের কুকুরগুলি বিষ প্রয়োগে নিধন পুলিশের কর্তব্য ছিল। বাংলা পুলিশের নিজস্ব ক্যাটল পাউণ্ডগুলি এক্ষণে বেসরকারী কণ্ট্রাকটারদের ইজারা দেওয়া হয়। তৎপূর্বে ফেরীঘাট-গুলি তত্ত্বাবধান ও পুলিশের এক্তিয়ারে ছিল। তাতে অপরাধীরা সহজে নদীগুলির ওপারে পালাতে পারে নি।
"১৯৩১ খ্রী. কলিকাতা পুলিশের এলাকা ৩০·৮ স্কোয়ার মাইল। ১১,৬০,৪১০ ব্যক্তির সেখানে তখন বসবাস। কলিকাতা পুলিশের অফিসার ও কর্মীদের সংখ্যা ৫৭৪৭ জন। উহার জন্য বাৎসরিক ব্যয় হতো টাকা ৪৬,৩১,৩০৪। ১ জন কমিশনার, ৭ জন ডেপুটি কমিশনার, ১০ জন এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার, ৬৫ জন ইনেস্পেক্টর, ১১৬ জন সাব ইনেস্পেক্টর, ২১৮ জন অ্যাংলো সার্জেণ্ট, ১৫২ জন এ্যাসিসটেণ্ট সাব ইনে-স্পেক্টর, ৪৩৩ জন হেড কনস্টেবল [পাঁচজন অশ্বারোহী] ৪১৫৫ জন কনস্টেবল। [৪৮ জন অশ্বারোহী] দ্বারা কলিকাতা পুলিশ গঠিত ছিল।"
[কলিকাতা পুলিশের পাইক তথা কনস্টেবলের মাসিক বেতন ১৭৫২ খ্রীঃ ২ টাকা ১৮৪৫ খ্রী. ৫ টাকা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধকালে ওদের বেতন ১১ টাকা এবং ১৯৪১ খ্রী. উহা ২৫ টাকা থেকে ২৯ টাকার গ্রেডের হয়। এক্ষণে—পুলিশের বিভিন্ন পদের সংখ্যাও বেড়ে বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে।]

[বি দ্র.] ১৯৪০ খ্রী. তিলজলার কর্পোরেশন পাম্পিং স্টেশনটি কলিকাতার মধ্যে আনতে রেল লাইনের ওপারের তিলজলার অংশ কলিকাতার এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার সহিত পুলিশ এলাকা বর্জন চিরাচরিত প্রথা। মহাদাঙ্গার পূর্বে কলিকাতা থানা পুলিশ নর্থ ও সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে বিভক্ত ছিল। স্পেশাল ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্স পোর্ট পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ ও মোটর ভিহিক্যাল উহার অন্য কয়টি বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অধীন ছিল। প্রতিটি ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য ডিস্ট্রিক্টগুলির দুইটি উপভাগের জন্য দুইজন এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার ছিল। পূর্বে এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারদের বদলে দিয়ে ইনস্পেক্টররা এই কাজ করতো। পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ওদেরকে এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারদের সাহায্যকারী রূপে রাখা হয়। পূর্বেকার থানার মুন্সীদের পরে এ্যাসিসটেণ্ট সাব ইনস্পেক্টর করা হয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রী. মহাদাঙ্গাকালে উত্তর ও মধ্য কলিকাতার মধ্যবর্তী সেণ্ট্রাল ডিষ্ট্রিক্ট রূপে একটি অনুরূপ কর্মী সহ পৃথক ডিষ্ট্রিক্ট স্থাপন করা হয়েছিল। উপরন্তু ভেজাল নিবারণে ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগও কমিশনার হ্যালিডের কালে অনুরূপ কর্মীগণ সহ স্থাপন করা হয়।

[ট্রেনিং স্কুল, মাউণ্টেড্ পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ আমিন এ্যাক্ট পাশ ডেপুটি ও লাইসেন্স ডিপার্ট : এবং হোটেলাদি ও বন্দুকের লাইসেন্স দেয়, প্রেস সেক্সন : এবং অশ্লীল ও আপত্তিকর প্রকাশন বন্ধ করে। সিটি আর্কিটেক্ট : এবং বে-আইনী গৃহ নির্মাণ বন্ধে কর্পোরেশনকে সাহায্য করে, ফিলিম সেনসার বিভাগ, পাশপোর্ট বিভাগ : এবং বিদেশ গমনেচ্ছুদের ছাড়পত্র দেন, মোটর ভিহিক্যাল : এবং মোষ ঘোড়া গাড়ি ও রিক্সাদির লাইসেন্স দেন ও ট্যাক্স আদায় করেন। আদি কলিকাতা পুলিশের উল্লেখ্য উপবিভাগগুলি রয়েছে।]

পৃথিবীর দেশে দেশে মিলিটারী ক্যু হলেও পুলিশ ক্যু প্রায়ই হয় না। নিয়ম তান্ত্রিক পুলিশ শেষদিন পর্যন্ত নিয়োগকারীদের অনুগত থাকে। ইতিহাসের সর্পিল পথে কোন্ মোড়েতে এসে গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অমান্য করতে হয় তা পুলিশ জানে না।

[পুলিশ প্রধানদের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্র : ১৭২০—১৭৫৬খ্রী., জমিদার হলওয়েল, প্রধান হাকিম ও জাস্টিস অফ পিসগণ, ককবর্ণ ICS : ১৮৫৭—১৮৬৩খ্রী., মিঃ শক্ : ১৮৬৭—১৮৬৬ খ্রী., স্যার স্টুয়ার্ট হগ ICS : ১৮৭৬ খ্রী., স্যার হেনরী হ্যারিসন : ১৮৮১—১৮৮৯ খ্রী., মি হ্যালিডে IP. স্যার রেজিনেণ্ড ক্লার্ক IP., স্যার চার্লস টেগার্ট IP, মিঃ কলসন IP., মিঃ ফেয়ারওয়েদার IP., মিঃ রে IP., মিঃ হার্ডিক IP., সুরেন্দ্র চ্যাটার্জি IP., হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী IP., শচীন্দ্র ঘোষ IP., প্রণবকুমার সেন IP., রঞ্জিত গুপ্ত IP., রবীন্দ্র চ্যাটার্জি IP., সুনীল চৌধুরী I. P. S.]।

[ব্রিটিশ শাসনকালে বাঙালী পুলিশ কনস্টেবলদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। রাজনৈতিক কারণে কেউ ওই পদে কদাচিৎ আসতো। ওদের ওই পদে নেওয়াও হতো না। আমি টেস্ট করে কয়েকজন বাঙালীকে কনেস্টবল পদে এনে ছিলাম। তারা ওইকালে প্রায়ই দ্রষ্টব্য ব্যক্তির মতো।

একটি ত্রৈমাসিক পুলিশ মিটিঙে আমি বাঙালী পুলিশ কনেস্টবল নিয়োগের প্রথম প্রস্তাবাদি কয়েকজনের আপত্তির উত্তরে বলি 'মধ্যবিত্তদের বদলে বাঙালী কৃষক কুল হতে কনেস্টবল ও জোয়ান নিযুক্ত করা হলে ওরা অনুপযুক্ত হবে না। দেশওয়ালী জোয়ান ও পুলিশ কনেস্টবল ওই কৃষককুল হতেই গৃহীত হয়। এজন্য বাংলার গ্রামেতে রিক্রুটিং স্কোয়াড পাঠানো হোক। পূর্বে—বাঙালীদের মতো দেশওয়ালীরাও কনেস্টবল হতো না। প্রথম প্রথম এজন্য ওদের গ্রামে গ্রামে রিক্রুটিং স্কোয়াড পাঠিয়ে ওদের ভর্তি করা হতো। কিন্তু ওইরূপ প্রচেষ্টা বাংলা প্রদেশে কখনও করা হয় নি। পাগড়ী মাথাতে বাঁধতেই বাঙালীদের যা কিছু আপত্তি ও লজ্জা এবং অসুবিধা, ইউনিফর্ম বদলে মাথাতে টুপি দিলে মধ্যবিত্ত বাঙালীরাও কনেস্টবল হতে রাজী হবে। আমি এক প্রকার নূতন উর্দীর ও টুপীর নকশাও তৈরি করে দেখাই। স্বাধীনতার কিছু পরে ঐ লাল পাগড়ী বদলে নূতন উর্দী করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে দলে দলে বাঙালী তরুণরা পুলিশের নিম্নপদগুলিতে ফিরে এসেছে।]

[বি. দ্র.] একালে বাঙালী ট্যাক্সী ড্রাইভারও ব্যতিক্রম ছিল। এখন শিখদের বদলে বাঙালী ট্যাক্সী ড্রাইভারই বেশী। রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জি মোটর ভিহিকেলের ডেপুটি হলে বেবী ট্যাক্সীগুলি বাঙালীকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পাওয়াতে আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।]

গড়িয়াহাট ফাঁড়ী ও রাইফেলরোড ফাঁড়ী দুটির বর্তমান বাটী আমিই ভাড়া করে ও দুটিকে লেখালেখি করে মঞ্জুর করাই। আলিপুর থানার ও আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার মধ্যে নূতন পুলিশ ভবন করতে আমার প্রতিবেদন ছিল। বেলেঘাটা থানার কোয়ার্টার্স থেকে থানাতে ঢুকতে বৃষ্টিতে ভিজে ঘুরে আসতে হতো। আমার চেষ্টাতে দ্বিচালের মধ্যে দরজা করার নকশা প্রথম মঞ্জুর হয়। কালীঘাট ও লেক থানা করার জন্যও আমার প্রতিবেদন ছিল। শহরতলিতে ছোট ছোট নূতন স্থাপনের প্রতিবেদন দিয়েছি। ওগুলি ব্রিটিশ পিরিয়ডে লিখলেও স্বাধীনতার পরে ওগুলি কার্যে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশ এসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা রূপে এই সকল প্রতিবেদন আমি কর্তৃপক্ষকে পাঠাতাম।